হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর

প্রবন্ধ সংগ্রহ

আদান-প্রদান

হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর

প্রবন্ধ সংগ্রহ

সম্পাদনা

নামবর সিং

অনুবাদ

সুব্রত লাহিড়ি



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

প্রচ্ছদ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা তৈলচিত্র (মর্ডান আর্ট গ্যালারি, নয়াদিল্লি)

ISBN 81-237-2447-0

1998 (শক 1920)

Original Hindi Title : Hazariprasad Dwivedi : Sankalit Nibandh
Bangla Translation : Hazariprasad Dwivedir Prabandho Sangraha
মূল্য : 35.00 টাকা
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লী-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচিপত্র

ভূমিকা

হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী কাশীর পণ্ডিতদের সেই ঐতিহ্যের অন্যতম প্রতিনিধি, যে ঐতিহ্য রামাবতার শর্মা, চন্দ্রধর শর্মা গুলেরি, রাহুল সংকৃত্যায়নের মত তেজস্বী পণ্ডিতরা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং যার ফলে হিন্দি ভাবনা-সৃষ্টি 'পুনর্নবতা' পেয়েছে। আজ আমরা যাকে 'আধুনিকতা' বলি তা পুনর্নবতার অন্য নাম। যদি কেউ কেউ এতে 'উত্তর-আধুনিকতার' পূর্বাভাষ পেয়ে যান, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'পুনর্নবা' হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর একটি উপন্যাসের নামই নয়, তার সমস্ত রচনাকর্মের বীজশব্দ। আসলে কালিদাসের 'ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিদ্যতে'-কে একটি নতুন অর্থে দ্বিবেদী পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তাঁর লেখায় প্রায়ই কালিদাসের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, 'কিন্তু পুনর্নবা-য় তো নিজের সৃজনমূলক বেদনা ব্যক্ত করতে চন্দ্রমৌলি রূপে কবি কুলগুরুকে উপস্থিত করেছেন আর নিজের কল্প-সৃষ্টির মুখ দিয়ে ঝরে পড়েছেন :

'আমার নিজের মনের বিক্ষোভ শুধু আমার মনেই আঁটে। পৃথিবীর সর্বত্র তার কোনও না কোনও অংশের সাম্য পাওয়া যায়। প্রতিটি গাছপালা তার কিছু না কিছু আভাস দেয়, কিন্তু একত্রে যদি সেই সাম্য ঠিক ঠিক কোথাও বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা শুধু আমার মনেই আছে। বাইরের রূপসামগ্রীর মাধ্যমে তাকে কোনওভাবে পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করা যেতে পারে না; শব্দ তাকে কি প্রকট করবে!'

তবে এ তো একরকম 'হন্তৈকত্র ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি'রই ব্যাখ্যা, কিন্তু এ ব্যাখ্যাও কি অপূর্ব! স্বয়ং দ্বিবেদীকে দেখেও এই বলতে ইচ্ছা করে : এক জায়গায় কোথাও তোমার সাদৃশ্য নেই। নেই কোথাও তোমার সমতা!

মূল কারণ হলো মনের সেই বিক্ষুব্ধতা—অপূর্ব সৃজনেচ্ছা, যার ঠিক ঠিক সাম্য যদি কোথাও থাকে তবে তা সৃষ্টিকর্তার মনে আছে। তবে অভিব্যঞ্জনার জন্য অনেক রকমের রূপ সুলভ, কবিতা ছাড়া গদ্যে, গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধে আছে। কিন্তু দ্বিবেদী, এর মধ্যে তৈরি কোনও রূপে সৃষ্টি-ইচ্ছা এঁটে যেতে পারে, বলে মনে করেন না। লেখার জন্য তিনি চার চারটি লম্বা গল্প বা উপন্যাস আর 'অশোক ফুলের' মতো কয়েক ডজন ছোট গদ্যকৃতিও লিখেছেন 'যা ললিত প্রবন্ধ' নামে ছাপা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি কি ঠিক ঠিক উপন্যাস বা প্রবন্ধ? এমন কত প্রবন্ধ আছে যাতে কোনও না কোনও গল্প গাঁথা আছে আর এমন উপন্যাসও আছে যার মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। অর্থাৎ চিরপরিচিত ধারায় এমন তালগোল কেন? উপন্যাস ঠিক উপন্যাস নয়, আর প্রবন্ধও ঠিক প্রবন্ধ নয়? এও কি কোনও পুনর্নবতা, পুনর্নবা বিধার একটি প্রচেষ্টা?

দ্বিবেদী নিজে এমন কোনও দাবি করেননি। নিজের বিশেষ ভঙ্গিতে এগুলোকে উনি 'গপ্পো' বলেন। তাঁর অভিন্ন ব্যোমকেশ শাস্ত্রীর এ কথা ভুল নয় যে, কেউ গপ্পো করা তাঁর কাছে শিখুক। ব্যোমকেশ শাস্ত্রী এও বলেন যে, যখন উনি নীরস কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন গপ্পো রচনায় বিশ্রাম পান। 'নীরস কাজ' অর্থাৎ 'প্রাচীন ভারতের কলা বিনোদ' বা 'নাথ সম্প্রদায়'- এর মতো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, তার তুলনায় 'অশোক ফুল' ও 'বাণভট্টের আত্মকথা' অবশ্যই গপ্পো। বিড়ম্বনা হলো, আচার্য দ্বিবেদী যে লেখাগুলোকে 'গপ্পো' বলেন,

সেইগুলিই সবচেয়ে হৃদ্য এবং মূল্যবানও। কোনও কোনও প্রবন্ধে গপ্পো বলা অংশই সারবান মনে হয়, বাকিগুলো গুরুগম্ভীর ছাড়াও ঘসামাজা বলে মনে হয়, যেমন 'অর্থার্ষবাক' প্রবন্ধটি আসলে একটি বক্তৃতা। আটাশ পৃষ্ঠার এই লম্বা ভাষণের প্রারম্ভিক ভূমিকার দুপাতা ছাড়া বাকি ছাব্বিশ পাতার অনেকটা বেকার কথায় ভরা। যাতে দ্বিবেদী কোথাও উপস্থিত নেই। দ্বিবেদীকে সেখানেই দেখা যায়, যেখানে তিনি নিজের নিরদ্ধিতার কথা বলার জন্য ভুসুকুর আড়ে একটি গপ্পো ফেঁদে বসেন। বিচিত্র কথা হলো যে এই মজার গপ্পেই তিনি 'আর্ষবাক' থেকে ভিন্ন 'অর্থার্ষবাক্'-এর মত গভীর তত্ত্ব-সংকেতও দিয়ে ফেলেন, যা শুনে বৌদ্ধদর্শনের পণ্ডিতরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এমন শব্দ এর আগে তাঁরা কখনও শোনেননি।

অর্থাৎ এই গপ্পোই দ্বিবেদীর নিজের বিধা; 'গপ্পো' নয়, 'কোরা গপ্পো'। তৎসম নয়, তদ্ভব। কিছু ভিন্ন অর্থব্যঞ্জক। কিছুটা 'কল্পের' কাছাকাছি হয়তো। দ্বিবেদী নিজে কোথাও এটি খোলসা করেননি। কোথাও কোথাও অবশ্য ঝলক আছে। যেমন 'দেবদারু' প্রবন্ধে। দেবদারু কাঠ দিয়ে ভূত তাড়নো পণ্ডিতের কথা বলে, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে দ্বিবেদী গপ্পের মহিমা বলতে লাগলেন। এইভাবে—'আদিকাল থেকেই মানুষ গপ্পো তৈরি করছে, এখনও তৈরি করে যাচ্ছে। আজকাল আমরা ঐতিহাসিক যুগে বাস করি। প্রাচীন মানুষ কিংবদন্তি যুগে বাস করত, যেখানে ভাষা-মাধ্যমকে তারা অপূর্ণ মনে করত, সেখানে কিংবদন্তি গপ্পো-ভাষার অপূর্ণতা ভরার চেষ্টা। আজও কী আমরা কিংবদন্তি তত্ত্বে প্রভাবিত নই? ভাষা ভীষণভাবে অর্থে বাঁধা। তাতে স্বচ্ছন্দে সঞ্চারশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। কিংবদন্তি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে। ভাষার অভিব্যক্ত ভাষাতীতকে আশ্রয় করে, কিংবদন্তির আবরণ সরিয়ে তথ্যানুসারে যিনি অর্থপ্রদান করেন, তাঁকে মনোবিজ্ঞানী বলা হয়, আবরণের সার্বভৌম রচনাশীলতা চিনতে পারা ব্যক্তিকে শিল্পসমীক্ষক বলা হয়। দুজনকেই ভাষার সাহায্য নিতে হয়, দুজনেই ধোঁকা খায়। ভূত তো সর্ষেতে। যা সত্য, তা সৃজনশক্তির স্বর্ণপাত্রে মুখ বন্ধ হয়ে ঢাকা থেকেই যায়। একের পর এক গপ্পের স্তর জমে যাচ্ছে। সমস্ত চকচকে ঝিনুক কে রূপো ভাবা মানুষের অভ্যাসমাত্র। গপ্পো কোথায় নেই, কি নেই?'

'যাকগে ছাড়ুন তো' বলে দ্বিবেদী এই গম্ভীর তত্ত্ব বিবেচনার উপসংহার করে ফেললেন। কিন্তু দ্বিবেদী রচনা-সংসারের ওপর এই বক্তব্য লাগালে তো এই নিষ্কর্ষ বেরোবে যে, তাঁর লেখায় কোথাও গপ্পো নেই। এইটুকুই নেই, বরঞ্চ যা কিছু আছে সবটাই গপ্পো। তাহলে 'গপ্পো কি নয়' কথার মানে কি দাঁড়ায়? এই দৃষ্টিতে 'অশোক ফুল' ও শিরীষ ফুল' তো গপ্পোই, আম, দেবদারু আর কুটজও গপ্পোই। এই অর্থেই গপ্পো, এর মধ্যে প্রত্যেকটি নিয়ে কিংবদন্তি গড়া হয়েছে। কোথাও পুরোনো কিংবদন্তির অর্থানুসন্ধান করে একটি নতুন কিংবদন্তির সৃষ্টি আর কোথাও পুরোনো কিংবদন্তির সাহায্যে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে।

এই কথা নিয়ে আমার মনে বরাবর কৌতূহল হয় যে 'কল্পলতা'র ওপর কোনও প্রবন্ধ না লিখেও নিজের একটি প্রবন্ধ সংগ্রহের নাম দ্বিবেদী 'কল্পলতা' কেন রাখলেন? তিনি কি প্রবন্ধমাত্রকেই কল্পলতা মনে করতেন? কল্পবৃক্ষ নয়, কল্পলতা। লতায় খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ার যে স্বচ্ছন্দ বৃত্তি আছে, তা বৃক্ষে কোথায়? কল্পের সঙ্গে কল্পনার কোনও

সম্পর্ক থাকলে তো কল্পনার লতাই হতে পারে, গাছ নয় যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অভিশপ্ত, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মত্তদশায় দোল খাওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারে না।

যাইহোক, এইটুকু স্পষ্ট যে 'কল্পলতা' দ্বিবেদীর খুব প্রিয় ছিল। দ্বিবেদীর প্রিয় কবি কালিদাসেরও 'কল্পলতা' খুব পছন্দ ছিল। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র এই ছন্দে যে সাজ-সজ্জায় কল্পলতা বর্ণিত হয়েছে, তা পড়ে তার উপযোগের লোভ সম্বরণ করতে কে পারে—

বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাম্ বর্ণৈরমীকল্পলতাংশুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং দিবৌকসত্তচ্চরিতং লিখন্তি।।

দ্বিবেদীও একাধিকবার এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। সবচেয়ে হৃদ্য প্রসঙ্গ হলো 'পুনর্নবা'-র, যখন দেবদত্ত মঞ্জুলার চিঠি পেল—'পুরো চিঠি কাজলকে কালি তৈরি করে লেখা হয়েছিল। দেবদত্তের হৃদয় ভীষণভাবে আলোড়িত হতে লাগল। তার মুখ দিয়ে অনায়াস বেরিয়ে এলো 'বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীনাম্'—সুরসুন্দরীদের প্রসাধনের পর পড়ে থাকা শৃঙ্গারদানের রঙ থেকে! তাহলে মঞ্জুলা নিজের শৃঙ্গারদানির সবচেয়ে মহার্ঘ এবং সুন্দর প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে এই চিঠি লিখেছে।'

'অশোক ফুল' প্রবন্ধ পড়ার সময় কি আমাদেরও এই রকম মনে হয় না? প্রবন্ধের লালিত্য অনেকটা এমন যাদু করে যেন দেবাঙ্গনার প্রসাধনে পড়ে থাকা বিভিন্ন রঙ দিয়ে দেবতারা কল্পলতার অংশুকের ওপর কোনও যশগান লিখেছেন।

এই প্রসঙ্গে দ্বিবেদী 'কল্পবল্লী'রও যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা মনে হয় প্রাসঙ্গিক। লিখছেন : 'কল্পবল্লী যার অর্থ হয় না, ভাব হয় না, হয় কেবল ছন্দ, কেবল লয়, কেবল গতি-বিশুদ্ধ ইচ্ছা। তপঃপূত মহাত্মার আশীর্বাদের সমান কেবল মঙ্গলেচ্ছা। অর্থ তার পেছনে দৌড়োয়। যা নৃত্যে তাণ্ডব, তাই চিত্রে কল্পবল্লী ও আচারে মাঙ্গল্য-আশীর্বাদ।

এই চিত্রের কল্পবল্লীর সঙ্গে সাহিত্যের কল্পবল্লীর কোনও সম্পর্ক তৈরি হয় কী? দ্বিবেদী যখন নিজের প্রবন্ধ সংগ্রহের নাম 'কল্পলতা' রেখেছিলেন তখন 'কল্পবল্লীর' এই অর্থ কী তাঁর মনে উপস্থিত ছিল? তাঁর সব লেখার না হলেও কিছু ছন্দ সই, খালি প্রবন্ধই আছে, লয়ই আছে গতিই আছে, ভাব বা অর্থ নেই? অথবা ভাব ও অর্থ গৌণ; সুন্দর হলে তা নিজের ছন্দ ও লয়ের জন্যই।

অনেকটা সেইরকম কথা যা জর্জ লুকাচ 'রূপ' সম্পর্কে কখনও বলেছিলেন—'যখন কোনও বস্তু নিজের সমস্ত অন্তর্বস্তুকে রূপে মিশিয়ে দেয়, আর সেই প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ শিল্প হয়ে গেলে তা ফালতু হয় না।'

'ছন্দ' দ্বিবেদীর প্রিয় শব্দ যার কথা প্রায়ই তাঁর মনে পড়ে এবং বিশিষ্ট অর্থে তিনি যার প্রয়োগ করেন। দেবদারু তাঁর কাছে মূর্তিমান ছন্দ মনে হয়। তার ঝাঁকড়া ডাল কাঁটাভরা পাতার এমন তরঙ্গায়িত ছন্দবিতান টাঙায় যে ছায়া চেরির মতো অনুগমন করে।' আবার, 'গাছ কি, সিদ্ধ কোন কবির হৃদয়ের মূর্তিমান ছন্দ—পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিভূত করে তরঙ্গায়িত বিতান শৃঙ্খলাকে সাবধানে সামলিয়ে, বিপুল আকাশের দিকে

একাগ্রীভূত মনোহর ছন্দ।' দ্বিবেদীর দৃষ্টিতে তা 'অর্থাতীত ছন্দ' আর এইজন্য 'অর্থাতীত আনন্দ'-ও। মহাদেবের তাণ্ডবতুল্য। দুটির মধ্যে তিনি মিল দেখেন। একদিকে দেবদারুর গগনচুম্বী শিখা আর অন্যদিকে সমাধিস্থ মহাদেবের নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ঊর্ধ্বগামী জ্যোতি। আসলে, এই প্রসঙ্গে একাগ্রভাবই ছন্দের আত্মা। অন্যত্র তিনি সমষ্টিব্যাপী জীবনগতির সমান্তরালে চলা ব্যষ্টিগত প্রাণবেগকে ছন্দ নাম দেন। তাৎপর্য হলো, ছন্দ দ্বিবেদীর নিজস্ব প্রাণবেগ। এইজন্য তাঁর গদ্যেও ছন্দ আছে। তা পদ্যের ছন্দ নয়, গদ্যের নিজস্ব ছন্দ।

'দেবদারু' থেকেই প্রাণবেগী গদ্যের উদাহরণ নেওয়া যাক :

'কিন্তু এমন কিছু লোক হয়, যারা মুড়ি মুড়কি এক দেখেন। তারা সবাইকে একই রকম দেখেন। তাদের কাছে সেই হৃতস্বাস্থ্য সেই কত্তা, সেই কিপ্টে, সেই খ্যাপাটে, সেই ঝঞ্ঝাটে, সেই লোমশ সেই বাচাল, সেই ভীতু, সেই খিটখিটে, সেই রগচটা, সেই মাথা দোলানো, সেই হাট্টাকাট্টা, সেই দুষ্টু, সেই চনমনে, সেই বাঁকা, সেই চতুরঙ্গী সব সমান।'

দেশি ও তদ্ভব বিশেষণের এই লম্বা তালিকা একসঙ্গে দেখে খুব মজা পাওয়া যায়। নিজের কবিতায় কোনও কবি এমন পংক্তি কি জুড়বেন? কিন্তু না, প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায়, অজ্ঞেয়ও কখনও কখনও এমন কৌশল দেখিয়েছেন। যেমন 'অসাধ্য বীণা'তেই রয়েছে।

কিন্তু এমন দমভাঙা ছন্দ সব জায়গায় নেই। ভাবদশার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দেরও ফের বদল হতে থাকে—গতি ও যতির নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ কবীরের ব্যক্তিত্বের ছন্দ এই রকম : 'এমন ছিলেন কবীর। আপাদমস্তক আপনভোলা, স্বভাবে নির্বন্ধ, অভ্যাসে জেদি, ভক্তের সামনে নিরীহ, ভেকধারীর সামনে প্রচণ্ড, মনে পরিষ্কার, বুদ্ধিদীপ্ত শক্তিশালী, ভেতরে নরম, বাইরে কঠোর, জন্ম থেকে অস্পৃশ্য, কর্মে বন্দনীয়।'

আর অন্যদিকে কুটজ। 'ছোট—খুবই বেঁটে গাছ। চওড়া পাতাও আছে, বড়ও আছে। ফুলে এমন ভরে আছে যে কি বলব। আজব ব্যাপার যেন হাসছে। মনে হচ্ছে যেন প্রশ্ন করছে, কি আমাকে চেন না? উজাড়ের বন্ধু তোমায় চিনি তো, তোমাকে ভালভাবে চিনি। নাম ভুলে যাচ্ছি। প্রায়ই ভুলে যাই। রূপ দেখে প্রায়ই চিনে ফেলি, নাম মনে পড়ে না।' আর পরে যখন এই কুটজকেই উৎসাহিত করেন তো ছন্দ চলে যায় : 'বাঁচতে চাও? কঠোর পাথর ভেদ করে, পাতালের বুক চিরে নিজের ভোগ্য সংগ্রহ কর, বায়ুমণ্ডল চুষে, ঝড়-ঝাপ্টা অগ্রাহ্য করে, নিজের প্রাপ্য উশুল কর, আকাশকে চুম্বন করে তরঙ্গে দুলে উল্লাস শুষে নাও।'

ছন্দ দ্বিবেদীর মজ্জায় আছে। তাঁর ভাষায় বললে, তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বই ছন্দে রচিত। কবিতা লিখুন বা না লিখুন, তাঁর গদ্যই ছন্দে রচিত। কিন্তু তা পদ্যগন্ধী ছন্দ নয়। এই গদ্যের নিজস্ব ছন্দ আর তার নিজস্ব লয় আছে।

তাঁর প্রত্যেক প্রবন্ধের সম্পূর্ণ গঠনে এই লয় আছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের আরম্ভ এক বিশেষ ভাবে হয় আবার তার শেষ হওয়ারও নিজস্ব ভঙ্গি আছে। মাঝে কখনও এগিয়ে যায়, পিছিয়ে আসে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, চক্কর মারে, যেন কোনও বিস্মৃত কথা মনে করেন, চুপিসাড়ে কোথাও সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ বা হিন্দির কোনও কবিতার

সঠিক পংক্তি বুনতে বুনতে শেষে যেন সম অবস্থায় পৌঁছে যান। প্রবন্ধ যেন কোনও রাগবন্ধন। সংগীতের ঠাট। 'অশোক ফুলে' এই বন্ধ-নির্মাণ সহজেই দেখা যেতে পারে। অবশ্য অন্য প্রবন্ধেও গদ্যবিধানের এই রঙ পাওয়া যায়।

এই ছন্দোবদ্ধতার জন্যই দ্বিবেদীর প্রায় সমস্ত ভাল প্রবন্ধ থেকে গুঞ্জন-অণুগুঞ্জন হয় যা প্রবন্ধ শেষ হওয়ার পরেও মনের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঝংকার তোলে। বোঝাই যায় না যে, তা চিন্তাতরঙ্গ না প্রকাশতরঙ্গ। তরঙ্গায়িত হওয়া কত মনোহর।

'গপ্পো' ও 'ছন্দ' এই বীজশব্দ দুটি দিয়ে দ্বিবেদীর প্রবন্ধের গঠন ও বুনুনির কিছু আভাস পাওয়া যায়। গপ্পো করার এমন অবস্থা যে, কোথায় আম আর কোথায় বিছে—তবুও এ দুটির মধ্যে দ্বিবেদী সম্পর্ক-সূত্র খুঁজেই ফেলেন। এইভাবেই কন্দর্প ও গন্ধর্বকেও ধ্বনিবিজ্ঞানের নিয়মে একটু নাড়িয়ে নিয়ে এক করে ফেলার চমৎকার চেষ্টা করেন।

কবি প্রসাদের শ্রদ্ধা তো নিজের স্মিতিরেখায় জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়ার ত্রিপুরকেই আকাশে একজোট করেছিল। দ্বিবেদীর সৃজনমূলক কল্পনা তো না জানি কত অসম্বদ্ধ বস্তুকে একসূত্রে গাঁথতে থাকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, গাঁটছড়া বাঁধা গপ্পো শিল্পে হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর কোনও জুড়ি নেই। যদিও সবই 'ন্যারেটিভ' গপ্পো, তবুও গপ্পোকে বিশ্বাসযোগ্য করার শিল্প দ্বিবেদীই জানতেন।

এই শিল্প কি উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছিলেন? বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথেরও এমনি 'বিদ্যুৎধর্মিতা' ছিল। তিনিও 'বিদ্যুৎ চমকানোর মতো এক নিমেষেই নিজর মূল চিন্তা আমাদের সামনে উপস্থিত করে ফেলেন।' যাইহোক, তথ্য হলো যে 'অশোকফুল' -এর মাধ্যমে দ্বিবেদি ভারতীয় সংস্কৃতির যে উদাহরণ প্রস্তুত করেছেন তা অবশ্যই 'বিদ্যুৎধর্মী' এবং মৌলিকও।

এই প্রক্রিয়ায় দ্বিবেদী শব্দের সঙ্গে যেভাবে খেলেন এবং প্রতিটি শব্দের অর্থক্রীড়ায় যত রস পান তা আরও মনোগ্রাহী। আম ও কুটজের ব্যুৎপত্তির সঙ্গে ইতিহাসের ভাঁজ খুলতে যেমন রস পান তা দর্শনীয়। তাঁর কৌতুকবৃত্তি থেকে দেবদারুও রেহাই পায়নি। মজার কথা হলো নিজের উপন্যাসেও তিনি এরকম অর্থক্রীড়ার অবকাশ বার করে নেন আর মাত্র একটি শব্দের সাহায্যে সম্পূর্ণ কিংবদন্তি তৈরি করে ফেলেন, চারুচন্দ্রলেখে গধৈয়াতাল নিয়ে যেমন করেছেন।

উল্লেখ্য হলো যে সব জায়গায় এই অর্থক্রীড়া কেবল 'চমৎকারই' হয় না অর্থাৎ এতে রস থাকে। যেমন 'মেঘদূত : একটি পুরোনো গল্পে' অন্য ছন্দে আসা 'সানু' শব্দের ব্যাখ্যা। 'পাহাড় যেখানে সামান্য সমান হয়ে নিচের দিকে ঢালু হয়, সেই ঢলকে সংস্কৃতে 'সানু' বা পর্বত-নিতম্ব বলে। বিরহী যক্ষ পর্বতের সানুদেশে গায়ে লাগা কালো মেঘ দেখে। কেমন দেখে? যেন কোনও কালো মত্ত হাতি পর্বতের সানুদেশে ঢুঁসো মারার খেলা খেলছে। কোনও দিন ইন্দ্রের মত্ত হাতি এইভাবেই ঢুঁসো মেরে কুবেরের বাগান নষ্ট করেছিল। যক্ষের সোনার সংসার ধূলোয় মিশে গিয়েছিল। তাকে পৃথিবীর এক কোনায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, প্রিয়া থেকে দূর—অনেক দূরে আজ এই মেঘও মত্ত হাতির মতো পর্বতের সানুদেশে ঢুঁসো মারছে। যক্ষ হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠল। তার প্রিয়তমাকে মনে পড়ল—'

পর্বত-নিতম্বকে 'সানু' বলা হয়। তার উল্লেখ যদিও মেঘদূতের টীকাকারেরা করেছেন, কিন্তু তার সাহায্যে দ্বিবেদি যে গপ্পো ফেঁদেছেন তাতে বিশেষ রস আছে। কামভাবনার এমন শিষ্ট সংকেত দ্বিবেদীর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এ নিছক চমৎকার নয় বরং রসও আছে।

যদিও দ্বিবেদি প্রত্যেক প্রবন্ধে কোথাও না কোথাও নিজের চিন্তা বা পীড়ার ছবি না দিয়ে পারেন না, তবুও সত্যি কথা হলো যে কোথাও কোথাও উনি নিজের সম্পর্কে খোলাখুলি আর কোথাও কোথাও বিষয়ান্তর করে কিছু বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। বলতে কোনও সংকোচ নেই, তাঁর প্রবন্ধে এই আত্মপ্রসঙ্গ সর্বোত্তম হয়ে উঠেছে বিশেষত উনি যেখানে নিজের হাসেন বা নির্মম আত্মস্বীকৃতি দেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর শেষ উপন্যাস 'অনামদাসের পুঁথি'-তে 'এখন অনেক নেচেছি, হে গোপাল' শীর্ষক ভূমিকা সবচেয়ে মার্মিক। তাঁর মৃত্যুর চার বছর আগে লেখা। দ্বিবেদী বলছেন :

'মহাত্মাদের কথা স্বতন্ত্র। হয়তো তাঁরা নিজের বাহানায় সাধারণ মানুষের মনকে কিছু ভাল কথা শেখাতে চান। কিন্তু আমি সাধারণ মানুষের মতোই ভাবতে পারি। কাউকে শেখানো উদ্দেশ্য নয়। পেছনের দিকে দেখি বিরাট রিক্ততা! যা কিছু করছিলাম তা কী সত্যিই কোনও কাজের ছিল? নিজের সীমা ত্রুটি ক্ষুদ্রতা লুকিয়ে নিজেকে এমনভাবে দেখানো যে সত্যিই আমি কিছু, এই তো করেছি। ছোট ছোট কথার জন্যে ঝগড়া করাই বাহাদুরি ভেবেছি, পেট ভরার জন্য কাড়াকাড়িকেই 'কম' মেনেছি, কোনও বড় উদ্দেশ্যে সমর্পিত হতে পারিনি, কারও দুঃখ দূর করার জন্যে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারিনি। সারা জীবন কেবল লোক দেখানো, ভাঁড়ামি, হায় হায় করেই কেটে গেল। আমারই মতো কাউকে দেখে হয়ত তুলসীদাস বলেছিলেন—'কেউ বলুক ভাল, কিছু দাও আশা বাসনা না মন হতে যায়'।'

প্রবন্ধে মানুষ প্রায়ই ব্যক্তিব্যঞ্জকতা চায়, এমনকী ব্যক্তিব্যঞ্জক প্রবন্ধকেই প্রবন্ধ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ-পারদর্শী 'চতুর সুজান' প্রায়ই প্রবন্ধের আদি প্রবর্তক মিশেল মান্তেনের কথা বলেন আর প্রবন্ধের লক্ষণরূপে মান্তেনের এই উক্তি উদ্ধৃতও করেন— 'কোনও অন্য বিষয় অপেক্ষা আমি স্বয়ং অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে নিজের অধ্যয়ন করি। এই আমার তত্ত্বজ্ঞান, এই আমার ভৌতিক শাস্ত্র।' হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মান্তেন পড়েছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। পড়ে থাকলে কোথাও না কোথাও উল্লেখ করতেন কিন্তু উক্ত অবতার থেকে জানা যায় যে তিনি তুলসীদাস অবশ্যই পড়েছিলেন, বিশেষভাবে তাঁর 'বিনয় পত্রিকা'। কিন্তু মান্তেন বা তুলসীদাস পড়লেই ব্যক্তিব্যঞ্জকতা আসে না। যদি এইভাবেই ব্যক্তিব্যঞ্জকতা আসে আর তা অমর কৃতিত্ব হয়ে যায়, তাহলে প্রবন্ধজগতে মান্তেনের হুড়োহুড়ি ভিড় হয়ে যেত। ব্যক্তিব্যঞ্জকতা কি বস্তু, তা কোথা থেকে আসে, কীভাবে আসে তা স্বয়ং প্রবন্ধই বলে।

এইরকম আত্মব্যঞ্জকতায় অনুভবের স্ফুলিঙ্গ অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়ে যা বাণীর মতো মনে গেঁথে যায়। দ্বিবেদি স্বীকার করেছেন, তিনি মহাত্মাদের মতো সাধারণ মানুষকে কিছু শেখাবার জন্য লিখছেন না। অর্থাৎ তিনি 'কোনও তৈরি সত্য তুলে নিয়ে আমাদের হাতে রাখছেন না!' যা কিছু আছে তা নিজের অনুভূত সত্য। গভীর পীড়ার ভেতর থেকে

বেরিয়ে আসা কিছু অনুভব-কণা। আর এইরকম এই জ্বলজ্বলে কণা দ্বিবেদীর প্রবন্ধে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে—কোথাও ফুলের গাদায়—আর কোথাও ধূলো বা ছাইয়ের গাদায়। উদাহরণ :

—'পাণ্ডিত্যও একটি বোঝা যতই ভারি হয়, ততই তাড়াতাড়ি ডোবায়। যখন তা জীবনের অঙ্গ হয়ে যায়, তখন সহজ হয়ে যায়। তখন আর বোঝা মনে হয় না।' (অশোক ফুল)

—'অবধূতের মুখ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সরস রচনা হয়েছে।' (শিরীষ ফুল)

—'বেঁচে থাকাও একটি শিল্প। শুধু শিল্পই নয়, তপস্যাও।' (কুটজ)

—'যা সবার ভাল লাগে তাই অর্থ, একজনের লাগল, বাকিদের লাগল না, তাহলে অনর্থ।'

—'শাস্ত্রার্থে কেউ হারে না, হারানো হয়।'

—'সমস্ত লাগালাগি ভ্রম। চোখেরও।' (দেবদারু)

—'পণ্ডিতদের কথার সঙ্গতি লোক পরম্পরা থেকেই হয়।' (আমে আবার বোল এসেছে)

—'দুর্বলদের মধ্যে ভাবুকতা বেশি হয়।' (বসন্ত এসে গেছে)

—'বসন্ত আসে না, নিয়ে আসা হয়।'

—'সাফল্য এবং চরিতার্থতায় পার্থক্য আছে।' (নখ কেন বাড়ে)

—'এ বোঝা বড় কঠিন যে কখন পণ্ডিতের শাস্ত্র তার বুদ্ধি ঢেকে ফেলে আর কখন তার বুদ্ধি শাস্ত্রকে।' (ঠাকুরের জন্য বৈঠক)

—'একবার ভুলভাল যা বলে দিলাম, তার সঙ্গে চিপটে থাকা ভীষণ হতে পারে, হিতকর নয়।'

—'করিয়েরা ইতিহাস-নির্মাতা হয়, খালি ভাবিয়েরা ইতিহাসের ভয়ংকর রথচক্রের নিচে পিশে যায়। ইতিহাসের রথ তারাই চালায় যারা ভাবে ও ভাবনাকে রূপ দেয়।' (ভীষ্মকে ক্ষমা করা হয়নি)

—'দেবতাই দেবতাকে মারতে জানে। লোহাই লোহা কাটতে পারে।' (মেঘদূত : এক পুরোনো গল্প)

—'কারও ভাল না হলে তার কল্পিত গল্প প্রচার হওয়া সামাজিক অপরাধই।' (এখন অনেক নেচেছি, হে গোপাল)

যেমন রাহুলজী পাঁচ খণ্ডে 'আমার জীবন যাত্রা' লেখার শেষে তাকে শাস্ত্রবদ্ধ করার জন্য 'ঘুমক্কর শাস্ত্র' নামক বই লিখেছেন, তেমনি অনেক প্রবন্ধ লেখার পর প্রবন্ধ নিয়ে সামান্য শাস্ত্রগত চর্চাও করেছেন। তাঁর ছাত্রোপযোগী বই 'সাহিত্য সহচরে' সেই চর্চা আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রবন্ধ সম্পর্কিত এই সাহিত্যচর্চা স্বয়ং তাঁর প্রবন্ধের সামনে বেশ

ফিকে; তবুও তার দ্বারা দ্বিবেদীর প্রবন্ধে বৈবিধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তিনি অন্তত প্রবন্ধের চার রূপকে স্বীকৃতি দিয়েছেন :

1. বার্তালাপমূলক, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'একটি' কুকুর ও একটি ময়না'। যদিও বার্তালাপের অংশ 'ঠাকুরের জন্য বৈঠক' ও অন্যত্রও আছে।

2. বক্তৃতামূলক—'মানুষই সাহিত্যের লক্ষ্য' প্রবন্ধ সত্যিই বক্তৃতা, কিন্তু দ্বিবেদিজীর অন্য প্রবন্ধ ও অন্যত্রও যথাতথা প্রকট হয়েছে।

3. নিয়ন্ত্রণহীন গল্পমূলক—যেমন 'আবার আমের বোল এসেছে' ও 'দেবদারু', কিন্তু সর্বত্র কিছু না কিছু 'গপ্পোতত্ত্ব আছে।'

4. স্বগত চিন্তামূলক—দ্বিবেদীর অধিকাংশে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধই এতে রাখা যেতে পারে, যদিও এই স্বগত চিন্তা হাল্কা বিনোদমুক্ত নয়।

5. আচার্য দ্বিবেদী স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে এই ধরনের বিভাজন খুব ভাল নয়, কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই যে প্রচলিত শ্রেণী বিভাজন থেকে এটি একটু স্বতন্ত্র আর দ্বিবেদীর প্রবন্ধশৈলির বাহ্যিক বৈবিধ্যকে কিছুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। এই আলোচনায় এর বেশি কোনও উপযোগিতা নেই।

প্রবন্ধের দৃষ্টিতে আচার্য হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর লেখা থেকে এক দেড়শো পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট সংকলন তৈরি করা সহজ কাজ নয়। বর্তমানে যে 'আচার্য হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী রচনাবলি' পাওয়া যায় তা প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠায় ব্যপ্ত এগারো খণ্ডের বিশাল সাহিত্য। রচনাবলির অষ্টম এবং নবম খণ্ডে কেবল প্রবন্ধই আছে যাতে প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। এই প্রবন্ধগুলির মধ্য থেকে বাছতে হলে কোনও কঠিন কাজ হতো না। তেমনি যদি কেবল তথাকথিত 'ব্যক্তিব্যঞ্জক প্রবন্ধ' বা 'ললিত প্রবন্ধ' নেওয়ার কথা হতো তাহলেও কোনও অসুবিধা হতো না। কিন্তু তাতে হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর চিন্তাধারা এবং সৃজনের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব হতো না। তার জন্যে তথাকথিত প্রবন্ধের সীমার বাইরে যেতেই হবে। সেইজন্যে এই সংকলনে 'কবীর' গ্রন্থের একটি অধ্যায় রাখতে হয়েছে আর 'মেঘদূত : একটি পুরোনো গল্প'র মতো বইয়েরও প্রারম্ভিক অংশ নেওয়া হয়েছে। যাকে নিছক টীকা মনে করে প্রায় উপেক্ষিত করা হয়েছে। এইরকম 'অনামদাসের পুঁথি' যদিও উপন্যাস, তবুও তার প্রস্তাবনায় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের স্বাদ আছে বলে যে কোনও প্রবন্ধ সংগ্রহে স্থান পাওয়ার যোগ্য। সত্যি কথা কি, পূর্ণ স্বাধীনতা পেলে আমি দ্বিবেদীর অন্য উপন্যাস থেকেও কিছু অংশ বেছে রাখতাম এবং দেখতাম যে কি করে তাদের স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বলে স্বীকার করা না হয়। যাইহোক, এমন কিছু ইচ্ছা থাকে, যা পালন করাই সুখকর।

পরিশেষে একথা বলা জরুরি যে প্রত্যেক সংকলনের মতো এই সংকলনও কিছুদূর পর্যন্ত একান্ত নিজের—পছন্দ অপছন্দও নিজের। তবুও অন্যের স্বীকৃতির আশায়! যদি তা 'হ্যাঁ', ও 'কিন্তু'র সঙ্গেও গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে পরিতোষ হবে আর সম্ভবত গুরুদেবের আত্মাও দুঃখী হবে না। এবমস্তু।

নামবর সিং

এক

অশোক ফুল

অশোকে আবার ফুল ফুটেছে। এই ছোট্ট ছোট্ট লাল লাল ফুলের মনোহর স্তবকে কি মোহন ভাব। অনেক চিন্তাভাবনা করে কন্দর্পদেব লক্ষ লক্ষ মনোহর ফুল বাদ দিয়ে কেবল যে পাঁচটি ফুল নিজের তূণনীরে স্থান দেওয়ার যোগ্য মনে করেছিলেন, অশোক তার মধ্যে একটি।

কিন্তু পল্লবিত অশোক দেখে আমার মন উদাস হয়ে যায়। এজন্য নয় যে সুন্দর কোনও বস্তুকে হতভাগ্য মনে করায় আমি বিশেষ আনন্দ পাই। কিছু লোক অবশ্য পান। তাঁরা দূরদ্রষ্টা, যা কিছুই সামনে পড়ে, তার জীবনের শেষ মুহূর্তের হিসাবনিকাশ করে নেন; আমার দৃষ্টি এতদূর যায় না। তবুও আমার মন অশোক ফুল দেখে উদাস হয়ে যায়। আমার অন্তর্যামীই হয়তো আসল কারণ জানেন, কিছুটা অনুমান আমিও করতে পারি। বলছি।

ভারতীয় সাহিত্যে, এজন্য জীবনেও, এই ফুলের আসা ও যাওয়া দুটিই বিচিত্র নাটকীয় ঘটনা। এমন তো কেউ বলতে পারবে না যে, কালিদাসের আগে ভারতবর্ষে এই ফুলের নাম কেউ জানত না; কিন্তু কালিদাসের কাব্যে শোভা ও সুকুমারত্বের যে ভাব নিয়ে এসেছে তা প্রথমে কোথায় ছিল। নববধূর গৃহপ্রবেশের মতো এই আসায় শোভা গরিমা পবিত্রতা ও সুকুমারত্ব আছে। হঠাৎ মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই মনোহর ফুল সাহিত্যের সিংহাসন থেকে স্থানচ্যুত হলো। যেভাবে বুদ্ধ, বিক্রমাদিত্যের নাম মনে করা হয়, সেইভাবে অশোক ফুলের নাম পরেও মনে করা হতো। কালিদাসের কাছে অশোক অপূর্ব সম্মান পেয়েছে। সুন্দরীদের আসিঞ্জনকারী নূপুর পরা পায়ের মৃদু আঘাতে ফুটত, কোমল গালের ওপর কানের দুল হয়ে ঝুলত আর চঞ্চল নীল চুলের অচঞ্চল শোভা হাজারগুণ বাড়িয়ে দিত। মহাদেবের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করত, মর্যাদা পুরুষোত্তমের হৃদয়ে সীতার ভ্রম সৃষ্টি করত ও মনোজন্মা দেবতার ইশারায় কাঁধের ওপরেই ফুটত। অশোক কোনও কুশল অভিনেতার মতোই ঝপ করে রঙ্গমঞ্চে এসে দর্শকদের অভিভূত করে চলে যেত। কেন এরকম হলো? আজও কবিদের দুনিয়ায় কন্দর্পদেবের অন্যান্য বাণের কদর তো একই রকম আছে। অরবিন্দকে কে ভুলেছে, আমকে কেউ ভুলেছে আর নীলোৎপলের মায়াত্যাগ কে করতে পেরেছে? নবমল্লিকার অবশ্য এখন বিশেষ আদর

নেই; বেশি কদর অবশ্য সে কোনওদিনই পায়নি। অশোককেই ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার মন বারবার ভারতীয় রস সাধনার পার হয়ে আসা হাজার বছরের ওপর বর্ষিত হতে চায়। এই মনোহর ফুল কি ভোলার জিনিস? সহৃদয়তা কি হারিয়ে গিয়েছিল? কবিতা কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? না, আমার মন এসব মেনে নিতে তৈরি নয়। উত্তর ভারতে এক তরঙ্গায়িত পত্রের নিষ্ফলা গাছকে অশোক বলা হতে লাগল; অপমান করেই স্মরণ করা হলো। এতো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে!

কিন্তু আমার স্বীকার করা না করায় কি হয়? খ্রিষ্টাব্দের প্রায় শুরু থেকেই সুন্দর অশোক ফুল ভারতীয় ধর্ম সাহিত্য ও শিল্পে অদ্ভুত মহিমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সেই সময়েই শতাব্দী-পরিচিত যক্ষ ও গন্ধর্বেরা ভারতীয় ধর্ম সাধনাকে একেবারে নতুন রূপে বদলে দিয়েছিল। পণ্ডিতেরা হয়তো ঠিকই বলেছেন, গন্ধর্ব এবং কন্দর্প আসলে একই শব্দের আলাদা উচ্চারণ। কন্দর্পদেবের অশোককে বেছে নেওয়া অবশ্যই আর্যেতর সভ্যতার দান। বরুণ কুবের বজ্রপাণি যক্ষপাতি আর্যেতর জাতির উপাস্য ছিলেন। কন্দর্প যদিও কামদেবতার নাম হয়ে গেছে, তবুও সেটি গন্ধর্বেরই সমার্থক। শিবের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে একবার মার খেয়েছেন, বিষ্ণুকে ভয় পেতেন ও বুদ্ধদেবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু কন্দর্পদেবও হার মানার পাত্র নন। বারবার হেরে গিয়েও নিচু হননি। নিত্য নতুন অস্ত্রের প্রয়োগ করতেন। অশোক সম্ভবত শেষ অস্ত্র। এই নতুন অস্ত্র দিয়েই ঘায়েল করেছিলেন, শৈবমার্গকে অভিভূত করেছিলেন আর শক্তিসাধনাকে নত করেছিলেন। বজ্রযান ও কৌলসাধনা এর প্রমাণ আর কাপালিক মত এর সাক্ষি।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'মহামানবসমুদ্র' বলেছিলেন। বিচিত্র এই দেশ। অসুর আর্য শক হুন নাগ যক্ষ গন্ধর্ব এসেছে—না জানি কত মানব জাতি এখানে এসেছে আর বর্তমান ভারতবর্ষ গড়তে হাতে হাত মিলিয়েছে। যাকে আজ হিন্দু রীতি-নীতি বলা হয়, তা অনেক আর্য ও আর্যেতর উপাদানের অদ্ভুত মিশ্রণ। এক-একটি পশু, এক-একটি পাখি না জানি কত-কত স্মৃতিভার নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। অশোকেরও নিজস্ব স্মৃতি পরম্পরা আছে। আম বকুল ও চম্পারও আছে। সব কি আমাদের জানা আছে? যতটা আমরা জানি তারই মানে কি সুস্পষ্ট? না জানি কোন কু-মুহূর্তে মনোজন্মা দেবতা শিবের ওপর বাণ ছুড়েছিল! শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর 'বামন পুরাণ' (ষষ্ঠ অধ্যায়) অনুসারে আমরা জানি যে, তার রত্নময় ধনুক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়েছিল। রুক্ম-মণি দিয়ে তৈরি হাতল ভেঙে পড়ল আর চম্পা ফুল তৈরি হলো। হীরের তৈরি দুই কিনারা ভেঙে পড়ল আর মহুয়া ফুলে বদলে গেল। ভালই হলো। ইন্দ্রনীল মণির তৈরি অগ্রভাগ ভেঙে সুন্দর পাটল ফুলে পরিবর্তিত হলো। এটাও খারাপ হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর হলো চন্দ্রকান্ত মণির মধ্যদেশ, যা ভেঙে চামেলি ও বিদ্রুমের তৈরি প্রান্তভাগ বেলফুল হলো। স্বর্গজয়ী কঠোর ধনুক মাটিতে পড়েই নানান ফুলে বদলে গেল। স্বর্গীয় জিনিস ধরার সঙ্গে মিলিত না হলে মনোহর হয় না।

কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। এ কথার রহস্য কি? এটা কি পুরাণকাবের সুকুমার কল্পনা নাকি সত্যিই এই ফুলগুলি ভারতে গন্ধর্বের দান? এক নিশ্চিত সময়ের আগে

আমাদের সাহিত্যে এই ফুলগুলোর কথাই পাওয়া যায় না। সোম তো নিশ্চিতভাবে গন্ধর্বদের থেকে কেনা হতো। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞবিধি ও বিদান সুরক্ষিত আছে। এই ফুলগুলোও কি তাদের থেকেই পাওয়া?

ভাবনাচিন্তা না করেই কিছু কথা ঘুরে ফিরে আমার মাথায় আসছে। যক্ষ ও গন্ধর্বদের দেবতা কুবের সোম অপ্সরা—যদিও পরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্বীকৃত, তবুও প্রাচীন সাহিত্যে অপদেবতা রূপেই পাওয়া যায়। বৌদ্ধসাহিত্যে তো বেশ কয়েকবার বুদ্ধদেবকে বাম দিয়েছে বলা হয়েছে। মহাভারতে এমন অনেক উপাখ্যান আছে যাতে সন্তানকামী স্ত্রী সন্তানকামনা নিয়ে বৃক্ষের অপদেবতা যক্ষের কাছে যেত। যক্ষ ও যক্ষিণীকে সাধারণত বিলাসী ও উর্বরতাজনক দেবতা মনে করে হতো। কুবের তো অক্ষয় নিধির অধীশ্বরও। যক্ষা রোগের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। ভরহুত বোধগয়া সাঁচি ইত্যাদি স্থানের মূর্তিতে সন্তানকামী স্ত্রীরা যক্ষের সান্নিধ্যের জন্য গাছের কাছে যাচ্ছে, খোদাই করা আছে। এই গাছের কাছে খোদাই-করা মূর্তির নারীরা প্রায় নগ্ন; কোমরে চওড়া মেখলা পরা। এই সব গাছেদের মধ্যে অশোকই সবচেয়ে রহস্যময়। সুন্দরীদের চরম-তাড়নে তাতে দোহদের সঞ্চার হয় আর পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে ব্রত করলে এবং অশোকের আটটি পাতা খেলে নারীর সন্তান কামনা ফলবতী হয়। 'অশোক-কল্প' অনুসারে অশোক ফুল দু রকমের, শাদা ও নীল। তান্ত্রিক ক্রিয়ায় সিদ্ধিপ্রদ মনে করে শাদা ফুল ব্যবহৃত হয় আর লাল স্ববর্দ্ধক। এ সমস্ত কথার রহস্য কি? আমার মন প্রাচীনযুগের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন আকাশে সুদূরে উড়ে যেতে চায়। হায়, ডানা কোথায়?

এটা আমার মনে হয় প্রাচীনযুগের কথা। আর্যদের লেখা সাহিত্যই আমাদের কাছে বর্তমান। সেখানে সব কিছু আর্য দৃষ্টিতেই দেখা হয়েছে। আর্যদের সঙ্গে নানা জাতির সংঘর্ষ হয়েছে। কেউ কেউ তাদের অধীনতা স্বীকার করেনি, তারা কিছুটা অহংকারী ছিল। ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। পুরাণের এর প্রমাণ আছে। এত পুরোনো কথা যে সমস্ত যুযুধান শক্তি পরে দেবযোনি-জাতি মেনে নিয়েছিল। প্রথম লড়াই সম্ভবত অসুরদের সঙ্গে হয়েছিল। এরা খুব অহংকারী জাতি ছিল। আর্যদের প্রভুত্ব এরা কখনও স্বীকার করেনি। তারপর দানব দৈত্য ও রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। গন্ধর্ব এবং যক্ষদের সঙ্গে কোনও যুদ্ধ হয়নি। তারা সম্ভবত শান্তিপ্রিয় জাতি ছিল। ভরহুত সাঁচি ও মথুরায় পাওয়া যক্ষিণী মূর্তিগুলির গড়ন দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায়, এরা পাহাড়ি জাতি ছিল। হিমালয় প্রদেশই গন্ধর্ব যক্ষ ও অপ্সরাদের নিবাসস্থান। আজকের ভাষায় এদের সমাজ সম্ভবত 'পুনালুয়ান সোসাইটি' ছিল, সম্ভবত তার থেকেও আদিম। কিন্তু নাচগানে তারা ছিল পারদর্শী। যক্ষ ধনীও ছিল। তারা বানর ও ভাল্লুকের মতো কৃতপূর্ব অবস্থায়ও ছিল না আর রাক্ষস বা অসুরদের মতো ব্যবসা বাণিজ্য করার মতো অবস্থায়ও ছিল না। তারা মণি ও রত্নের সন্ধান জানত, পৃথিবীর গর্ভে জমা রত্নকোষের খবর রাখত এবং সহজেই ধনী হয়ে যেত। সম্ভবত এইজন্যই তাদের মধ্যে বেশি বিলাসিতা ছিল। পরে এদের অত্যন্ত সুখি জাতি মনে করা হতো, যক্ষ ও গন্ধর্ব একই শ্রেণীর ছিল, কিন্তু দুই শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা কিছুটা আলাদা ছিল; কীভাবে কন্দর্পদেবকে তার সৈন্যসমেত ইন্দ্রের মোসাহেব হতে হয়েছিল, তা খুবই মনোরঞ্জক গল্প। কিন্তু এখানে

এসব পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা কেন? সত্যি কথা হলো, অনেক পুরোনো যুগে নানান জাতির সঙ্গে আর্যদের লড়তে হয়েছিল। তাঁরা অহংকারী ছিল, হার স্বীকার করতে তৈরি ছিল না, পরবর্তী সাহিত্যে ঘৃণাভরে তাঁদের স্মরণ করা হয়েছে। আর যারা সহজেই বন্ধু হয়ে গিয়েছিল, তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার ভাব ছিল না। অসুর রাক্ষস দানব ও দৈত্যেরা প্রথম গোষ্ঠীভূক্ত এবং যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ বিদ্যাধর বানর ও ভালু—এরা দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত। পরবর্তী হিন্দু-সমাজ এদের সবাইকে অদ্ভুত শক্তির আশ্রয় বলে মনে করত, সবাই দেব-বুদ্ধির পোষণ করত।

অশোক-বৃক্ষের পূজা গন্ধর্ব ও যক্ষদের দান। প্রাচীন সাহিত্যে এই বৃক্ষ-পূজা উৎসবের বেশ সরস বর্ণনা পাওয়া যায়। আসলে অশোক নয়, তারা অধিষ্ঠাতা কন্দর্পদেবের পূজা করত। বলা হতো 'মদনোৎসব'। মহারাজা ভোজের 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' থেকে জানা যায় যে ত্রয়োদশীর দিন এই উৎসব হতো। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'রত্নাবলী'-তেও এই উৎসবের অত্যন্ত সরস এবং সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। আমি যখন অশোক ফুলের লাল লাল থোকো দেখি, আমার চোখের সামনে তখন প্রাচীন পরিবেশ ভেসে ওঠে। রাজপরিবারে সাধারণত রানি নিজের সুনূপুর চরণের আঘাতে রহস্যময় এই বৃক্ষকে পুষ্পিত করতেন। কখনও কখনও নিজের জায়গায় রানি অন্য কোনও সুন্দরীকে নিযুক্ত করতেন। কোমল হাতে অশোক পল্লবের কোমলতর গুচ্ছ, আলতায় রাঙানো নূপুর পরা চরণের মৃদু আঘাতে অশোকের পাদদেশ আহত হতো—নিচে মৃদু রুণরুণ আর ওপরে লাল ফুলের উল্লাস। কিশলয় আর কুসুমস্তবকের মনোহর ছায়ার নিচে স্ফটিক আসনে প্রিয়তমকে বসিয়ে সুন্দরীরা আবীর কুমকুম চন্দন ও পুষ্পসম্ভার দিয়ে প্রথমে কন্দর্পদেবের পূজা করত, পরে ভঙ্গিমা দিয়ে পতির চরণে বসন্ত পুষ্পের অঞ্জলি ছড়িয়ে দিত। সত্যি সত্যিই খুব মাদক-উৎসব। অশোক স্তবকে আজও সেই মাদকতা আছে; কিন্তু কে পাত্তা দেয়? এই ফুলের সঙ্গে কি মামুলি স্মৃতি জড়িত?

ভারতবর্ষের সুবর্ণযুগ এই ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়িতে দোল খায়। বলা হয় পৃথিবী খুবই ভুলো। কেবল ততটাই মনে রাখে যা দিয়ে তার স্বার্থ সিদ্ধি হয়। বাকি সব ছুড়ে ফেলে এগিয়ে যায়। সম্ভবত অশোক কোনও স্বার্থ সিদ্ধিতে লাগেনি। পৃথিবী তাকে মনে রাখবে কেন? সমস্ত পৃথিবী তো স্বার্থে ভরা।

অশোক-বৃক্ষ যতই মনোহর হোক, যতই রহস্যময় হোক যতই অলঙ্কারময় হোক, আসলে সে সেই বিশাল সামন্ত সভ্যতার পরিষ্কৃত প্রতীক, যারা সাধারণ প্রজার শ্রমদ্বারা পালিত, তাদের রক্তকণিকার সার খেয়ে বেড়ে উঠেছিল আর কোটি কোটি মানুষকে উপেক্ষা করে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তা আর বলার অপেক্ষা করে না। সামন্তরা হারিয়ে গেছে, সমাজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে আর মদন-উৎসবের ধূমধামও শেষ হয়ে গেছে। সন্তানকামিনীরা গন্ধর্বের চেয়েও বেশি শক্তিশালী দেবতাদের বরদান পেতে লাগল—পির ভূত ভৈরব কালী-দুর্গারা যক্ষের ইজ্জত কমিয়ে দিল। দুনিয়া নিজের রাস্তায় এগিয়ে গেল, অশোক রইল পেছনে পড়ে।

মানব জাতির দুর্দম-নির্মম মৃত্যুর হাজার হাজার রূপ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মানুষের জীবনীশক্তি বড়ই নির্মম, সে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৃথা মোহ পিষে এগিয়ে চলে।

না জানি কত ধর্মাচার বিশ্বাস উৎসব ও ব্রত ধুয়ে মুছে এই জীবনধারা এগিয়ে গেছে। সংঘর্ষ মানুষকে নতুন শক্তি দিয়েছে। আমাদের সামনে আজ সমাজের যে রূপ, তা না জানি কত গ্রহণ আর ত্যাগের পরিণাম। দেশ ও জাতির বিশুদ্ধ সংস্কৃতি তো পরের কথা। সবকিছুতেই ভেজাল, সবকিছুই অবিশুদ্ধ। মানুষের বাঁচার ইচ্ছাই কেবল শুদ্ধ। সে গঙ্গার অবাধিত-অনাহত ধারার মতো সবকিছু হজম করার পরও পবিত্র। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোহ ক্ষণিক বাধা উপস্থিত করে, ধর্মাচারের সংস্কার কিছু সময়ের জন্য এই ধারার সঙ্গে টক্কর নেয়, কিন্তু এই দুর্দম প্রবাহে সবকিছুই বয়ে যায়। এই জীবনীশক্তিকে যতই সমর্থ করে, ততই তার অংশ হয়ে যায়, বাকি ফেলে দেওয়া হয়। ধন্য মহাকাল, তুমি কতবার মানবদেবতার দর্পচূর্ণ করেছ, ধর্মরাজের কারাগারে বিপ্লব করেছ, যমরাজের নির্দয় তারল্য পান করেছ, বিধাতার সর্বকর্তৃত্বের অহংকার চূর্ণ করেছ। আজ আমাদের ভিতরে যে মোহ, সংস্কৃতি ও শিল্পের নামে যে আসক্তি, ধর্মাচার ও সত্যানিষ্ঠার নামে যে জড়তা, তার মধ্যে কতটা তোমার কুণ্ঠনৃত্যে ধ্বংস হয়ে যাবে, কে জানে। মানুষের জীবনপ্রবাহ তবুও নিজের মত্ত চালে এগিয়ে যাবে। আজ অশোকের পুষ্পস্তবক দেখে আমার মন উদাস হয়ে গেছে, জানি না কাল কোন জিনিস দেখে কোন সহৃদয়ের মন উদাস হয়ে উঠবে। যে কথাগুলো আমি মূল্যবান মনে করছি আর প্রচারের জন্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা শুকিয়ে ফেলছি, কে জানে তার মধ্যে কটা বেঁচে থাকবে আর কটা বয়ে যাবে। আমি কি শখ করে উদাস হয়েছি? মায়া কাটালেও কাটে না। সে যুগের শিল্পসাহিত্য মন চঞ্চল করে ফেলেছে, অশোকফুলই নয়, কিশলয়ও মনটাকে খোঁচাচ্ছে। কালিদাসের মতো কল্পকবি বলেছেন, অশোক ফুলই নয়, কিশলয়ও সদামত্ত করে তোলে, অবশ্য এর একটি শর্ত ছিল : সেটি দয়িতার কানে দুলতে থাকবে। 'কিশলয় প্রসব্যোপি বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতা শ্রবণার্পিতঃ! কিন্তু ডালে লম্বিত, বায়ুললিত কিশলয়েও মাদকতা আছে। আমার শিরায় শিরায় আজ অরুণ উল্লাসের ঝঞ্ঝা উঠছে। সত্যিই আমি উদাস।

আজ যাকে আমরা বহুমূল্য সংস্কৃতি মনে করছি, তা কি এরকমই থাকবে? সম্রাট সামন্তেরা যে আচার-নিষ্ঠাকে এত মাদক আর মোহকরূপ দিয়েছে, তা হারিয়ে গেছে। ধর্মাচার্যরা যে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে মহার্ঘ ভেবেছিলেন, তাও শেষ হয়ে গেছে; মধ্যযুগের মুসলমান অভিজাতদের অনুকরণে যে রসরাশি উপচে উঠেছিল, তা বাষ্পের মতো উবে গেল, তাহলে কি মধ্যযুগের কঙ্কালে লেখা ব্যবসায়িক যুগের কমল কি এ-রকমই থাকবে? মহাকালের প্রত্যেক পদাঘাতে ধরিত্রী বসে যাবে। তাঁর কুণ্ঠনৃত্যের প্রত্যেক পদক্ষেপ কিছু না কিছু জড়িয়ে নিয়ে যাবে। সব বদলাবে, সব বিকৃত হবে, সব নবীন হবে।

ভগবান বুদ্ধ মারবিজয়ের পর বৈরাগীদের পল্টন তৈরি করেছিলেন। মার আসলে মদনেরই নামান্তর। তিনি কি মধুর ও মোহক সাহিত্য দিয়েছেন। কিন্তু না জানি কবে যক্ষদের দেবতা বজ্রপাণি এই বৈরাগ্যপ্রবণ ধর্মে প্রবেশ করেন আর বোধিসত্ত্বদের শিরোমণি হয়ে যান। তারপর বজ্রযানের অপূর্ব ধর্মমার্গ প্রচলিত হয়। ত্রিরত্নে মদনদেবতা স্থান পায়। সে এক আজব ঝড়। তাতে বৌদ্ধ শৈব শাক্ত সব রয়ে গেল। সেই সময়ে 'শ্রী সুন্দরীসাধনতৎপরাণাং যোগশ্চ ভোগশ্চ করস্থ এব'-র মহিমা প্রতিষ্ঠিত হলো। কাব্য ও শিল্পের মোহক অশোক অভিচার এ সাহায্য করল। আমি আশ্চর্য হয়ে যোগ ও ভোগের

মিলনলীলা দেখছি। এটাও জীবনীশক্তির কি দুর্দম অভিযান। কত ধ্বংসের পর অপূর্ব এই ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছিল; কে জানাবে? অশোক স্তবকের প্রত্যেকটি ফুল তার প্রত্যেকটি দল, এই বিচিত্র পরিণতির ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে আসছে। কি রকম ঝাঁকড়া গুল্ম।

কিন্তু উদাস হওয়াই বেকার। আজও অশোক সেইরকম আনন্দে আছে, দু হাজার বছর আগে যেমন ছিল। কোথাও কিছুই নষ্ট হয়নি, কিছুই বদলায়নি। মানুষের মনোবৃত্তি বদলে গেছে, যদি না বদলে এগিয়ে যেত, তাহলে হয়তো তাও বদলাত না। আর যদি না বদলাত ও ব্যবসায়িক সংঘাত আরম্ভ হয়ে যেত, মেশিনের রথ ঘর্ঘর করে চলা শুরু করত, বিজ্ঞানের সবেগ দৌড় আরম্ভ হতো; তাহলে খুব খারাপ হতো। আমরা পিশে যেতাম। ভালই হয়েছে যে সে বদলে গেছে। পুরোপুরি কোথায় বদলেছে? কিন্তু বদলাচ্ছে তো অশোক ফুল সেই মত্ততায় হাসছে। পুরোনো মন নিয়ে এদের দেখার মানুষেরা উদাস। সে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। পাণ্ডিত্যও একটি বোঝা, যত ভারি হয় ততই তাড়াতাড়ি ভরাডুবি করে। জীবনের অঙ্গ হয়ে গেলে সহজ হয়ে ওঠে। তখন আর বোঝা থাকে না। সেই অবস্থায় উদাসও করে না। কোথায়! অশোকের কিছুই ক্ষতি হয়নি। কি মত্ততায় দুলছে। কালিদাস নিজের মতো করে রসাস্বাদন করতে পেরেছিলেন। আমিও পারি। উদাস হওয়া বেকার।

দুই

শিরীষ ফুল

যেখানে বসে লিখছি তার সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে অনেক শিরীষ গাছ আছে। জৈষ্ঠের গনগনে রোদ্রে পৃথিবী যখন নির্ধূম অগ্নিকুণ্ডে হয়ে গেছে শিরীষ আপাদমস্তক ফুলে ফুলে ভরে আছে। খুব কম ফুলই এমন গরমে ফোটার সাহস করে। কির্নিকার ও অমলতাসের কথা আমি ভুলে যাচ্ছি না। চারপাশে তাও অনেক আছে। কিন্তু, শিরীষের সঙ্গে অমলতাসের তুলনা করা যায় না। সে বসন্তকালে পলাশের মতো পনেরো-কুড়ি দিনের জন্য ফোটে; কবীরদাস এ-রকম দিন পনেরো জন্য ফুটে ওঠা পছন্দ করতেন না। এ আবার কি, দিন দশ ফুটে আবার খড়খড়ে কাঠ—'দিন দশ ফুটে খড়খড়ে হয়ে যায় পলাশ'। এ-রকম লাণ্ডুলীর চেয়ে তো ল্যাজছাড়াই ভাল। ফুল হলো শিরীষ'। বসন্ত আসতেই ফুটে ওঠে; আষাঢ় পর্যন্ত অবশ্যই মত্ত থাকে। মন মজে গেলে তো ভরা ভাদরেও নির্ঘাৎ ফুটতে থাকবে। গুমোটে যখন প্রাণ শুকিয়ে যায়, একমাত্র শিরীষ কালজয়ী অবধূতের মতো জীবনের অজেয়তার মন্ত্র প্রচার করতে থাকে। সবুজ ফলপাতা দেখে মুগ্ধ হওয়ার

মতো কবিহৃদয় যদিও বিধাতা আমাকে দেননি, কিন্তু নিতান্ত ঠুঁঠোও নই। শিরীষ ফুল আমার মনে অল্প হিল্লোল সৃষ্টি করে।

শিরীষ ছায়াতরুও বড় হয়। প্রাচীন ভারতে ধনীরা নিজের বাড়ির চারপাশে যে সব মঙ্গলজনক গাছ লাগাত, শিরীষ তাদের মধ্যে একটি (বৃহৎসংহিতা 5513)। অশোক অরিষ্ট পুন্নাগ ও শিরীষ ছায়াঘেরা ঘন মসৃণ শ্যামলিমায় ঢাকা বৃক্ষ-বাটিকা অবশ্যই সুন্দর লাগত। বাৎস্যায়ন 'কামসূত্রে' বলেছেন যে, বাড়ির সঘন ছায়াভরা বৃক্ষছায়াতেই দোলনা ঝোলানো উচিত। প্রাচীন কবিরা বকুল গাছে একরকম দোলনা লাগানোর পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু শিরীষ কি খারাপ? এর ডাল অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু দোল খাওয়া নারীদের ওজনও তো বেশি নয়। কবিদের এই তো দোষ, তারা ওজনের কথাই মনে রাখে না। আমি ভুঁড়িওয়ালা নরপতিদের কথা বলছি না, ইচ্ছে করলে তাঁরা লোহার গাছ তৈরি করে নিন।

সংস্কৃতসাহিত্যে শিরীষ ফুল অত্যন্ত কোমল মানা হয়েছে। আমার অনুমান কালিদাসই প্রথম এই কথা প্রচার করেছেন। এই ফুলের প্রতি তার কিছুটা পক্ষপাতিত্ব ছিল (আমারও আছে)। বলেছেন, শিরীষ ফুল কোনও ভ্রমরের পায়ের নরম চাপই সহ্য করতে পারে, পাখিদের পায়ের ভার কখনই নয় 'পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষ পুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণাম্।' আমি এত বড় কবির কথার প্রতিবাদ কি করে করি? শুধু প্রতিবাদ করার সাহস না হলেও কিছু খারাপ হতো না, ইচ্ছাও তো নেই। যাক আমি অন্য কথা বলছিলাম, শিরীষ ফুলের কোমলতা দেখে পরবর্তী কবিরা ভাবলেন, তার সবকিছুই কোমল, ভুল, এর ফল এত মজবুত যে নতুন ফুল আসার পরও জায়গা ছাড়ে না। যতক্ষণ নতুন ফুল পাতা মিলে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে না দেয় ততক্ষণ জমে থাকে। বসন্ত আসার সময় সমস্ত বনস্থলী যখন পুষ্প-পত্রে মর্মরিত হতে থাকে, শিরীষের ভীষণভাবে খড়খড় করতে থাকে। এদের দেখে আমার সেই নেতাদের কথা মনে পড়ে, যারা কোনওভাবেই সময়ের দিশা চিনতে পারে না আর, যতক্ষণ নতুন গাছ তাদের ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে না দেয় ততক্ষণ জমে থাকে।

ভাবি, সময় থাকতে পুরোনোদের এই অধিকারলিপ্সা কেন সাবধান হয়ে যায় না? জরা ও মৃত্যু দুইই জগতের অতিপরিচিত এবং অতিপ্রামাণিক সত্য। তুলসীদাস আফশোস করেই এর সত্যতার ওপর মোহর লাগিয়েছিলেন—'ধরার প্রমাণ এই তুলসী, যা ফলে তা ঝরে, যা জ্বলে তা নেভে।' আমি শিরীষ ফল দেখে বলি—ফলার পরেই কেন বোঝো না বাছা, যে ঝরে যেতেই হবে। কে শোনে? মহাকাল দেবতা সপাং-সপাং চাবুক চালাচ্ছেন; জীর্ণ-শীর্ণরা ঝরে যাচ্ছে; যাদের প্রানকণা একটু উর্ধ্বমুখী, তারা টিঁকে যাচ্ছে। দুরন্ত প্রাণধারা আর সর্বব্যাপী কালাগ্নির সংঘাত নিরন্তর চলছে। মূর্খ মনে করে, যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে অনেকদিন, সেখানে থাকলে কাল, দেবতার চোখে পড়বে না। তারা অবোধ। নড়া চড়া করো, জায়গা বদলাও, সামনের দিকে মুখ করে থাকলে চাবুক থেকে রেহাই পেতেও পার। জমলেই মারা পড়বে।

এক একবার মনে হয়, শিরীষ এক অদ্ভুত অবধূত। দুঃখ হোক বা সুখ, হার মানে না। কারও সাতেপাঁচে নেই। যখন পৃথিবী আর আকাশ পুড়তে থাকে, তখনও না জানি মহাশয় কোথা থেকে নিজের জন্যে রস শুষতে থাকে। অষ্টপ্রহর আনন্দে মত্ত থাকে।

একজন উদ্ভিদবিদ্ আমাকে বলেছেন, শিরীষ সেই শ্রেণীর গাছ যারা বায়ুমণ্ডল থেকে রস সংগ্রহ করে। অবশ্যই করে হয়তো। না হলে ভয়ঙ্কর লু চলার সময় এত কোমল তন্তুজাল ও এরকম সুকুমার কেশর জন্মায় কি করে? অবধূতদের মুখ থেকেই পৃথিবীর সবচেয়ে সরস লেখা সৃষ্টি হয়েছে। কবীর, অনেকটা শিরীষের মতোই ছিলেন, মত্ত আর বেপরোয়া অথচ সরস ও মাদক। কালিদাসও অবশ্যই অনাসক্ত যোগী ছিলেন। শিরীষফুল ফক্কুড়ে মত্ততায় ফুটতে পারে আর 'মেঘদূত' কাব্যও সেইরকম অনাসক্ত অনামিল উন্মুক্ত হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে। যে কবি অনাসক্ত হতে পারে না, ফক্কড় হতে পারে না, যে কৃতকর্মের হিসাবনিকাশেই জড়িয়ে থাকে, সে আবার কবি কিসের? কর্নাট রাজপ্রিয়া বিজ্জিকা দেবী গর্ব করে বলেছিলেন, প্রথম কবি ব্রহ্মা, দ্বিতীয় বাল্মিকী আর তৃতীয় ব্যাস। প্রথমজন বেদ, দ্বিতীয়জন রামায়ণ ও তৃতীয়জন মহাভারত দিয়েছেন। এছাড়া যদি কেউ কবি হওয়ার দাবি করেন, তাহলে আমি কর্নাট রাজের প্রিয় রানি তার মাথায় আমার বাঁ পা রাখি 'তেষাং মূর্ঘ্নি দদামি বামচরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া!' আমি জানি এই উপালম্ভে পৃথিবীর কোনও কবি হারেনি, তার মানে এই নয় যে কেউ লজ্জিত না হলে তাকে ধমকও দেওয়া যাবে না। আমি বলি, যদি কবি হতে হয়, তাহলে বন্ধু, ফক্কড় হও। শিরীষের মত্ততা দেখ। কিন্তু অভিজাতই আমাকে শিখিয়েছে যে কেউ কারও কথা শোনে না। মরুক গে।

কালিদাস ওজন ঠিক রাখতে পারতেন, কারণ তিনি অনাসক্ত যোগীর স্থির প্রজ্ঞতা আর বিদগ্ধ প্রেমীর হৃদয় পেয়েছিলেন। কবি হলে কি হয়? ছন্দ তৈরি করতে পারি, ছন্দ মেলাতে পারি—কালিদাসও পারতেন—এইজন্যে আমরা একই শ্রেণীভুক্ত হতে পারি না। এ-রকম প্রাচীন কোনও একজন সহৃদয় দাবিদার ধিক্কার করে বলেছিলেন—'বয়মপি কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়স্তে কালিদাসস্যা।' মুগ্ধ আর বিস্মিত হয়ে কালিদাসের এক একটি শ্লোক পড়ে আশ্চর্য হয়ে যাই। শিরীষ ফুলেরই উদাহরণ নেওয়া যাক। শকুন্তলা খুব সুন্দরী ছিলেন। সুন্দর হলেই কি হওয়া যায়? দেখা উচিত যে সেই সৌন্দর্য কত সুন্দর হৃদয় থেকে ডুব দিয়ে বেরিয়েছে। শকুন্তলা কালিদাসের হৃদয় থেকে বেরিয়েছিল। বিধাতারও কোনও কার্পণ্য ছিল না। কবিরও নয়। রাজা দুষ্মন্তও ভাল প্রেমিক ছিলেন। তিনি শকুন্তলার ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু থেকে-থেকেই তার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। উঁহু! কোথাও কিছু না কিছু বাকি রয়ে গেছে। অনেক দেরিতে তিনি বুঝতে পারলেন, কানে শিরীষ ফুল দিতে ভুলে গেছেন যার কেশর গাল পর্যন্ত ঝুলছিল, শরৎ চন্দ্রের কিরণের মতো কোমল ও শুভ্র মৃণালের হার রয়ে গেছে :

কৃতং ন কর্ণার্পিত বন্ধনং সখে
শিরীষ মদাগুবিলম্বি কেসরং।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচি কোমলং
মৃণলি সূত্রং রচিতং স্তনান্তরে।

এই শ্লোক না লিখলে মনে করতাম, কালিদাসের সঙ্গে অন্য কবিদের কোনও পার্থক্য নেই— সৌন্দর্যে মুগ্ধ, দুঃখে অভিভূত, সুখে গদগদ! কিন্তু কালিদাস সৌন্দর্যের

বাইরের আবরণ ভেদ করে তার ভেতরে পৌঁছে যেতে পারতেন, দুঃখ হোক বা সুখ, তিনি সেই অনাসক্ত কৃপীল যে নির্দলিত আখের থেকে রস টেনে নেয়, তার মতো নিজের ভাবরস টেনে নিতেন। কালিদাস মহান ছিলেন, কারণ তিনি অনাসক্ত থাকতে পেরেছিলেন। অনেকটা এই রকমের অনাসক্তি আধুনিক হিন্দি কবি সুমিত্রানন্দন পন্থের আছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথেরও এই অনাসক্তি ছিল। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'রাজোদ্যানের সিংহদ্বার যতই অভ্রভেদী হোক না কেন, তার শিল্পকর্ম যতই সুন্দর হোক না কেন, তা কখনই বলে না যে এখানেই সব পথের শেষ। আসল গন্তব্যস্থল তাকে অতিক্রম করার পরেই হয়, এটা জানানোই তার কর্তব্য।' ফুল হোক বা গাছ, তা নিজেই নিজের মধ্যে শেষ হয় না। অন্য কিছু দেখানোর জন্য একটি আঙুল। সেটি সংকেত।

শিরীষতরু সত্যিই সিদ্ধ অবধূতের মতোই আমার মনে এমন তরঙ্গের সৃষ্টি করে যা ওপরের দিকেই উঠতে থাকে। কষ্টদায়ক রৌদ্রে সে এত সরস কি করে থাকে? বাইরের পরিবর্তন, রৌদ্র বর্ষা ঝড় লু সত্য নয়? আমাদের দেশে এই মারপিট অগ্নিদাহ, লুটপাট, খুনখারাপির ঝড় বয়ে গেল, তার মধ্যেও কি স্থির থাকা যায়? শিরীষ পেরেছিল। আমার দেশের এক বৃদ্ধ পেরেছিল। আমার মন কেন প্রশ্ন করে যে, এমনটা কি করে সম্ভব হলো? কারণ শিরীষও অবধূত। শিরীষ বায়ুমণ্ডল থেকে রসসংগ্রহ করে এত কোমল আর এত কঠোর হয়েছে। গান্ধীও বায়ুমণ্ডল থেকে রস সংগ্রহ করে এত কোমল আর এত কঠোর হতে পারতেন। আমি যখন যখন শিরীষের দিকে দেখি তখন খুব কষ্ট হয়—হায়, সেই অবধূত আজ কোথায়!

তিন

কুটজ

বলা হয়, পর্বত শোভা নিকেতন। হিমালয় নিয়ে বলার কি আছে! পূর্ব আর অপার সমুদ্র মহোদধি আর রত্নাকর—দুটিকেই দুহাত দিয়ে পরিমাপ করা হিমালয়কে 'পৃথিবীর মানদণ্ড' বললে দোষের কি আছে? কালিদাস এরকমই বলেছিলেন। এর পাদদেশে সুদূর বিস্তৃত এই শৃঙ্খলা, লোকে 'শিবালিক শৃঙ্খলা' বলে। শিবালিকের মানে কি? শিবালিক, শিবের জটার নিম্নভাগ নয়তো? এই রকমই মনে হয়। শিবের লটপট জটাই এত শুকনো, নীরস ও কঠোর হতে পারে। যদিও অলকানন্দার স্রোত এখান থেকে অনেক দূরে, কিন্তু শিবের অলক তো দূর-দূর পর্যন্ত ছ্যাতরানোই থাকে হয়তো। সম্পূর্ণ হিমালয় দেখেই হয়তো কারও মনে সমাধিস্থ মহাদেবের মূর্তি স্পষ্ট হয়েছিল। হয়তো এই গিরিশ্রেণী সেই সমাধিস্থ

মহাদেবের অলকজালের নিচু অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে। কোথাও কোথাও অজ্ঞাত নাম গোত্রের ঝোপঝাড় আর নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছ দেখা যায়, কিন্তু আর কোনও সবুজ নেই। দুর্বা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। কালো কালো পাথর আর মাঝে মাঝে শুষ্কতার অস্থিত্ব প্রকট করা রক্তাভ বালির চড়া। রস কোথায়? এই যে বেঁটে অথচ বৈভবশালী গাছ গরমের ভয়ংকর মার খেয়ে আর খিদে তৃষ্ণার নিরন্তর চোট সহ্য করেও বেঁচে থাকছে, এদের কি বলা যায়? খালি বেঁচে থাকছে তাই নয়, হাসছেও। নির্লজ্জ নাকি? আপনভোলা নাকি? কখনও কখনও যাঁরা ওপরে নির্লজ্জ হন, তাঁদের শিকড় খুব গভীরে থাকে। এরাও পাষাণের বুক চিরে না জানি কোন অতল গহ্বর থেকে নিজের ভোগ্য টেনে আনে।

শিবালিকের শুকনো নীরস পাহাড়ে হাসতে থাকা এই গাছ দ্বন্দ্বাতীত, আপনভোলা। আমি কারও নাম জানি না, বংশ জানি না, শীল জানি না, কিন্তু মনে হয় এরা যেন অনাদি কাল থেকেই আমাকে চেনে। এদের মধ্যেই একটা ছোট্ট, খুবই বেঁটে গাছ আছে, পাতা খুব চওড়া আর বড়। ফুলে এমন ভরা, কি বলব। তাজ্জব হাবভাব, মনে হয় যেন হাসছে। যেন বলছে, কি তুমি আমায় চেন না? চিনি অবশ্যই চিনি। মনে হয় অনেকবার দেখেছি। চিনি, নির্মমতার সাথী, তোমায় ভালই চিনি। নাম ভুলে যাচ্ছি। প্রায় ভুলে যাই। চেহারা দেখে চিনে নিই, নাম মনে পড়ছে না। কিন্তু এমন নাম যে যতক্ষণ রূপের আগে না আসছে ততক্ষণ রূপের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। ভারতীয় পণ্ডিতদের হাজার বার নিংড়ানো প্রশ্ন সামনে এসে গেল--রূপ প্রজন না নাম? নাম বড় না রূপ? পদ আগে না পদার্থ? পদার্থ সামনে, পদ দেখা যাচ্ছে না। মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, স্মৃতির ডানা ছড়িয়ে সুদূর অতীতের কানের কাছে ঝুঁকলাম। ভাবি, এত ব্যাকুল হওয়ার কি আছে? নামে কি আসে যায়—হোয়াটস্ দেয়ার ইন এ নেম? যদি নামের প্রয়োজনই হয়, তাহলে হাজার নাম দেওয়া যায়, সুস্মিতা গিরিকান্তা বনপ্রভা শুভ্রকিরীটি, মদোদ্ধতা বিজিতাতপা, অলকাবিতংসা, অনেক নাম আছে অথবা পুরুষালি নামও দেওয়া যেতে পারে—অকুতোভয় গিরিগৌরব কূটোল্লাস অপরাজিত পাহাড়ফোড় পাতালভেদ! কিন্তু মন মানে না। নাম এজন্য বড় নয়, কারণ সেটা কেবল নাম। নাম বড় হয়, কারণ তাতে সামাজিক স্বীকৃতি থাকে। রূপ ব্যক্তিসত্য, নাম সমাজসত্য। নাম সেই পদকে বলা হয় যার ওপর সমাজের মোহর লাগানো থাকে। যাকে আধুনিক শিক্ষিত লোক 'সোশাল স্যাংশন' বলে থাকে। আমার মন নামের জন্য ব্যাকুল, সমাজস্বীকৃত ইতিহাস প্রমাণিত, সমষ্টি মানবের চিত্ত গঙ্গায় স্নাত।

এই গিরিকূটবিহারীর নাম কি? মন দূর-দূরান্তে উড়ছে, দেশে আর কালে-মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে। হঠাৎ মনে পড়ল, আরে এ তো কুটজ। সংস্কৃত সাহিত্যে খুবই পরিচিত, কিন্তু কবিদের কাছে অবমানিত, এই ছোট্ট বৈভবশালী গাছই কুটজ। 'কূটজ' বলা হলে হয়তো খুব ভাল হতো। কিন্তু তার নাম কুটজ হলেও গাছ তো নিঃসন্দেহে 'কূটজ' বলায় বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায়। যাইহোক এতো কূটজ-কুটজ মনোহর, কুসুম স্তবকে ঝাঁকড়ানো উল্লাস-লোল চারুস্মিত কুটজ। মন ঘুরে এল। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' কালিদাস যখন রামগিরির ওপর মেঘের অভ্যর্থনার জন্য যক্ষকে নিয়োজিত করেছিলেন, তখন ব্যাটাকে তাজা কুটজ ফুলের অঞ্জলি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল--চম্পক নয়,

বকুল নয়, নীলোৎপল নয়, মল্লিকা নয়, অরবিন্দ নয়—অর্থাৎ কুটজ ফুল। এ অন্য কথা যে আজ আষাঢ় নয়—জুলাই এর প্রথম দিন। কিন্তু কত ফারাক। বারবার মন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে যক্ষ তো আসলে বাহানা, কালিদাসই কখনও 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা' হয়ে রামগিরি গিয়েছিলেন, নিজের হাতে কুটজফুলের অর্ঘ দিয়ে মেঘের অভ্যর্থনা করেছিলেন। শিবালিকের কম উঁচু পর্বতশ্রেণীর মতোই রামগিরিতে হয়তো সেই সময় কোনও ফুল পাওয়া যায়নি। কুটজ তাঁর সন্তপ্ত মনকে আশ্রয় দিয়েছিল—ভাগ্যবান ফুল। ধন্য কুটজ, তুমিই বিপদের বন্ধু। মাথা তুলে উত্তরের দিকে তাকাই, দূর দূর পর্যন্ত উঁচু কালো পর্বতশ্রেণী ছড়ানো আর এক-আধ টুকরো শাদামেঘের শিশু তাকে জড়িয়ে খেলা করছে। আমি তাদের এই ফুল অর্ঘ দিই। কিন্তু কেন? খারাপই বা কি? এই সুন্দর কুটজ ফুল খুব খারাপ নয় তো। যে কালিদাসের কাজে এসেছে, তাকে বেশি সম্মান দেওয়া উচিত। কিন্তু সম্মান তো ভাগ্যের ব্যাপার। রহিমকে আমি সসম্মানে মনে করি। দরাজ মনের মানুষ ছিলেন, যা পেয়েছেন তাই লুটিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ায় মতলবই তো সব, রস শুষে নেয়, চোকলা আর আঁটি ফেলে দেয়। শুনেছি, রস শুষে নেওয়ার পর রহিমকেও ফেলে দেওয়া হয়েছিল। একজন বাদশাহ সাদরে ডেকেছিলেন, অন্যজন ফেলে দিয়েছেন। সবই হয়। তার জন্য রহিমের মূল্য কমে যায়নি। তাঁর মুক্ত মত্ততা শেষ হয়ে যায়নি। সম্মান দেওয়ার ভাল মানুষ ছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও বড় মানুষের ওপরে বিতৃষ্ণা চেপে বসলেই তারা ভুল করে বসেন। হয়তো মন খারাপ ছিল। হয়তো মানুষের কাছে পাওয়া রুক্ষতা আর অসম্মানে দুঃখ পেয়েছিলেন—মনের এরকম অবস্থায় বেচারা কুটজকেও এক চাঁটা লাগিয়েছেন, রেগেমেগে বলে ফেললেন :

> বে রহীম অব বিরছ কহঁ, জিনেকর ছাঁহ গঁভীর
> বাগন বিচ-বিচ দেখিয়ত, সেহুঁড় কুটজ কবীর
> (রহিম সে গাছ কোথায় এখন, ছায়া গহন যার
> বাগানের মাঝে মাঝে, সেহুঁড় কুটজ কাঁটার ঝাড়)

অর্থাৎ কুটজ বেঁটে খাটো গাছ, ছায়াই কি বড় কথা, ফুল কি কিছুই নয়? ছায়ার জন্যে না হোক ফুলের জন্যে তো কিছু সম্মান পাওয় উচিত। কিন্তু কখনও কখনও কবিদেরও 'মুড' খারাপ হয়ে যায়। তাঁরা প্রলাপের শিকার হয়ে যান। বাগানে গিরিকূট বিহারী কুটজের কি কথা?

কুটজ অর্থাৎ কুট থেকে যার জন্ম। 'কুট' ঘড়াকেও বলে, ঘরকেও বলা হয়। কুট অর্থাৎ 'ঘড়া' থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্যে প্রতাপশালী অগস্ত্য মুনিকেও কুটজ বলা হয়। ঘড়া থেকে কীভাবে উৎপন্ন হয়েছেন। অন্য কোনও ব্যাপার হবে। সংস্কৃতে দাসীকে 'কুটহারিকা' ও 'কুটকারিকা' বলা হয়। কেন? কুটির অথবা 'কুটিয়া' শব্দও কদাচিত এই শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই শব্দের মানে কি বাড়ি? বাড়িতে কাজকর্ম করা দাসীকে কুটকারিকা ও কুটহারিকা বলা যেতেই পারে। খারাপ ধরনের দাসীকে 'কুটনী'ও বলা যেতে পারে। সংস্কৃতে তার ভুলগুলো একটু বেশি মুখর করার জন্যে তাকে 'কুট্টনী'-ও বলা

হয়েছে। অগস্ত্যমুনিও নারদের মতো দাসীপুত্র ছিলেন? মুনি-কুটজ অথবা ফুল-কুটজের প্রসঙ্গে ঘড়ার মধ্যে জন্ম নেওয়ার তো কোনও মানেই হয় না। ফুল গামলায় অবশ্যই হয়, কিন্তু কুটজ তো জঙ্গলের পর্যটক। তার ঘড়া বা গামলার সঙ্গে কি সম্পর্ক? শব্দ অবশ্যই বিচারোত্তেজক। কোথা থেকে এলো? আমার সন্দেহ হয়, এ আর্যভাষার শব্দ, না কি নয়। একজন ভাষাবিজ্ঞানী কোনও সংস্কৃত শব্দের একাধিক প্রচলিত রূপ পেলেই তার কৌলিন্যে সন্দেহ করে বসতেন। সংস্কৃতে 'কুটজ' রূপ পাওয়া যায় আবার 'কুটচ'-ও পাওয়া যায়। 'কুটজ'ও পাওয়া যায়। তাহলে এ শব্দ কোন জাতির? আর্যদের বলে মনে হয় না। সিলভা লেবি বলেছেন, ফুল গাছ ও খেতখামারের অধিকাংশ শব্দই আগ্নেয়-ভাষা-পরিবার থেকে সংস্কৃতে এসেছে। এই শব্দটিও সেখান থেকে আসেনি তো? এক সময় যখন অস্ট্রেলিয়া আর এশিয়া মহাদ্বীপ একসঙ্গে ছিল, তারপর কোনও ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হলো আর এরা আলাদা হয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাবিদ পণ্ডিতরা অস্ট্রেলিয়ার সুদূর জঙ্গলে বসবাসকারী কিছু জাতির ভাষার সম্পর্ক দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। ভারতেও সাঁওতাল মুণ্ডা ইত্যাদি অনেক জাতির লোকেরা সেই ভাষা বলেন। প্রথমে এই ভাষাকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক নাম দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণপূর্ব বা অগ্নিকোণের ভাষা হওয়ার জন্যে একে আগ্নেও পরিবারও বলা হতে লাগল। এখন আমরা ভারতীয় জনতার শ্রেণীবিশেষকে মনে রেখে ও প্রাচীনসাহিত্য স্মরণ করে একে কোল পরিবারের ভাষা বলছি। পণ্ডিতরা বলেছেন, সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ যা এখন ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে, এই ভাষা পরিবার থেকেই এসেছে। কমল কুঙমল কম্বু কম্বল তাম্বুল ইত্যাদি এইরকম শব্দ। গাছপালা কৃষি-উপকরণ, ও যন্ত্রের নামও ঠিক এরকমই। 'কুটজ'ও যদি হয়, আশ্চর্যের কি? সংস্কৃত শব্দসংগ্রহে কখনও ছুৎমার্গ নেয়নি। না জানি কোন কোন বংশের কত শব্দ সংস্কৃতে এসে নিজের হয়ে গেছে। পণ্ডিতরা তার খোঁজ খবর করতে করতে হয়রান হয়ে গেছেন। সংস্কৃত সর্বগ্রাসী ভাষা।

দোল খাওয়া যে কুটজ গাছ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে নাম ও রূপে নিজের অপরাজেয় জীবনীশক্তির ঘোষণা করছে। সেজন্যে সে এত আকর্ষক। নাম নিয়েই হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে। কত নাম এলো, গেল। পৃথিবী তাদের ভুলে গেছে। তারাও পৃথিবীকে ভুলে গেছে। কিন্তু সংস্কৃতের নিরন্তর কেঁপে ওঠা শব্দরাশিতে কুটজ জাঁকিয়ে বসেছে তো বসেছেই। রূপের তো কথাই নেই। বলিহারি এই মাদক শোভার। ক্রুদ্ধ যমরাজের দারুণ নিঃশ্বাসের মতো চারিদিকে ধূ ধূ লু-তেও সবুজ হয়ে ভরে আছে, দুর্জনের মনের চেয়ে বেশি কঠোর পাথরের কারাগারে রুদ্ধ অজানা জলস্রোতে থেকে জোর করে রস টেনে সরস হয়ে আছে। আর মূর্খের মস্তিষ্কের থেকেও বেশি নির্জন গিরি কান্তারেও এমন মত্ত হয়ে আছে যে হিংসা হয়। কত কঠিন জীবনীশক্তি। প্রাণই প্রাণকে পুলকিত করে, জীবনীশক্তিই জীবনীশক্তিকে প্রেরণা দেয়। পর্বতরাজ হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দূরে, হয়তো সেখানেই কোথাও ভগবান মহাদেব সমাধিতে বসেছেন, নিচে সপাট পাথুরে জমির সমতল, কোথাও কোথাও পর্বতনন্দিনী সরিতারা হয়তো এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছে, মাঝে চট্টানের এবড়ো—খেবড়ো জটাভূমি, শুকনো নীরস কঠোর। এখানেই চিরপরিচিত বন্ধু কুটজ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে। একবার নিজের ঝাঁকড়া মাথা নাড়িয়ে সমাধিনিষ্ট

মহাদেবকে ফুলের তোড়া উপহার দেয় আর একবার নিচের দিকে পাতালভেদী শিকড় টিপে গিরিনন্দিনী সরিতাদের রস-সূত্র কোথায় আছে তার সংকেত দেয়। বাঁচতে চাও? কঠোর পাথর ভেদ করে, পাতালের বুক চিরে নিজের ভোগ্য সংগ্রহ কর, বায়ুমণ্ডল শুষে, ঝড় ঝাপটা রগড়ে, নিজের প্রাপ্য উসুল কর। আকাশকে চুমু খেয়ে সুযোগের তরঙ্গে দুলতে দুলতে উল্লাস টেনে নাও। এই হলো কুটজের উপদেশ :

ভিত্ত্বা পাষাণপিঠরং ছিত্ত্বা প্রভঞ্জলী ব্যথাং
পীত্ত্বা পাতালপানীয়ং কুটজশ্চতম্বতে নভঃ!

দুরন্ত জীবনীশক্তি আছে। কঠিন উপদেশ। বাঁচা-ও একটি শিল্প। কিন্তু শিল্পই নয়, তপস্যা। বাঁচতে হলে জীবনে প্রাণ ঢেলে দাও, জীবনরসের উপকরণে মন ঢেলে দাও। ঠিক আছে। কিন্তু কেন? বাঁচার জন্য বেঁচে থাকাই কি বড় কথা? সমস্ত সংসার আপন মতলবের জন্যেই তো বেঁচে আছে। যাজ্ঞবল্ক্য অনেক বড় ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। তিনি নিজের পত্নীকে বিচিত্রভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, সব কিছুই স্বার্থের জন্যে। পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় হয় না, পত্নীর জন্যে পত্নী প্রিয় হয় না, সবাই নিজের মতলবের জন্যে প্রিয় হয়, 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব প্রিয়ং ভবতি।' এই যুক্তি বিচিত্র নয়? সংসারে যেখানেই প্রেম, সবই স্বার্থের জন্য। শুনেছি, পশ্চিমে হল্‌স ও হেলওয়েশিয়সের মতো ব্যক্তিরাও এরকম কথা বলেছেন। শুনেও হয়রানি হয়। পৃথিবীতে ত্যাগ নেই, প্রেম নেই, পরার্থ নেই, পরমার্থ নেই—আছে কেবল প্রচণ্ড স্বার্থ। ভেতরের জিজিবীষা—বেঁচে থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছাই যদি বড় কথা হয়, তাহলে এ সবই হলো বড় বড় বুলি। যে শক্তির উপর দল তৈরি হয়, শত্রুমর্দনের অভিনয় করা হয়, দেশোদ্ধারের শ্লোগান দেওয়া হয়, সাহিত্য ও শিল্পের মহিমা গাওয়া হয়—সব মিথ্যা। এ দিয়ে কেউ না কেউ নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করে। কিন্তু অন্তর থেকে কেউ বলছে, এ ভাবনা ভুল। স্বার্থের থেকেও বড় কিছু না কিছু অবশ্যই আছে, জিজিবীষার থেকেও কোনও না কোনও প্রচণ্ড শক্তি অবশ্যই আছে। কি আছে?

হোঁচট খাওয়ানো ঢঙে যাজ্ঞবল্ক্য যে কথা বলেছেন সেটাই শেষ নয়। তিনি 'আত্মনঃ' এ-র মানে আরও বড় কিছু করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তির 'আত্মা' ব্যক্তি পর্যন্তই সীমিত নয়, আরও ব্যাপক। নিজেতে সব আর সবার মাঝে নিজে এরকম সমষ্টিবুদ্ধি যতক্ষণ না আসবে, ততক্ষণ পূর্ণ সুখের আনন্দই পাওয়া যায় না। যতক্ষণ নিজেকে সমর্পিত না করে দেওয়া যায়, ততক্ষণ 'স্বার্থ' খণ্ড-সত্য হয়, মোহকে উৎসাহ দেয়, তৃষ্ণা সৃষ্টি করে, আর মানুষকে দয়নীয় কৃপণ তৈরি করে। কাপর্ণ্যদোষে যার স্বভাব আক্রান্ত হয়েছে তার দৃষ্টি ম্লান হয়ে যায়। সে স্পষ্ট দেখতে পায় না। সে স্বার্থই বুঝতে পারে না, পরমার্থতো দূরের কথা। কুটজ কি কেবল বেঁচে থাকছে? সে অন্যের দরজায় ভিক্ষা চাইতে যায় না, কেউ কাছে এলে ভয়ে আধমরা হয়ে যায় না, নীতি ও ধর্মের উপদেশ দিয়ে বেড়ায় না, নিজের উন্নতির জন্য আমলাদের জুতো চেটে বেড়ায় না, অন্যকে অবমানিত করার জন্যে গ্রহের খোশামোদ করে না। আত্মোন্নতির জন্য নীলা ধারণ করে না, আঙুল ভরে আংটির মালা পরে না, মুখ ভেংচায় না, আশে পাশে ট্যারা তাকায় না। বেঁচে থাকে, গভীরে বেঁচে থাকে

—কি জন্যে, কি উদ্দেশ্যে? কেউ জানে না। কিন্তু কিছু বড় কথা আছে। স্বার্থ সীমানার বাইরের কথা। পিতামহ ভীষ্মের মতো অবধূতের ভাষায় বলছে, 'সুখ বা দুঃখ যাই হোক প্রিয় বা অপ্রিয়, যা পাওয়া যায়, মনের দিকে সম্পূর্ণ অপরাজিত থেকে গৌরবের সঙ্গে মহানন্দে গ্রহণ কর। হার মেনো না!'

সুখং বা যদি বা দুখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীতং হৃদয়েনপরাজিতঃঙ্গ
শান্তিপর্ব 25/ 26

হৃদয়েণাপরাজিতঃ! কত বড় সেই হৃদয় যা সুখে দুঃখে প্রিয় অপ্রিয়তে বিচলিত হয় না। কুটজকে দেখে শিহরণ জাগে। এই অকুতোভয় বৃত্তি, অপরাজিত স্বভাব, অবিরল জীবন-দৃষ্টি কোথায় পেল!

যে মনে করে সে অন্যের উপকার করছে, সে অবোধ, যে মনে করে, অন্যরাও তার উপকার করছে, সেও নির্বোধ। কে কার উপকার করে, কে কার অপকার করে? মানুষ বেঁচে থাকছে, নিজের ইচ্ছায় নয়, ইতিহাস বিধাতার পরিকল্পনা অনুসারে কেবল বেঁচে থাকছে। কেউ যতি তাতে সুখ পায়, খুব ভাল কথা, না পেলে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাতে অহংকার হওয়া উচিত নয়। সুখ দেওয়ার গুমোর যদি ভুল হয়, তবে দুঃখ দেওয়ার গুমোরও নিতান্ত ভুল।

সুখ দুঃখ তো মনের বিকল্প। যার মন বশে থাকে সে সুখি, যার মন পরবশে থাকে সে দুঃখী, পরবশে অর্থাৎ খোশামোদ করা, দাঁত দেখানো, চাটুকারিতা, জী হুঁজরি করা। যার মন নিজের বশে নেই সেই অন্যের মনের ছন্দাবর্তন করে, নিজেকে লুকোবার জন্যে মিথ্যা আড়ম্বর করে, অন্যকে ফাঁদে ফেলার জন্য জাল বিছয়। কুটজ এ সমস্ত মিথ্যাচার থেকে মুক্ত, সে বশী। সে বৈরাগী। রাজা জনকের মত সংসার থেকেও সম্পূর্ণ ভোগমুক্ত। জনকের মতই সে ঘোষণা করে: 'আমি স্বার্থের জন্যে নিজের মনকে সব সময় অন্যের মনে ঢুকিয়ে বেড়াই না, এজন্যে আমি মন জিততে পেরেছি, তাকে বশ করতে পেরেছি:

নাহমাত্মযিমচ্ছামি মনোনিত্যং মনোন্তরে।
মনো সে নির্জিতং তস্মাৎ বশে তিষ্ঠতি সর্বদা।

কুটজ নিজের মনের ওপর কর্তৃত্ব করে, মনকে নিজের ওপর কর্তৃত্ব করতে দেয় না। মনস্বী বন্ধু, তুমি ধন্য।

চার

দেবদারু

জানি না কে এই গাছের নাম দেবদারু রেখেছিল। নাম অবশ্যই পুরোনো, কালিদাসের থেকেও পুরোনো, মহাভারতের থেকেও পুরোনো। সোজা ওপরের দিকে বেড়ে চলে, দ্যুলোক ভেদ করার লালসায় কাছের শৃঙ্গের চেয়েও ওপরে উঠে যায়। মর্ত্যালোককে অভয়দানের ভঙ্গিতে ডাল নিচে ছড়িয়ে যেতে থাকে, যেন বলছে 'ভয় নেই আমি তো আছি।' প্রত্যেক শাখার ঝাঁকড়া ডালপালার কাঁটা কাঁটা পাতার এমন ঢেউদার চাঁদোয়া টাঙায় যে ছায়া দাসীর মত অনুগমন করে। যে আচার্য পরিপাটি করা ভদ্রজন অনুমোদিত 'সজ্জা'কে 'ছায়া'র নাম দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় এই গাছের শোভায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। গাছ কি, কোনও সিদ্ধকবির হৃদয়ের মূর্তিমান ছন্দ ধরার আকর্ষণকে অভিভূত করে ঢেউ খেলানো সারি সারি বিতানকে বেশ সাবধানে সামলাতে থাকা, বিপুল আকাশের দিকে একাগ্রীভূত মনোহর ছন্দ। কি জমক, মাধ্যাকর্ষণের জড়বেগকে অভিভূত করার কি রকম স্পর্ধা প্রাণের আবেগের কি রকম উল্লসিত অভিব্যক্তি। দেবতাদের আদরের গাছ নয় তো কি? এমনি এমনিই কী মহাদেব ধ্যান করার জন্যে 'দেবদারু দ্রুমবোধিকা' পছন্দ করেছিলেন? কিছু অবশ্যই আছে। কেউ বলতে পারে না যে মহাদেব সমাধি দিয়ে কি পেতে চেয়েছিলেন। তার কীসের অভাব ছিল? কালিদাস বলেছেন, উনি প্রয়োজনাতীত (নিষ্প্রয়োজন কি করে বলি) সমাধির জন্যে দেবদারু দ্রুমের নিচে বেদি তৈরি করেছিলেন। সম্ভবতঃ দেবদারুও অর্থাতীত ছন্দ, সেইজন্যেই-প্রাণের উল্লাসনৃত্য, জড়শক্তির দুর্বার আকর্ষণকে পরাভূত করে বিপুল ব্যোমমণ্ডলে বিহার করার অর্থাতীত আনন্দ।

বলা হয় অতিরিক্ত আনন্দে শিব যখন উদ্দাম নৃত্য করেছিলেন তখন তার শিষ্য তণ্ডুমুনি তা মনে রেখেছিলেন। তিনি যে নাচের প্রবর্তন করেন তাকে 'তাণ্ডব' বলা হয়। 'তাণ্ডব' অর্থাৎ তণ্ডুমুনি দ্বারা প্রবর্তিত 'রসভাববিবর্জিত নৃত্য'। রসও অর্থ, ভাবও অর্থ, কিন্তু তাণ্ডব এমন নাচ যাতে রসও নেই, ভাবও নেই। যে নাচে, তার কোনও উদ্দেশ্য নেই, মতলব নেই, অর্থ নেই। কেবল জড়তার দুর্বার আকর্ষণ ছিন্ন করে একমাত্র চৈতন্যের অনুভূতির উল্লাস। এই 'একমাত্র' উদ্দেশ্যই তাতে ছন্দ আনে, এতেই তার তালের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। একাগ্রীভাব, ছন্দের আত্মা। যদি তা না হতো, তাহলে শিবের তাণ্ডব নৃত্য বেমিল দাপাদাপি, লাফালাফি ছাড়া আর কিছুই হতো না। তাণ্ডবের মহিমা আনন্দমুখী একাগ্রতায় আছে। সমাধিও একাগ্রতা চায়। ধ্যান, ধারণা ও সমাধির একাগ্রতাতেই যোগ সিদ্ধ হয়। বাইরের প্রকৃতির দুর্বার ছিন্ন করার উল্লাস হলো তাণ্ডব। অন্তঃপ্রকৃতির অসংযত নিক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করা উল্লাসের নাম সমাধি। দেবদারু প্রথম রকমের উল্লাস সূচিত করে, দ্বিতীয় প্রকার হলো শিবের নিবাতনিষ্কম্প-ইব-প্রদীপ। ভেবেচিন্তেই শিব দেবদারু গাছের বেদি পছন্দ করেছিলেন। তুক্কামিলে যাচ্ছে, বৈভবশালী তুক্কা। কে বলে কালিদাস তুক্কা

মেলাবার পরোয়া করেননি? আমার মন বলছে, কালিদাসও তুকারাম ছিলেন। তুক্কা মেলানোর মৌজি বাক্‌বিলাসী। কিন্তু এও নিশ্চিত যে এই তুক্কাগুলো ভাঁড়ামি ছিল না। 'ঝগড়ে রগড়ে বগড়ে ডগরে' এও কি কোনও তুক্কা! কিন্তু সমস্ত পৃথিবী একেই তুক্কা বলে আসছে। কিছু না কিছু তো হবেই, সমস্ত জগৎ এমনিই পাগল হতে পারে না। কিন্তু এও তো সত্যি যে 'কথায় কথায়' তুক্কা মিলে যায়। যদি এমন না হতো তাহলে ঢঙছাড়া বলা লোককে খারাপ মনে করা হতো না। যারা 'তুক্কার কথা বলে' তারা শব্দের ধ্বনির তুক্কা তো মেলায় না। তাহলে তুক্কা কী?

দেবদারুর আকাশছোঁয়া শিখাও সমাধিস্থ মহাদেবের নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের ঊর্ধ্বগামী জ্যোতি হলো তুক্কা। অর্থাৎ তুক্কা অর্থে থাকে। ধ্বনিসাম্যের তুক্কায় কিছু না কিছু অর্থচারিতা হওয়া উচিত। ধ্বনিসাম্য সাধন, তুক্কা অর্থের ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু এমন বলার বিপদও আছে। কোনও নতুন সমালোচক অর্থের লয়ের ওকালতি করেছেন। আমি ভালভাবেই জানি যে পুরো পণ্ডিতসমাজ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যদি তুক্কা অর্থে পাওয়া যায় তাহলে লয়ে কেন পাওয়া যেতে পারে না? আমার অন্তর্যামী বলেন, তুক্কা অর্থে থাকে, লয়ে থাকে না। অনেকে চোখ খোলার পরেও যদি অন্তরের ডাক ঠিক মনে হয় তো মেনে নেওয়া উচিত; কারণ সেই অবস্থায় ভিতর ও বাইরের তুক্কা মিলে যায়। শিবও অন্তর ও বাইরের তুক্কা মেলানর জন্যেই তো দেবদারু বেছে নিয়েছিলেন। অন্তর্যামীও বহির্যামীর সঙ্গে তাল মেলাতে থাকুক, এটাই উচিত। মহাদেব চোখ বুজে ফেলেছিলেন, দেবদারু চোখ খোলা রেখেছিল। মহাদেবও যখন চোখ খুলে দিলেন তো তুক্কা নষ্ট হয়ে গেল, ছন্দপতন হলো; ত্রিলোককে মদবিহ্বল করা দেবতা ভস্ম হয়ে গেল। তার ফলের তূণীর পুড়ে গেল; রত্নজটিত ধনুক ভেঙে গেল। সব গোলমাল হয়ে গেল। ভাবছি—সেই সময় দেবদারুর কি হাল হয়েছিল! ফকিরী মত্ততায় এরকমই দুলছিল? একভাবে দাঁড়িয়ে আছে কি হয়তো ছিল; কারণ শিবের সমাধি ভেঙেছিল, দেবদারুর তাণ্ডব রসভাব বিবর্জিত মহানৃত্য ভাঙেনি। দেবতার তুলনায় কাঠের মতো সে নির্বিকার ছিল। কে জানে হয়তো এই গল্প শুনে কেউ এর নাম 'দেবতার কাঠ' (দেব-দারু) রেখেছিল। ফক্কড় তো নিজের জন্য বাছা, মানুষের জন্য তো খালি কাঠ, দয়া মায়া মোহ আসক্তি কিছুই নেই, শুধু কাঠ! এর থেকে তো ভগবান ভাল। তাঁর কাছে হৃদয় তো আছে। কিন্তু তাই বা কি করে বলা যায়। দেবতার হৃদয় থাকলে তো লাজলজ্জা থাকত, লাজলজ্জা থাকলে চোখের পাতাও থাকত। কিন্তু দেবতা যখন তাকিয়ে থাকে, চোখের পাতা পড়ে না। এক পলকের জন্য চোখ বুজলেই অনর্থ হয়ে যাবে। 'খুব সাবধান, জাগ্রত', হ্যাঁ, মহাদেব এদের থেকে আলাদা ছিলেন। যেখানে চোখ নামানোর দরকার, সেখানে তাঁর চোখ নামত, যেখানে নির্ণিমেষ দেখার দরকার, দেখতেন। পার্বতী ফুলের গয়নায় সেজে যখন সঞ্চারিণী পল্লবিণী লতার মতো তাঁর সামনে এসেছিলেন, তখন তার (পার্বতীর) বিম্বফলের মতো ঠোঁটযুক্ত মোহক মুখ দেখে পলক ফেলতে পারেননি। তারপর চোখ নামিয়েছিলেন। মানুষের মতোই তিনি বিকারগ্রস্ত হয়েছিলেন। দেবতাদের মধ্যে তিনি মানুষ ছিলেন—মহাদেব! সেই দিন দেবদারু হেরে গিয়েছিল। সে সব দেখেছিল। এতবড় অনর্থ হয়ে গেল আর সে অবধূত স্বভাব ছাড়তে পারল না। সে মহাবৃক্ষ হতে পারল না; দেবদারু হয়ে গেল। চোখ খুলে রাখাও

কোনও ভাল কথা নয়! বনস্পতি মহাবৃক্ষ হয়, যার মধ্যে ভাবুকতা নয় সার্থকতা থাকে, যে ফুল দেয় না কিন্তু ফল দেয়—'অপুষ্প ফলবন্তোয়ে।' দেবদারু হেরে গেল। বনস্পতির মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলো।

তাতে কি হলো? এ সবই মানুষের আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টির ফল। এতে দেবদারুর কি আসে যায়। সে তো যেমন আছে তেমনই রয়ে গেল। তুমি তাকে বনস্পতি বলো বা দেবতার কাঠ বলো। তোমার ভাল লাগে তাই ভাল নাম দাও, খারাপ লাগলে খারাপ নাম দাও। নামে কি আসে যায়? এর পুরোনো নাম দেবতরু হওয়াও সম্ভব। দেবতার তরু নয়, দেবতাও আবার তরুও। দেবতা হয়ে সেই ছন্দ আছে, তরু হয়ে অর্থ। সমষ্টিব্যাপী জীবনগতির সমান্তরালভাবে চলা ব্যক্তিগত প্রাণাবেগের নাম হলো ছন্দ; সমাজ-স্বীকৃতি পাওয়া সংকেত হলো অর্থ।

যেখানে বসে লিখছি, সেখান থেকে ওপরে—নিচে পর্বতপৃষ্ঠে দেবদারু থাক-থাক সিঁড়ির মতো লাগছে। কী মোহক শোভা। আরও গাছ আছে, লোকে অনেক অনেক নামও দিয়েছে, কিন্তু সব আড়ালে চলে গিয়েছে। গগনচুম্বী দেবদারুই দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওপরের দেবদারুর মগডাল থেকে আমাকে গড়িয়ে দিলে পরপর মগডালের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে অনায়াসেই হাজার হাজার ফুট নিচে চলে যেতে পারি। কিন্তু এরকম মনেই হয়। ভগবান না করুক আমায় যেন কেউ গড়িয়ে দেয়। হাড়পাঁজরা ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে। অনেক কথাই মনে হয় ভুল। এই জন্যে বলি, মনে হওয়ার অর্থ হয় না, অনেক পর অর্থ হয়। অর্থ হলো বাস্তবিকতা, বাস্তবিক জগতের সভ্যতা, মনে হওয়াটা মনের বিকল্প, অন্তর্জগতের স্পৃহামাত্র, ছন্দ। দুটোর মধ্যে যখন তাল মিলে যায় তখন কাজের কথা হয়। না মিললে দুঃখ হয়। তাল মিলে যাওয়া অর্থ, না মিললে অনর্থ হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কিছু না কিছু হয়। মজার কথা হলো ব্যক্তির মনে হওয়াটা পৃথক (অলগ) হয়। 'অ-লগ' অর্থাৎ যা মনে হয় না। মনে হয় অথচ মনে হয় না, এটা কি কোনও ঠিক কথা হল? ঠিক তখনই হয় যখন মনে হওয়া পৃথক (অলগ) লাগে না। এই জন্যে বলছি তুক্কা অর্থে হয়। যে এই গাছের নাম দেবদারু দিয়েছে তার কি মনে হয়েছিল, বলতে পারব না। অন্যদেরও কমবেশি মনে হয়েচিল, তাই সবাই মেনে নিয়েছে। যা সবার মনে হয় তাই অর্থ, একজনের মনে হলো বাকিদের হলো না, সেটাই অনর্থ। বিচ্ছিন্নতাকেই প্রাচীন আচার্যরা পৃথকতত্ত্ব বুদ্ধি বলেছেন। আরও বুঝিয়ে বলেছেন যে, বিচ্ছিন্নতা হলো 'আমিসর্বস্ব' অহংকার। কবিদের সবসময় কিছু দেখে কিছু না কিছু মনে হয়। খোলাখুলি বলেন আমার এ-রকম মনে হচ্ছে। আমার এ-রকম মনে হচ্ছে বলার কি দরকার বাবা? দুনিয়াকে দেখ। সে তোমায় পাগল বলবে। পাগলেরও তো কিছু না কিছু মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীকে দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাই। কবির কিছু মনে হওয়াকে বাহবা দিয়ে মাথায় তুলে নাচি। কিছুই বুঝি না—'বিরহবশে আমিই পাগল, পুরো গাঁ কেন পাগল।'

বিহারী খুব ভাল কবি। তাঁর কথাই মনে পড়ে গেল। খুবই সামান্য কথা যে বিরহিণী কোনও স্ত্রী বলছে, আমি পাগল হয়ে গেছি না পুরো গ্রামই পাগল হয়ে গেছে? কি মনে করে এরা চাঁদকে ঠাণ্ডা কিরণওয়ালা বলে—কেন জানি বলে এরা 'সীতকর' চাঁদের নাম। বিরহবিদগ্ধা মহিলার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সবার কাছে যে বস্তু ঠাণ্ডা লাগছে তাকেই

সে দাহক মনে করছে। পাগলামিই তো। কিন্তু বিহারী যখন তাকে দোহা ছন্দে বাঁধলেন তখন কথাই বদলে গেল। হায় হায়, কেমন বিরহবেদনা যে চাঁদও সুকুমার বালিকার কাছে গরম লাগছে। হৃদয়ের ভিতর জ্বলন্ত বিরহের আগুন তাকে কোন কাছের যোগ্য রাখেনি। হে ভগবান, এমন কিছু কি করতে পারো না যাতে পুরো গ্রামের মতোই অন্যের কাছে চাঁদ যেমন শীতল লাগে, এই বালিকারও তেমন লাগে? অর্থাৎ বিরহিণীর দারুণ ব্যথা এখন সবার মনের সামান্য অনুভূতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগল। পাগলের 'লাগা' একার হয়, কবির লাগা সবার লাগে। উল্টো করে বললে এইরকম হবে— যার লাগা সবার জন্যে, সে কবি; যার লাগা কেবল তার নিজস্ব, অন্যের নয়, সে পাগল। লাগারও পার্থক্য আছে। যা সবার লাগে তা হল অর্থ, একজনের লাগলে তা অনর্থ। অর্থ সামাজিক হয়।

কিন্তু দেবদারু নাম কেবল নামই নয়। আমার গ্রামে আমি এক ভূত-ভগবান ওঝাকে দেবদারুর কাঠ দিয়ে ভূত তাড়াতে দেখেছি। আজকাল শিক্ষিত লোকেরা ভূতে বিশ্বাস করেন না। তারা ভূতকে মনের ভুল বলেন। কিন্তু গ্রামে ভূত লাগতে আমি দেখেছি। ভূত ভাগাতেও দেখেছি। ভূতও 'লাগে'। হয়তো সব লাগালাগির ভ্রমও হয়। চোখেরও। বিহারী জানতেন, বলেছেন : 'লাগালাগি লোচন করে নাহক মন পড়ে বাস।' নাহক অর্থাৎ বেমতলব, নিরর্থক।

আমাদের গ্রামে এক পণ্ডিত ছিলেন। নিজেকে মহাবিদ্বান ভাবতেন, তার মুখ থেকে বিদ্যা ঝরত। শাস্ত্রার্থে বড় বড় দিগ্‌গজকেও হারিয়ে দিতেন। বিদ্যার জোরে নয় ফটাফটের আঘাতে। বিপক্ষ মুখ মুছতে মুছতে পালাত। কোনও কেদ্দানি হলে দৈহিক শক্তি দিয়ে জয়-পরাজয় ঠিক হতো। আমার সামনেই একবার গুঁতোগুঁতি হয়ে গেল। পণ্ডিতমশায়ের বিদ্যের ওপর গাঁ-গঞ্জের লোকেদের ভরসা ছিল না। কিন্তু তার ফটাফট বাণী আর ভীমকায়ার ওপর বিশ্বাস অবশ্য ছিল। শাস্ত্রার্থে পণ্ডিতমশাই কখনও হারেননি। কম লোকই জানে, শাস্ত্রার্থে কেউ হারে না, হারানো হয়। পণ্ডিতজির যজমানেরা লাঠি নিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ত, তার জয় সুনিশ্চিত হতো। বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতদেরই নয়, আশপাশের ভূতদের পরাজিত করা পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে কিছুই ছিল না। গায়ত্রীমন্ত্র (তার মুখ থেকে তরজার মতো লাগত) আর দেবদারুর কাঠ ছিল তার অস্ত্র। একবার বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ঘোর অন্ধকার, ভয়ংকর নির্জন। হঠাৎ দেখলেন ধপাধপ ঢিল পড়ছে। পণ্ডিতজীর অভিজ্ঞমন ঝট করে বুঝে ফেলল—নিশ্চয় কোনও গোলমাল আছে। মানুষ এত জোরে ঢিল ফেলতে পারে না। পণ্ডিতমশাইও ভয় পাওয়ার লোক নন। পিছন ঘুরে হাঁক দিলেন, 'কোনডারে?' 'কোনডা' মানে কে। পেছনে কবন্ধ ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছিল; খটাখট, খটাখট। (এখানে পাঠকদের জানিয়ে দিই, একবার আমার গ্রামে আমি নিজে ভূত-জাতিভেদের খোঁজখবর নিয়েছিলাম। মোট তেইশ রকমের ভূত আছে। কবন্ধও এক প্রকার ভূত। মুণ্ডু নেই। বুকে মশালের মতো দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে। ঘোড়ায় চড়ে যায়) তো, মুণ্ডুকাটা পণ্ডিতজির সঙ্গে ভিড়বার সাহস করল; ভয় পাওয়ার লোক অন্য, পণ্ডিতজীও জুতো খুলে ফেললেন, না হলে গায়ত্রীমন্ত্র পড়া যাবে না। ফটাফট গায়ত্রী পড়তে লাগলেন। দেবদারুর কাঠ মুঠোয় ধরা ছিল। রদ্দার পর রদ্দা পড়ল। বেচারা মুণ্ডুকাটা ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল—'এবারে ছেড়ে দাও পণ্ডিতমশায়, চিনতে পারিনি। আর

ভুল হবে না। এখন থেকে আমি তোমার গোলাম!' পণ্ডিতমশায়ের ব্রাহ্মণ মনে গলে গেল। না হলে তো গাঁ-গঞ্জের কাঁটা শেষ হয়ে যেত। পণ্ডিতমশায়ের নিজের মুখ থেকে এই গল্প শুনেছি। অবিশ্বাস করার কোনও উপায় নেই—ফার্স্টহ্যাণ্ড ইনফর্মেশন। সেদিন থেকে, আমার বালকমনে দেবদারুর প্রভাব পড়েছিল। এখনও কী দূর হয়েছে !

আজ দেবদারুর জঙ্গলে বসে আছি। লাখো লাখো মুণ্ডুকাটাকে গোলাম করতে পারি। ভূতের মধ্যে যেমন মুণ্ডুকাটা হয়, মানুষের মধ্যেও কিছু কিছু হয়। মাথা নামক জিনিসটি তাদের কাছে হয়ই না। মস্তকই নেই তো মস্তিষ্ক কোথায়, লতা কেটে গেলে ফুলের সম্ভাবনা কি করে থাকবে—লতায়াং পূর্বলূণায়াং প্রসূনোস্যোদ্ভবঃ কুহঃ! এই মুণ্ডুকাটাদের দেবদারু কাঠ দিয়ে কি পরাভূত করা যেতে পারে? করার চেষ্টাই তো করছি। কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের কাছে তো ফটাফট গায়ত্রীমন্ত্র ছিল, তা কোথায় পার?

আমার মনের সমস্ত ভ্রান্তি দূর করা দেবদারু, তোমায় দেখে মন শ্রদ্ধায় ভরে যায়, অকারণ নিশ্চয় নয়। তুমি ভূত ভাগাও, ভ্রান্তি সেটাও, ভ্রম নাশ কর। তোমাকে বহুদিন ধরে জানি, কিন্তু চিনতাম না। এখন চিনতে পারছি। তুমি দেবতার আদরের মহাদেবের প্রিয়, তুমি ধন্য।

জানি বুদ্ধিমানেরা বলবে যে এ নিছক গপ্পো। এও জানি যে কদাচিত শেষ বিশ্লেষণে পণ্ডিতজির গল্প 'পাতা নড়ল, বান্দা ভা়গল'র চেয়ে বেশি ওজনদার প্রমাণিত হবে। এমন সম্ভাবনাও আছে যে পাতা বাড়লই না আর পণ্ডিতজি আগাগোড়া পুরো গল্প বানিয়ে ফেললেন। পুরাকাল থেকেই মানুষ গল্প তৈরি করে আসছে, এখনও করা হচ্ছে। আজকাল আমরা ঐতিহাসিক যুগে বেঁচে থাকার দাবি করি। প্রাচীন মানুষ 'কিংবদন্তির যুগে' থাকতেন, তারা ভাষার মাধ্যমকে অপূর্ণ মনে করতেন এবং 'কিংবদন্তি তত্ত্ব' কাজে লাগাতেন। কিংবদন্তি গপ্পো—ভাষার অপূর্ণতা ভরার চেষ্টা। আজও কি কিংবদন্তি তত্ত্বে আমরা প্রভাবিত হই? ভাষা ভীষণভাবে অর্থ দিয়ে বাঁচা। তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ শক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। কিংবদন্তী স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে। ভাষা আশ্চর্য হয়, অভিব্যক্ত করে ভাষাতীতকে। কিংবদন্তীর আবরণ সরিয়ে তাকে যাঁরা তথ্যানুযায়ী অর্থ দেন, তাঁদের মনোবিজ্ঞানী বলা হয়। যাঁরা আবরণের সার্বভৌম সৃজনশীলতা চেনেন তাঁদের শিল্প সমালোচক বলা হয়। দুজনেই ভাষার সাহায্য নেন, উভয়েই ধোঁকা খান। ভূত তো সরষের মধ্যে। সত্য সৃজনশক্তি স্বর্ণপাত্রে মুখ বন্ধ হয়ে ঢাকা পড়ে থাকে। একের পর এক গপ্পের স্তর জমে যাচ্ছে। ঝিনুকের চমকে রূপো দেখার মতো সমস্ত চাকচিক্য মনের অভ্যাস মাত্র। গপ্পো কোথায় নেই, কি নেই? থাকগে ছাড়ুন।

সব দেবদারুই এক রকমের হয় না। আমার একেবারে কাছে যেটা আছে, সেটা জরব ও অরসিকও। তারও একটু নিচে যেটি, সেটি খ্যাপাটে লাগছে। খাদের একপ্রান্তে এক মোটারাম আছে, অর্ধেক মাটিতে অর্ধেক আকাশ আর মাটির মাঝামাঝি, অর্ধেক ঠুঁটো আর অর্ধেক চকচকে, যেন পুরো পরিবারের কত্তা। একটি অপটু কিশোরের মতো, সবসময় হাসছে, কবির মতো লাগে। তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। সর্বদা এ-রকমই হয়ে আসছে। প্রত্যেক দেবদারুর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। একটি এত কমনীয় ছিল যে ষাঁড়ের ধ্বজাধারী মহাদেব তাকে নিজের ছেলে করে নিয়েছিলেন। মা পার্বতীর বুক থেকে দুধ গড়িয়ে

পড়েছিল। স্বয়ং কালিদাস বলেছেন। এমন কিছু লোক আছেন যাদের কাছে 'মুড়ি মুড়কি সমান।' সবাইকেই তারা একরকম মনে করেন। তাদের কাছে সেই অরসিক, সেই কত্তা, সেই কিপ্টে, সেই খ্যাপা, সেই ঝঞ্ঝাটে, সেই ঝাঁকড়ানো, সেই বাচাল, সেই ভরা, সেই খিটখিটে, সেই রগচটা, সেই মাথা দোলানো, সেই হাট্টাকাট্টা, সেই দুষ্টু, সেই চনমনে, সেই বাঁকা, সেই চতুরঙ্গী, সব সমান। মহাদেবের প্রিয় ছেলের কমনীয় ব্যক্তিত্বও তাঁরা চিনতে পারেননি। এক মদমত্ত হাতি এলো আর নিজের গালের চুনকালি সামলাবার জন্যে তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিকড় নড়ে গেল, পাতা ঝরে গেল, ছাল খুলে গেল আর উনি চুলকানি মেটাচ্ছিলেন। বাবা মহাদেব খুব রেগে গেলেন। স্বাভাবিক। তিনি তাঁর সুরক্ষার জন্য এক সিংহ দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার সামনে যে অপটু কবি আছে, তার কি হবে? জেনে রাখুন এদিকে হাতি আসেই না। তবু ভয় তো লাগেই। হাতি না হলেও গাধা ও খচ্চরে শহর ভরে আছে। কিন্তু আমি যেদিকে আছি সেদিকে তারা কম আসে। কখনও-সখনও এসে গেলেও দেবদারুর দিকে ফিরে তাকাবার সময় তাদের হয় না। তাদের দেখার আরও অনেক জিনিষ আছে। যাইহোক আপাতত, চিন্তার বিশেষ কারণ নেই। এ দেশের মানুষ বহু প্রজন্ম ধরে শুধু জরিত দেখে আসছে, ব্যক্তিত্ব দেখার না আছে অভ্যাস আর না আছে পরোয়া। সাধুজনেরা চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, 'দান কর তলোয়ার, খাপ থাক পড়ে', কিন্তু তলোয়ার বন্ধ পড়ে রইল, খাপের দরদামে বাজার গরম। কে-ই বা ব্যক্তিত্বকে পোছে। অর্থমাত্র হলো জাতি, ছন্দমাত্র হলো ব্যক্তিত্ব। অর্থ সহজেই চেনা যেতে পারে, কারণ সে পৃথিবীর ওপর চলে। ছন্দ সহজে ধরা যায় না, সে আকাশে ওড়ে।

আসল কথা হলো যখন আমি বলি দেবদারু সুন্দর, তো যারা শোনে তারা সুন্দরের সামান্য অর্থ নেয়। হাজার রকমের সুন্দর পদার্থে থাকা, এক সামান্য সৌন্দর্য-ধর্ম। সৌন্দর্যের কোন বিশেষ রূপ আমার হৃদয়-উল্লাস কীভাবে তরঙ্গিত করছে, তা একমাত্র আমিই জানি। এ কথা বলার শক্তি যদি আমার মধ্যে না থাকে তাহলে বোবার গুড় খাওয়ার মতো হয়ে থেকে যাবে। যার মধ্যে শক্তি থাকে, তাকে কবি বলা হয়। নানান কৌশলে সে একথা বলার চেষ্টা করে, তবুও শব্দের সাহায্য তো নিতেই হয়। শব্দ সবসময় সাধারণ অর্থ প্রকট করে, কবি বিশেষ অর্থ দিতে চায়। সে ছন্দের সাহায্যে, উপমান পরিকল্পনার শক্তিতে, ধ্বনি সাম্যের দ্বারা অর্থের সাধারণীকরণ করে। তাও কি তার বিশেষ অর্থ বুঝতে পারে?

একেবারেই নয়। কোন ভাগ্যবানের হৃৎস্পন্দন কবির হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মেলাতে পারে? কবি-হৃদয়ের সঙ্গে যার হৃদয় মিলে যায় তাকে 'সহৃদয়' বলা হয়ে থাকে। দেবদারুর উর্ধ্বশিখার শোভা। আমার হৃদয়ে বিশেষ উল্লাস সৃষ্টি করে। আমার ভেতরে কবিকৌশল নামক বস্তুই নেই। আমার বিশেষ অনুভবের সাধারণীকরণ করতে পারছি না। কবি হলে করে ফেলতাম। উপমানের ছটা দেখাতাম, সহৃদয়ের মনকে নিজ মনের তালে তালে নাচাবার যোগ্য ছন্দ খুঁজে নিতাম, ধ্বনি নিত্যসঞ্চারী সমতার এমন দৃশ্য তৈরি করতাম যে, শ্রোতার মন ময়ূরের মতো নেচে উঠত, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এসব কিছুই নেই। খালি ফ্যাল ফ্যাল করে দেখি, পাথরের কঠিন বুক ভেদ করে না জানি কোন কোন পাতাল থেকে দেবদারু নিজের রস টেনে নিচ্ছে আর ক্রম-হ্রস্ব ছায়ার চাঁদোয়া টাঙিয়ে কোনও অজ্ঞাত পরিচালকের তর্জনী সংকেতের মতো উর্ধ্বলোকের দিকে কিছু দেখাচ্ছে।

এত আঙুল কি এমনিই উঠে আছে? কিছু আছে, অবশ্যই কিছু রহস্য আছে। অন্তরে অনুভব করছি, কিন্তু বলার ভাষা কই? হায়, আমি অসমর্থ, মূক। মীমাংসকদের এক সম্প্রদায় মনে করত শব্দের অর্থ সেই পর্যন্ত যায় বক্তা, যে পর্যন্ত নিয়ে যেতে চায়। বক্তার ইচ্ছাকে বিবক্ষা বলা হয়। এঁরা বলেন জৈমিনিমুনি যখন বলেছিলেন যে 'যতপরঃ শব্দঃ সশব্দার্থঃ' তো তারও এই অর্থ ছিল। শিরায় শিরায় অনুভব করছি যে মুনির কথার অর্থ তা নয়। বিবক্ষা কোথায় এতদূর নিয়ে যায়? সুন্দর শব্দ প্রয়োগ করে আমি যা বলতে চাই তা কোথায় প্রকট হচ্ছে? বলতে তো অনেক কিছুই চাই, কেউ বুঝলে তো? না, শব্দ ততটাই বলতে পারে যতটা লোকে বোঝে। বক্তা যা বলতে চায় অতটা কোথায় বলতে পারে। পৃথিবীতে কবির কদর এই জন্যেই যে সে যা অনুভব করে, তা বক্তার মধ্যে ঢোকাতে পারে। 'প্রেষনধর্মিতা তাঁদের বলার একটি প্রধান গুণ। আমার মন যা অনুভব করছে আমি সে অর্থ পৌঁছে দিতে পারি না, কারণ শব্দ ও ছন্দের এমন অস্ত্র তৈরি করতে পারি না, যা আমার অনুভূতিকে তীরের মতো শ্রোতার হৃদয়ে বিঁধে যেতে পারে। অর্থ নিশ্চয় বক্তার ইচ্ছাধীন নয়। সে সামাজিক স্বীকৃতি চায়। তাতে লয় নেই, সঙ্গীত নেই, নাদ নেই, গতি নেই। সে স্থির। শব্দের গতিশীল আবেগে সে নড়ে, ভরভরায়, নতুন নতুন পরিবেশে সাজে, তবেই নতুন অর্থ সৃষ্টি করে। অর্থে লয় হয় না, লয়ের সাহায্যে নতুন অর্থ দেয়।

কিন্তু দেবদারু জমকদার গাছ। হাওয়ার দোলায় যখন দোলে তখন তার আভিজাত্যও নেচে ওঠে। কালিদাস এই হিমালয়ের সেই অংশের, যেখানে ভাগীরথীর নির্ঝর ঝরে পড়ে, শীতল মন্দ সুগন্ধ পবনের কথা বলেছেন, উনি শীতলতাকে ভাগীরথীর নির্ঝর শীকরের দান বলেছেন, সুগন্ধীকে আশেপাশে গাছের ফুলের সম্পর্কের জন্যে ঘোষিত করেছেন। দেবদারুর বারংবার কেঁপে ওঠায় একরকমের মত্ততা অবশ্যই আছে। যেন যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত অনুভূতিই এই মত্ততা প্রদান করেছে। যুগ বদলে যাচ্ছে, অনেক গাছ লতাপাতা পরিবেশের সঙ্গে সমঝোতাও করেছে, অনেকে সমতলে চলে গেছে, কিন্তু দেবদারুই নিচে নামল না, সমঝোতার রাস্তায় গেল না, আর নিজের বংশগত চলন ছাড়ল না। এমন হাসতে হাসতে দোলে যেন বলছে—আমি সব জানি, সব বুঝি। তোমার করিশ্‌মা আমি জানি, আমাকে তুমি কি লুকোতে পার—'কি লুকোবে আমায় সজনী বলি দেখে দেখে উটের চুরি!' হাজার হাজার বছরের উত্থান-পতনের এমন নির্মম বন্ধু দুর্লভ।

পাঁচ

আবার আমের বোল এসেছে

বসন্তপঞ্চমীর এখনও দেরি আছে। কিন্তু এখন থেকেই আমে বোল এসেছে। প্রত্যেক বছরই আমার চোখ এদের খোঁজে। ছোটবেলায় শুনেছিলাম যে বসন্তপঞ্চমীর আগে যদি আমের মঞ্জরি দেখা যায় তাহলে হাতের চেটোয় রগড়ে নেওয়া উচিত। কারণ এমন চেটো বছরভর বিছের বিষ সহজেই নামিয়ে দেয়। ছেলেবেলায় কয়েকবার আমের মঞ্জরি হাতে রগড়েছি। এখন করি না, কিন্তু বসন্তপঞ্চমীর আগে যদি কখনও আমের মঞ্জরি দেখা যায় তাহলে বিছের কথা মনে পড়ে যায়। ভাবি, আম ও বিছের মধ্যে কি সম্পর্ক? বিছে এমন এক প্রাণী যা আদিম সৃষ্টির সময় যেমন ছিল আজও প্রায় সেই রকমই আছে। জলপ্রলয়ের আগে পাথরের ফাটলে তার যে শরীর পাওয়া গিয়েছিল, আজও সেই রকমই আছে। এমন জন্তু কমই আছে যা অপরিবর্তশীল। ওদিকে আমে যত পরিবর্তন হয়েছে, তত খুব কম বস্তুতেই হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেন 'আম্র' শব্দ 'অম্র' বা 'অম্ল' শব্দের রূপান্তর। 'অম্র' মানে টক। শুরুতে আম নিজের টক স্বাদের জন্য বিখ্যাত ছিল। বৈদিক আর্যদের মধ্যে এই ফলের বিশেষ কদর ছিল না। সে সময় তো 'স্বাদ উদুম্বরম্' বা সুস্বাদু যজ্ঞ ডুমুরই বড় ফল ছিল। কিন্তু 'অমৃত' শব্দের ভাঙা গড়া কতকটা 'অম্ল'-র 'অম্রিত' (টক হওয়া) থেকেই হয়েছে হয়তো। পরে আম পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ফল হলো আর 'অম্রিত' অমৃত হয়ে গেল। নিজের নিজের ভাগ্য। শব্দেরও ভাগ্য হয়। কিন্তু এসবই অনুমান। সত্যি হতেও পারে, নাও পারে। পণ্ডিতদের সঙ্গে কে ঝগড়া করবে? কিন্তু বিছের সঙ্গে আমের সম্পর্কে, মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম। যখন আমের মঞ্জরি দেখি তখন বিছের কথা মনে পড়ে— বিছে যা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে অরসিক, সবচেয়ে রাগি ও সবচেয়ে প্রাচীন প্রাণী! প্রায়ই মোহক জিনিষ দেখে অপরালোক মনে পড়ে যায়। এমন হয় নাকি?

একটু মিলিয়ে নিন। আম্রমঞ্জরি মদনদেবতার অমোঘ বাণ আর বিছে মদনবিনাশী মহাদেবের বাণ। যোগী ভোগীকে ভস্ম করল, কিন্তু ভোগীর অস্ত্র যোগীর অস্ত্রকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আছে কি কোনও ঠিক ঠিকানা এই ছন্দোহীনতার! কিন্তু পুরো দুনিয়া অর্থাৎ শিশুদের দুনিয়া—একথা সত্যি মনে করে।

গত বছরও আমি বসন্তপঞ্চমীর আগে আমের মুকুল দেখেছিলাম। কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই আমকেই আবার ফুটতে হলো। খুবই অদ্ভুত লেগেছিল। তাড়াতাড়ি ফোটা কেন বাবা, একটু পরে ফুটতে। যাত্রা কি এমন নষ্ট হয়ে যেত! আমার এক বন্ধু বলেছিল, আমার মনে হয় বেচারি আমের মঞ্জরি নতুন বউয়ের মতো উকিঝুঁকি মারার জন্যে বাইরে একটু বেরিয়েছে অমনি সামনে আমাদের মতো অপয়াদের দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। আসলে এতো আমার বন্ধুর কল্পনা। যদি সত্যি হতো, তাহলে কোথাও

মুখ দেখাতে পারতাম না। কিন্তু ইতিহাসের কথা মনে পড়ে গেল। আশ্বস্ত হলাম, অপয়া নামের বদনাম থেকে বেঁচে গেলাম। সে ইতিহাস মনোরঞ্জক। শোনাচ্ছি।

অনেক আগে কালিদাস এ-রকমই একবার আমের মঞ্জরিকে সংকোচিত হতে দেখেছিলেন। 'শকুন্তলা' নাটকে তার কারণ বলেছেন। দুষ্মন্ত পরাক্রমী রাজা ছিলেন। তাঁর হৃদয় একবার প্রিয়াবিরহের বিষম জ্বালায় জ্বলছিল; তখনই বসন্ত এলো। রাজা বসন্তোৎসব না করার আদেশ দিলেন। আম বেচারা ভীষণভাবে তৃপ্ত হলো। তার স্বভাব একটু চঞ্চল। বসন্তই এলো না ব্যাকুল হয়ে ফুটে গেল। সেবারও মহাশয় পুলকিত হয়ে উঠলেন। ততক্ষণে রাজার আদেশ হলো। বোকা হতে হলো। মঞ্জরিতে মদনদেব নিজের বাণ লাগিয়েছিল। বেচারা আধটানা বাণ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল—'শংকং সংহরতি স্মরোপি চকিতস্তূর্ণার্ধকৃষ্টং শরম্।' আজকাল দুষ্মন্তের মতো প্রতাপী রাজা নেই। কিন্তু আগেরবার যখন মদনদেবতাকে নিজের অর্ধকৃষ্ট শর গুটিয়ে নিতে হয়েছিল, তখন কি করে বলি যে সেরকম প্রতাপী রাজা এখন আর নেই? অবশ্যই কোনও না কোনও পরাক্রমী মানুষ হয়তো কোথাও না কোথাও বিরহজ্বালায় জ্বলছে। কার্য যখন আছে কারণও থাকবে। ইতিহাস কি বদলে যাবে? আর এই ঘটনার পর কালিদাসকে যখন কেউ অপয়া বলে না, আমাকেই বা কেন বলবে?

আশা করি এবারে আমের মঞ্জরি শুকিয়ে যাবে না। আহা, কি মনোহর কোরক! এই 'আম্রহরিতপাণ্ডুর' শোভা! বলিহারি যাই। এখন সুগন্ধ ছড়ায়নি, কিন্তু দেরিও নেই। আম্রের কুঁড়িকে কালিদাস বসন্তের জীবিত-সর্বস্ব বলেছিলেন। ভারতীয়দের হৃদয় সে সময় বেশি সংবেদনশীল ছিল। তারা সুন্দরের সম্মান করতে জানতেন। গৃহদেবিরা লাল সবুজ হলুদ আমের কুঁড়ি দেখে আনন্দ বিহ্বল হয়ে যেত। তারা এই 'ঋতুমঙ্গল' ফুলকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখত। আজ আমাদের সংবেদনা ভোঁতা হয়ে গেছে। পুরেনো কথা পাড়লো মনে হয় যেন আধভোলা কোনও স্বপ্ন। রস মেলে কিন্তু কোন প্রতীতি হয় না। আশ্চর্য আবেশে পড়ি:

আত্তাম্মহরিয়পাণ্ডুর জীবিতসব্বং বসন্তমাসস্গ।
দিট্টোসি চূদকোরঅ উদুমঙ্গল তমং পসাত্রমি।।

আমের কুঁড়িকে খুশি করার কথা ভাবোচ্ছ্বাসের ভুলের মতো শোনা যায়। মানুষের মন এত বদলে যায়নি যে চিনতেই পারা যাবে না। আগে আম্রকোরক দেখে লোকেরা যদি নেচে উঠত, তাহলে আজকাল অন্তত পক্ষে লাফানো উচিত। ফুলে ভরা আম গাছ দেখে সহজভাবে এড়িয়ে যাওয়া হাজারো মানুষ আমি নিজের চোখে দেখেছি। কেউ নেচে ওঠে না। কিন্তু একবার আমিও একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম আর, একটা কবিতা লিখেছিলাম। এখনও ছাপাইনি, কিন্তু ভাবছি ছাপানো উচিত। নিদেনপক্ষে লোকে বলবে কবিতায় কোনও সার নেই। এমন বড় কবি নই, অকবি হওয়ার বদনামকে ভয় পাব কেন? এই কবিতা আম্রকোরকের অদ্ভুত বিহ্বলকারিণী শক্তির পরিচায়ক হয়ে আমার কাছে পড়ে আছে।

কামশাস্ত্রে 'সবন্তক' নামক উৎসবের চর্চা করা হয়েছে। 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণে' লেখা আছে, বসন্তাবতারের দিনকে 'সবসন্তক' বলা হয়। বসন্তাবতার অর্থাৎ যেদিন বসন্ত অবতার হয়েছিলেন। আমার মনে হয় বসন্তপঞ্চমীই বসন্ত অবতারের তিথি। 'মাৎস্যযুক্ত' ও 'হরিভক্তিবিলাস' ইত্যাদি গ্রন্থে এই দিনটিকেই বসন্তের প্রাদুর্ভাব দিবস বলা হয়েছে। এই দিনেই মদনদেবের প্রথম পূজা হয়। এও ভাল তামাশা। জন্ম হলো বসন্তের আর উৎসব হচ্ছে মদনদেবের। মানেই হয় না। আমার মন সে যুগের উৎসব দেখতে চায়, কিন্তু হায় তা দেখা কি সম্ভব? 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণে' মহারাজা ভোজদেব সবসন্তকের একফালি ছবি এঁকেছেন। সেই যুগের মেয়েরা এদিন গলায় নীল পদ্মের মালা আর কানে দুর্লভ আম্রমঞ্জরি পরে গ্রাম আলো করত :

ছনপিট্ঠধূমরথনি, মহুমতাতম্মচ্ছি কুঅলিআহরণে।
কন্নকতাচুঅমঞ্জরি পুত্তি তুত্র মণ্ডিও গামে।।

কিন্তু এ তো কিছু পরের কথা। এর আগে কি হতো? বসন্তের জন্মদিনে কি মদনের জন্মোৎসবও পালিত হতো? ধর্মশাস্ত্রের নানান পুঁথিতে লেখা আছে, বসন্ত-পঞ্চমীর দিন মদনদেবের পূজা করলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ খুশি হন। এ তো আরও মজার কথা। তান্ত্রিক আচারে যারা বিষ্ণুভজন করে তাদের মতে কামগায়ত্রী-ই হলো শ্রীকৃষ্ণগায়ত্রী। তাহলে কি কামদেব আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন দেবতা? পুরাণে লেখা আছে যে কামদেব শ্রীকৃষ্ণের বংশে পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিলেন। শম্বর নামক মায়াবী অসুর তাকে হরণ করেছিল এবং সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। মাছ তাকে খেয়ে ফেলেছিল। ভাগ্যক্রমে সেই মাছ শম্বরের ভোজনশালায় এসে পড়ে আর বালক মাছের পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে। কামদেবের স্ত্রী রতিদেবী আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। আর এই সুযোগে যে ব্যক্তির সেইখানে যাওয়ার দরকার ছিল, সেই নারদমুনিও পৌঁছেছিলেন। তার কাছেই রতি সমস্ত বৃত্তান্ত জেনেছিলেন। প্রদ্যুম্নকে পালন করা হলো, শম্বরকে মারা হলো, শ্রীকৃষ্ণের ঘরে পুত্রই নয়, যথাসময়ে পুত্রবধূও এসে গেল; ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরাণে অসুরদের প্রায়ই শৈব বলা হয়েছে। কামদেব তাদের শত্রু। এটা তো বোঝা যায়, কিন্তু ভাগবতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে হল? আমার মন আধভোলা ইতিহাসের আকাশে চিলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও কোনও উজ্জ্বল জিনিস দেখলে ছোঁ মারবে। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সুদূর ইতিহাসের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন আকাশে কিছু দেখার আশা করা মূর্খামি ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু অভ্যাস বড় খারাপ জিনিষ। আমাদের সাহিত্যে আর্যদের সঙ্গে অসুর দানব ও দৈত্যদের লড়াইয়ের কথা প্রচুর আছে। থেকে থেকেই আমার মন মানুষের এই অদ্ভুত বিজয়যাত্রার দিকে চলে যায়, কি ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল, যখন দোলনায় শুয়ে থাকা শিশুদেরও হয়তো চুরি করা হতো আর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হতো; কিন্তু সেসব ভুলেটুলে দুই বিরোধী পক্ষের দেবতাদের সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছি? আজ এই দেশে হিন্দু আর মুসলমান এ-রকমই লজ্জাজনক সংঘর্ষে ব্যপ্ত। বাচ্চা আর মেয়েদের মেরে ফেলা, চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া, বাড়িতে আগুন লাগানো তো খুবই সামান্য ব্যাপার হয়ে গেছে, আমার মন বলছে এ-

সবই লোকে ভুলে যাবে। দুই পক্ষের ভাল দিকগুলো নিয়ে খারাপ দিকগুলো ভুলিয়ে দেওয়া হবে। পুরোনো ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে বর্তমান ইতিহাস নিরাশাজনক মনে হয় না। কখনও কখনও নিষ্কম্মা অভ্যাসেও আরাম পাওয়া যায়।

তো, 'ভাগবতপুরাণের' শর্ধর অসুরের নাম পুরাণসাহিত্যে নানাভাবে লিখিত পাওয়া যায়, শম্বরও পাওয়া যায়, সম্বরও, সাত্তর অথবা শাবরও পাওয়া যায়। কোনও বিদেশি ভাষার শব্দ হবে হয়তো, পণ্ডিতরা হয়তো নানানভাবে শুধরে নিয়েছেন। একে ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যার আচার্য বলা হয় অর্থাৎ 'যাতুধান'। যাতু আর জাদু একই শব্দের বিভিন্ন রূপ। একটি ভারতের অন্যটি ইরানের। এরকম শব্দ অনেক আছে। ইরানে একটু বদলে গেছে আর আমরা তাকে বিদেশি মনে করছি। 'খুদা' শব্দ আসলে বৈদিক 'স্বধা' শব্দের ভাই। 'নমাজ'-ও সংস্কৃত 'নমস' এর আত্মীয় পরিজন। 'যাতুধান'কে ঠিকভাবে ফার্সিবেশে সাজালে 'জাদুদাঁ' হয়ে যাবে। কালিকাপুরাণে শাবর অসুরের নামে শাবরোৎসবের উল্লেখ আছে, এতে অশ্লীল গালাগালি দেওয়া আর শোনা জরুরি হয়। শ্রাবণ মাসে এই উৎসব হতো আর বিশেষভাবে বেশ্যারা অংশ গ্রহণ করত। পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই বছরে একদিন এ-রকম উৎসব হয় যাতে অশ্লীল গালাগালি জরুরি হয়। আমাদের এখানে ফাল্গুন চৈত্রে এরকম উৎসব হয়। একেই মদনোৎসব বলা হয়। ভাবি, মদনোৎসবের মতো আরও একটা উৎসব কি প্রচলিত ছিল যার উদ্যোক্তা অসুররা ছিল? অসুরদের সঙ্গে মদনদেবের সংঘর্ষ থেকে কি দুই বিভিন্ন সংস্কৃতির দ্বন্দ্বই স্পষ্ট হয়? কে বলবে?

এদেশে অসুরদের সঙ্গেই আর্যদের সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ করতে হয়েছিল। দৈত্যদানব ও রাক্ষসদের সঙ্গেও তাদের লড়তে হয়েছিল, কিন্তু অসুরদের সামলাতেই তাদের শক্তিক্ষয় করতে হয়েছিল। তারাও খুব উন্নত ছিল। সবদিক থেকেই সভ্য ছিল। তারা বড় বড় শহর তৈরি করেছিল। অট্টালিকা তৈরি করেছিল; জলেস্থলে অধিকার পাকা করেছিল। গন্ধর্ব যক্ষ ও কিন্নরদের সঙ্গে আর্যদের বিশেষ লড়াই করতে হয়নি। এরা অনেক শান্তিপ্রিয় জাতি ছিল। বিলাসী ছিল। কামদেব বা কন্দর্প গন্ধর্বই ছিলেন। কেবল উচ্চারণ পাল্টে গেছে। এরা আর্যদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। অসুরেরা এদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অসুর বিজয়ী হয়নি। তাদের সংঘর্ষ অসফল হয়েছিল।

কিন্তু, আমের মঞ্জরির সঙ্গে বিছের সম্পর্ক এখনও আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেয়। পুঁথি পড়ি, এবং সম্মানও করি, কিন্তু লোকপ্রবাদ হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারিনি। আমার মনে হয়, এই প্রবাদগুলোয় মানবসমাজের জীবন্ত ইতিহাস সুরক্ষিত আছে। যখন কোনও লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও পুঁথির বিরোধ হয়, তখন আমার মনে কিছু নতুন রহস্য পাওয়ার আশা জেগে ওঠে। সবসময় নতুন কথা পাই না, কিন্তু হারও মানি না। কখনও কখনও বড় বড় পণ্ডিতদের কথায় অসঙ্গতি দেখতে পাই, বলতে গেলে ঢোঁক গিলি, নতুন পণ্ডিতদের ক্রোধকে ভয় পাই, কিন্তু মন থেকে একথা কখনও দূর হয় না যে পণ্ডিতদের কথার সঙ্গতি লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গেই হতে পারে। কোথাও কিছু পড়ে থাকছে, কিছু ভুলে যাচ্ছে। উদাহরণ দিই।

ক্ষেমেন্দ্র অনেক বড় সহৃদয় ও বহুশ্রুত আচার্য ছিলেন। তিনি বহু পুঁথি লিখেছিলেন। একটির নাম 'ঔচিত্য বিচারচর্চা'। তাতে তিনি বিশেষ্য শব্দের ঔচিত্য প্রসঙ্গে কালিদাসের

'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের সেই শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন যাতে রাজা বিরহাতুর দশায় বলছেন যে এমনিই তো দুর্লভ বস্তুর জন্য উৎসুক পঞ্চবাণ (কামদেব) আমার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে, এখন মলয়পবনে আন্দোলিত এই আম গাছেরা অঙ্কুর দেখিয়ে দিল। এখন তো ভগবানই মালিক :

ইদমসুলভ বস্তু প্রার্থনা দুর্নিবারঃ
প্রথমপি মনো মে পঞ্চবাণঃ ক্ষিনোতি।
কিমুত মলয়বাতান্দোলিতৈ: পাণ্ডুপত্রৈঃ
রূপবনসহদারৈর্দশিতিম্বংকুরেষু।।

এবার সহৃদয় শিরোমণি ক্ষেমেন্দ্র বলছেন যে কামদেবকে পঞ্চবাণ বলা উচিতই হয়েছে। কামদেবের পঞ্চবাণে একটি তো আমের মঞ্জরির অঙ্কুর। কিন্তু আমি একেবারেই উল্টো ভাবছি। আমি বলি পঞ্চবাণ বললে তো আম্র-কোরকও বলে ফেলা হলো, আবার দ্বিতীয়বার তার চর্চা করা কি সঙ্গত? আমি যদি ভাল পণ্ডিত হতাম তাহলে ক্ষেমেন্দ্রর ভুল বার করতাম, কিন্তু দুঃখের কথা আমি 'ভাল' পণ্ডিত নই। আমার মন প্রশ্ন করছে, কালিদাস কি আমের মুকুলকে মদনদেবের পঞ্চবাণের মধ্যে গুনতেন না? এমনিতে তো পৃথিবীর সব ফুলই মদনদেবের তূণীরে আসতেই পারে, কিন্তু কালিদাসের যুগে হয়তো লোক প্রচলিত কোনও বিশ্বাস অবশ্যই ছিল আম পাঁচটি বাণের অতিরিক্ত। যদি এমন না হতো, তাহলে কালিদাস এই শ্লোকে পঞ্চবাণ শব্দের ব্যবহার করতেন না। প্রমাণ দিতে পারি। কিন্তু কে শোনে? এক জায়গায় কালিদাস আমের কুঁড়িকে আশীর্বাদ পাইয়েছেন যে তুমি কামের পঞ্চবাণের থেকেও অভ্যদিক বাণ হও। মনে হয় 'অভ্যদিক' শব্দের সোজা মানে হলো যে পাঁচের অতিরিক্ত ষষ্ঠ বাণ হও। কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন এর ঠিক মানে হলো, পাঁচটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। হবে হয়তো, ঝামেলায় কে পড়তে চায় বাবা! অতীত অন্ধকারে উকিঝুঁকি মারলে কি কিছু দেখা যেতে পারে না? মদনদেব আমাদের সাহিত্যে কবে এলেন আর তার বাণেরই বা কি ইতিহাস? আর বিছের সঙ্গেও তার কোনও সম্পর্ক আছে না কি?

পুরাণের সাক্ষ্য অনুসারে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে অসুরদের শেষ পরাজয় অনিরুদ্ধ আর উষার বিয়ের সময় হয়েছিল। ভগবান শঙ্করের পুরো বাহিনী অসুর-পক্ষে লড়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ শিবকে বেঁধেছিলেন, স্কন্দ (দেবসেনাপতি) বেঁধেছিলেন প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেবকে। শিবের দলে ভূত ছিল, প্রমথ ছিল, যাতুধান ছিল, বেতাল ছিল, বিনায়ক ছিল, ডাকিনী ছিল, প্রেত ছিল, পিশাচ ছিল, কুষ্মাণ্ড ছিল, ছিল ব্রহ্মরাক্ষস—অর্থাৎ পুরো সেনা ছিল, বিছেও ছিল হয়তো। ম্যালিরিয়ার জ্বরও ছিল। এই যুদ্ধে অসুররা বিশ্রীভাবে হেরেছিল। শিবও হেরেছিল। দেবতাদের দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে কামাবতার প্রদ্যুম্নর কাছে হারতে হয়েছিল। ময়ূর সমেত বেচারা পালিয়ে গিয়েছিল। ভাগবতে এ-গল্প সবিস্তারে বলা হয়েছে। এরপর, ইতিহাসে অসুরেরা আর কখনও মাথা তোলেনি। শিবের সেনা প্রথমবার পরাজিত হয়েছিল। কবে ও কীভাবে প্রদ্যুম্ন আমের কুঁড়ির বাণ সন্ধান করেছিল আর বেচারা বিছে

পরাজিত হয়েছিল, এ গল্প ইতিহাসে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু মানুষ জেনে গেল আর শিশুদের জগৎও খবর পেয়ে গেল।

আমি অন্য কথা ভাবছি। দুনিয়ায় অনেক ফুল আছে। আম ফুল অপেক্ষা ফলরূপে বেশি বিখ্যাত। কবিদের কথা ছাড়ুন। তারা কখনও কখনও বাড়িয়ে বলেন। নিজেদের ভেতরে একটু সুড়সুড়ি হতেই মনে করেন যে পুরো দুনিয়া তাঁর মতোই পাগল হয়ে গেছে। আমরাও জানি যে আমের মঞ্জরি মাদক হয়, কিন্তু কবি বলেন, যখন দিগন্ত সহকার-মঞ্জরির কেসরে মূর্চ্ছামান হয় আর মধু খাওয়ার জন্যে ভ্রমর গলি-গলি ঘুরে বেড়ায়, তখন এ ভরা বসন্তে কার মন উৎকণ্ঠায় ভরে যায় না?

সহকার কুসুমকেসর নিকর ভরামোদমূর্চ্ছিত দিগন্তে।
মধুর মধু-বিধুর মধুপে মধৌ ভবেৎ কস্য নোতকণ্ঠা?

এখন যদি কোনও সভায় আপনিই এ প্রশ্ন করেন, তাহলে প্রায় শতকরা একশোজন ভালমানুষই 'মম', 'মম' বলে চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু কবি তো নিজের মতোই বলতে থাকবেন। কিন্তু ভাল ল্যাংড়া আম দেখিয়ে যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে এটি পাওয়ার উৎকণ্ঠা কার নেই, তাহলে পুরো সভা চুপ করে থাকবে। ব্যাস মনে মনেই বলবে, এমন প্রশ্ন করা কি উচিত? আম দেখে কার জিভে জল আসবে না? একবার কবিবর রবীন্দ্রনাথ চিন গিয়েছিলেন। তিনি আম খেতে পারেননি। ঠাট্টা করে এক বন্ধুকে বলেছিলেন, 'দেখ যতদিন বাঁচব সেটা হিসেব করে তার থেকে এক বছর কমিয়ে দিয়ো। কারণ যে বছর আম খাওয়া গেল না সেটিকে আমি বেকার মনে করি।' কোনও কবি আমের মঞ্জরির সুগন্ধ না পাওয়ার জন্যে নিজের জীবনের কোনও বছরকে বেকার মনে করেছেন এখনও তেমন কোনও রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তাই আমি বলতে চাই, আমের ফুলের এত বর্ণনা হওয়াই উচিত নয়। অরবিন্দ হোক, অশোক হোক, নবমল্লিকা হোক, নীলোৎপল হোক, এতে ফল তো হয়ই না আর হলেও না হওয়ার মতোই হয়। এরা কামদেবের অস্ত্র হতে পারে, কারণ এরা অপ্সরা জাতির ফুল। এদের সৌন্দর্য কেবল লোক দেখানো। এরা কামদেবের আদরের হতে পারে। কিন্তু আমকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা? এ তো অন্নপূর্ণার প্রসাদ। ধন্বন্তরির অমৃত কলস। মাতা ধরিত্রীর মধুর দুধ।

আমার অনুমান যে আম আগে এত টক আর এর ফল এত ছোট হতো যে এর ফল কেউ ব্যবহার করত না। এও সম্ভবত হিমালয় পার্বত্যদেশের জংলি গাছ। এর মনোহর কুঁড়ি আর দিগন্ত মূর্চ্ছিত করে দেওয়া আমোদ লোক হৃদয়কে মুগ্ধ করত। ধীরে ধীরে এই ফল সমতলে এলো। মানুষের পরশপাথররূপী হাতের ছোঁয়ায় এই লোহাও সোনা হয়ে গেল। গঙ্গার সোনা ফলানো মাটি এর চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। আশ্চর্য হয়ে মানুষের অদ্ভূত শক্তির কথা ভাবি। আলু কি থেকে কি হয়ে গেল। বেগুন কন্টকারী থেকে বার্তাকু হয়ে গেল। সেইরকম আমও বদলেছে। না জানি মানুষের হাতে বিধাতার সৃষ্টির আরও কি কি পরিবর্তন হবে; আজ দুর্ভিক্ষ আর অন্নসংকটের যে হাহাকারে মন কষ্ট পাচ্ছে, তা শাশ্বত নয়। মানুষ তাকেও জিতবে। কত অব্যবহার্য জিনিসকে সে ব্যবহার্য করেছে; কত

টক' জিনিষ তার হাতে 'অমৃত' হয়ে গেছে। কে জানে মহান 'গোধূম' লতা (গম) কোন দিন সত্যিসত্যিই গরুর ওপরে বসা মশা তাড়ানোর ধূঁয়া তৈরির কাজে আসবে? নিরাশার কোনও কথা নেই। মানুষ এই বিশ্বের অজেয় প্রাণী।

হ্যাঁ, তাহলে সেই প্রাচীন যুগে গন্ধর্ব অথবা (সংস্কৃতে অন্য উচ্চারণ প্রচলিত আছে) কন্দর্পদেব নিজের তূণে এই বাণ সাজিয়েছিল। কবিরা সেই আদিমকালের কথা বসন্তে শুনতে পান। মানুষ কি ভুল বলে যে 'যেথা না পৌঁছে রবি, সেথা পৌঁছায় কবি?' কোন বিস্মৃত যুগের কথা তারও আজও গেয়ে চলেছেন? কালিদাস অবশ্যই কিছুটা থমকে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর সময়ে হৃদয়বানেরা আমকে অরবিন্দ অশোক আর নবমল্লিকার সঙ্গে এক সারিতে বসাতে দ্বিধা করত। বাৎস্যায়ন 'কামসূত্রে' যেখানে আম আর মাধবীলতার বিয়ের বিশুদ্ধ বিনোদের কথা বলেছেন, সেখানে নবাম্রখাদনিকা বা আমের কুশি খাওয়ার উৎসব ভোলেননি। আম্রমঞ্জরি বিধাতার বরদান, কিন্তু আমের ফল মানুষের বুদ্ধির পরিণাম। অদ্ভুত প্রাণী মানুষ প্রকৃতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসে। বিশাল এ বিশ্ব আশ্চর্যজনক, কিন্তু তাকে বোঝার ও নিজ করতলগত করার জন্যে মানুষ আরও আশ্চর্যজনক। আমের মঞ্জরি সেই আশ্চর্যের বার্তা নিয়ে এসেছে 'উদুমঙ্গল তুমংপসাএমি।।'

ছয়

বসন্ত এসে গেছে

যে জায়গায় বসে লিখছি তার আশেপাশে কিছু গাছ আছে। শিরীষ, যাতে লম্বা লম্বা শুকনো ছিম ঝুলে আছে। কিছু পাতা ঝরে গেছে আর কিছু ঝরতে চলেছে। অল্প হাওয়া বইতে না বইতেই অস্থিমালা পরা উন্মত্ত কাপালিক ভৈবরের মতো খড়খড়িয়ে দুলে উঠছে। 'কুসুমজন্ম ততো নব পল্লবা'র কোনও নামগন্ধ নেই। নিম আছে। তরুণ, কিন্তু খুব ছোট কিছু কচি পাতা ছাড়া যৌবনের কোনও লক্ষণ তাতে নেই। তবুও খারাপ মনে হচ্ছে না। গোঁফ বেরোতে শুরু করেছে। আর আশা তো আছেই। দুটি কৃষ্ণচূড়া আছে। স্বর্গীয় কবিবর রবীন্দ্রনাথের হাতে লাগানো গাছের মধ্যে এই শেষ। এদের শিশু বলাই ভাল। এতে ফুল কখনও আসেনি, কিন্তু এরা অবুঝ। ভরা ফাগুনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন আষাঢ় মাস। নীল মসৃণ পাতা আর শিখান্তে সূচ্যগ্র। দু-তিনটি পেয়ারা গাছ কোনও ঋতুতেই রং বদলায় না—এতে এখন দু-চারটে শাদা ফুল ফুটে আছে; কিন্তু এমন ফুল মাঘেও ছিল, আর জ্যৈষ্ঠও থাকবে। জাতীয় ফুলের মধ্যে কেদার একটি; কিন্তু এর ওপর এমন মৃত্যুবিকার ছেয়ে আছে যে কবি-প্রসিদ্ধির ওপর লেখা আমার একটি প্রবন্ধ সংশোধন করার

দরকার মনে হয়েছিল। এক বন্ধ অস্থানে মল্লিকা লাগিয়ে রেখেছে, ব্যাস, কোনও রকমে বেঁচে আছে। দুটি করবী আর কোবিদারের ঝাড়ও সেই বন্ধুর দয়ার ফল, কিন্তু তারাও ভীষণ চুপচাপ। কোথাও উল্লাস নেই, দাপাদাপি নেই আর কবিদের জগতে চেঁচামেঁচি শুরু হয়ে গেল। প্রকৃতিরানি নতুন সাজে সেজেছে, আরও কি কি। কবির আশ্রমে থাকি। নিতান্ত ঠুঁটো নই, কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন না হলে কে কি করতে পারে? হিন্দি ভবনেই দুটি কাঞ্চন ফুলের গাছ.আছে। একটা ঠিক আমার দরজায় অপরটি আমার পড়শির দরজায়। ভাগ্যের বিড়ম্বনা দেখুন, গাছ দুটো একই দিনে লাগানো হয়েছে। আমারটি বেশ মোটাসোটা। প্রতিবেশীরটি দুর্বল মরার মতো। কি বলব, আমারটিতে ফুল এলো না, আর ও ব্যাটা কাঁধ পর্যন্ত ফুলে ঢেকে গেছে। মরার মতো গাছ কিন্তু আপনি তাতে ফল ছাড়া কিছুই দেখতে পাবেন না। পাতাই নেই অথচ ডালপালা ফুলে ঢেকে গেছে। রোজই দেখি আমার মানিকচাঁদ কতটা এগোলো। কাল তিনটে ফুটেছিল। তার মধ্যে দুটি তো একটি সাঁওতালি মেয়ে তুলে নিয়ে গেছে। একটা ছিল। কাঞ্চন ফুলের লালিমা আমার খুব ভাল লাগে। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই ফুলের বড়া খুব ভাল হতে পারে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে এত স্বাস্থ্যবান গাছ খালি পড়ে আছে আর দুর্বল গাছটা ফুলে ফুলে ভরে আছে। হয়তো দুর্বলদের মধ্যে ভাবুকতা বেশি থাকে।

লেখাপড়া করি। এটাই পেশা, পুঁথিপত্র পড়েই জগৎ সম্পর্কে সামান্য কিছু জানি। পড়েছি হিন্দুস্থানের যুবকদের মধ্যে কোনও ইচ্ছা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। গাছপালাকে আরও খারাপ দেখি। পুরো দুনিয়ায় হল্লা হয়ে গেল যে বসন্ত এসে গেছে। কিন্তু এ-ব্যাটাদের কাছে কোনও খবরই নেই। কখনও কখনও ভাবি যে এদের কাছে খবর পৌঁছানোর কি কোনও উপায় হতে পারে না। মহুয়ার বদনাম আছে যে সবার শেষে সে বসন্ত অনুভব করে, কিন্তু জামই বা কি ভাল। তাতে তো ফুল আরও পরে ফোটে। আর কালিদাসের আদরের সোঁদাল গাছ। তিনি তো জ্যৈষ্ঠে মৌজে আসেন। আমার এমন মনে হয় যে বসন্ত তাড়াতাড়ি চলে। দেশে নয়, কালে। কারও বসন্ত পনেরো দিনের, হয় তো, কারও না মাসের। পেয়ারা খুব মত্ত। বারো মাসই তার বসন্ত। হিন্দি ভবনের সামনে গন্ধরাজ ফুলের ঝারি আছে। এরাও আজব, বর্ষায় ফোটে, কিন্তু কোনও বিশেষ ঋতু নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। বৃষ্টি পড়লে আজও ফুল নেওয়া যেতে পারে। বিষ্ণুকান্তা এমন এক ঘাস যার চর্চা কবিদের মাঝে কখনও হয়নি, হিন্দি ভবনের উঠোনে অনেক আছে; কিন্তু আহা! কি নীল শ্যামল রূপ! মেঘের কথা ছাড়ুন, একটু পূব হাওয়া বইলেই তার কি উল্লাস। বর্ষার সময় এত ফোটে যে কি বলব। ভাবি, এরকম তুচ্ছ লতা কীভাবে খবর পায়। একটু দূরে পলাশ ফুল দেখে হিংসা হয়। কিন্তু তাকে কে বললে যে বসন্ত এসে গেছে? আমি অল্প-স্বল্প বুঝতে পারি; বসন্ত আসে না নিয়ে আসা হয়। যে চায়, যখন চায়, নিজের জন্যে নিয়ে আসতে পারে। সে সেই মর-মর গাছ কাঞ্চন নিয়ে এসেছে। আমায় মোটারাম তৈরি করেছে, আর আমি?

আমার জ্বর আসছে। এও নিয়তির ঠাট্টা। পুরো দুনিয়ায় হল্লা হয়ে গেছে যে বসন্ত আসছে। আর আমার কাছে এলো জ্বর। আমার কাঞ্চনকে দেখি আর ভাবি, আমার জন্য সে থমকে যায়নি তো? কারণ মেনে নিলেও এ প্রশ্ন থেকেই যায় যে, বিজ্ঞান আর প্রতিভাশালী ব্যক্তিও সাধনের অশুচিতার শিকার কেন হয়ে যায়। কোনও বড় কারণ হওয়া উচিত, যা বুদ্ধিমানের বুদ্ধির ওপর সহজেই পর্দা ফেলে দেয়। কবীরদাস সম্পর্কে যতদূর

জানি, তিনি নিজেই কারণের দিকে সংকেত করেছিলেন। ঘর গড়ার অভিলাষই এই প্রবৃত্তির মূল কারণ। মানুষ কেবল সত্য পাওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ টিঁকে থাকতে পারে না। তার ধন চাই, যশ চাই, মান চাই, কীর্তি চাই। 'সত্য' নামধারী বড় বস্তুর চেয়েও এই প্রলোভন বেশি শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কবীরদাস স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যারা তার পথে চলতে চায়, তারা নিজের ঘরবাড়ি ফুঁকে দিকঃ

কবীর দাঁড়িয়ে বাজারে হাতে নিয়ে লাঠি
চলুক সে সাথে সাথে যে কাঁকে ঘরবাড়ি।

ঘর ফোঁকার অর্থ হলো ধন ও মানের মোহ ত্যাগ করা; অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দেওয়া, আর সত্যের সামনে সোজা দাঁড়াবার যে সব বাধা আছে, সেগুলে নির্মম ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু সত্যের সত্য হলো এই যে মানুষ কবীরদাসের সঙ্গে চলার প্রতিজ্ঞা করার পরেও ঘর বাড়ি ফুঁকতে পারেনি। মঠ হলো, মন্দির হলো, প্রচারের সাধন আবিষ্কৃত হয়েছে আর তার মহিমা-গানের জন্যে অনেক পুঁথি লেখা হয়েছে। বরাবর চেষ্টা হয়েছে যে নিজের আশপাশের সমাজে যাতে কেউ বলতে না পারে যে তার অমুক কাজ সামাজিকভাবে অনুচিত। অর্থাৎ বিদ্রোহী হওয়ার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছে, মিটমাট আর সমঝোতার রাস্তা মেনে নেওয়া হয়েছে। পরে 'গুরু-পদ' পাওয়ার জন্যে হাইকোর্টেরও শরণাপন্ন হয়েছে।

সব ভুল হয়েছে বলা কোনও কাজের কথা নয়। কেন এই ভুল হলো? মায়া থেকে ছাড়া পেতে মায়া-প্রপঞ্চ তৈরি করা হলো, এতো সত্য। কবীরপন্থার নাম এখনও এজন্যেই এসেছে যে কবীপন্থী সাহিত্য পড়তে পড়তে আমার মনে এলো; নাহলে সমস্ত মহাপুরুষ প্রবর্তিত পথের তো একই গল্প। মায়াজাল ছাড়লেও ছাড়ে না; এতো ইতিহাসের চিরোদঘোষিত বার্তা সব দেশে আর কালে সমানভাবে সত্য।

স্পষ্ট মনে হয় যে, ঘর করার মায়া বড় প্রবল আর জগতে খুবই কম লোক এর হাত থেকে বাঁচতে পারে। এই প্রবল শক্তির বাস্তবতা ওল্টায় যায় না। একে মেনে নিয়েই এর আকর্ষণ থেকে বাঁচার কথা ভাবা যেতে পারে। স্বয়ং কবীরদাস না জানি কতবার এই প্রবল মায়ার শক্তির প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট করেছেনঃ

এ মায়া রঘুনাথের বাউলি খেলতে চলে আছেট হে।
চতুর রঙ্গিলা বেছে বেছে মারে রাখে না কারোও কাছে হে।
দেখি পীর দিগম্বর ধ্যান ধরা যোগীরে মারে হে।
জ।লের জ।ল মারে মায়া কেউই না ভোগে হে।
বেদ পড়া বেদুআ পূজা করা স্বামী মারে হে।
অর্থ বিচার করা পণ্ডিত মারে বাঁধ সবারে লাগামে হে।
ইত্যাদি

আমি যেমন যেমন কবীরপন্থি সহিত্য পড়ে চলেছি, তেমন তেমন একথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে আশপাশের সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাব খুবই বড়। সে সত্য জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্যকে বাজে ভাবে কব্জায় করে ফেলেছে। কবীরপন্থেই শুধু এরকম হয়নি। সমস্ত বড় বড় মতের একই অবস্থা। পয়সাই সমাজ ও মান প্রতিষ্ঠার সাধন। চারিদিকে যখন পয়সার রাজত্ব তখন তার আকর্ষণ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া কঠিন। পন্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে পয়সা চাই। এই আকর্ষণ না কাটাতে পারার জন্যে যারা নিন্দা করেন, তারা আসলে খুব ওপরে ওপরে সমস্যা দেখেন।

বরাবর আমি ভাবি যে এমন কি কোনও উপায় হতে পারে না যাতে পয়সার রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। আমাদের সমস্ত বড় বড় চেষ্টা এই একটি ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়। কোনও ব্যবস্থা হতে পারে কি, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দরকারি পয়সা পেয়ে যাক আর তার থেকে বেশি পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না? যদি এমন হতো তাহলে সেই সব অসভ্য সাহিত্য লেখাই হতো না, যা কেবল গ্রন্থ আর তার প্রর্বতকদের মহিমা বাড়ানোর উৎসাহে বরাবর সব কথা ঢাকার চেষ্টা করে। যেগুলি পন্থ-প্রবর্তকেরা কঠিন সাধনায় পেয়েছেন। প্রাচীন তান্ত্রিক আচার্যেরা বলেছেন যে রাগ বন্ধনের কারণ হয়, সেগুলিই মুক্তিরও কারণ হয়। কাম ক্রোধ ইত্যাদি মনোবৃত্তি, যাদের শত্রু বলা হয়, সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে পরম সহায়ক বন্ধু হয়ে যায়। এমনকী কোনও সামাজিক ব্যবস্থা হতে পারে না, যাতে 'ঘর তৈরির মায়া'-ও বেঁচে থাকে আর সত্যের পথে কোনও বাধাও থাকবে না, আমার মন বলে, এ সবই সম্ভব।

সাত

নখ কেন বাড়ে?

বাচ্চারা কখনও কখনও মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া প্রশ্ন করে থাকে। অল্প জানা বাবা খুব দয়ার পাত্র হন। আমার ছোট মেয়ে সেদিন যখন প্রশ্ন করল নখ কেন বাড়ে, আমি কিছু ভাবতেই পারছিলাম না। প্রত্যেক তৃতীয় দিনে নখ বেড়ে যায়, বাচ্চারা যদি কিছু দিন তাদের বাড়তে দেয়, তাহলে মা বাবারা প্রায়ই বকাঝকা করে। কিন্তু কেউই জানে না, এই অভাগা নখ কেন এভাবে বাড়ে। কেটে ফেলুন, চুপচাপ তারা শাস্তি মেনে নেবে; কিন্ত নির্লজ্জ অপরাধীর মতো ছাড়া পেলেই আবার সিঁদে হাজির হয়। ওরা এত বেহায়া কেন?

কয়েক লক্ষ বছরের কথা; মানুষ যখন জংলি বনমানুষ ছিল। তখন নখের দরকার ছিল। তার জীবনরক্ষার জন্য নখ খুবই দরকারি ছিল। আসলে এটিই তার অস্ত্র ছিল। দাঁতও

ছিল, কিন্তু নখের পরেই তার জায়গা ছিল। সে সময় তাদের লড়তে হতো, প্রতিদ্বন্দ্বীদের আছাড় মেরে ফেলতে হতো, তার জন্য নখ জরুরি ছিল। পরে সে আস্তে আস্তে নিজের অঙ্গের বাইরের জিনিসের সাহায্য নিতে লাগল। পাথরের ঢিল আর গাছের ডাল কাজে আসতে লাগল, (রামচন্দ্রের বানরসেনার কাছে এই অস্ত্র ছিল)। হাড়ের অস্ত্রও তৈরি করল। হাড়ের অস্ত্রের মধ্যে দধীচি মুনির হাড় দিয়ে তৈরি দেবরাজের বজ্র সবচেয়ে মজবুত আর ঐতিহাসিক ছিল। মানুষ আরও উন্নতি করল। তারা ধাতুর অস্ত্র তৈরি করল। যাদের কাছে লোহার অস্ত্রশস্ত্র ছিল তারা বিজয়ী হলো। দেবতাদের রাজারা এইজন্যেই মানুষের রাজার সাহায্য নিত যে মানুষের রাজার কাছে লোহার অস্ত্র ছিল। অসুরদের কাছে অনেক বিদ্যা ছিল, কিন্তু লোহার অস্ত্র ছিল না, সম্ভবতঃ ঘোড়াও ছিল না। আর্যদের কাছে এ দুটিই ছিল। আর্যরা বিজয়ী হলো। তারপর নিজের গতিতে ইতিহাস এগিয়ে গেল। নাগ হারল, সুপর্ণ হারল, যক্ষ হারল, গন্ধর্ব হারল, অসুর হারল, রাক্ষস হারল। লোহার অস্ত্র বাজিমাৎ করল। ইতিহাস এগিয়ে গেল। সবাই জানে পলতের বন্দুক কার্তুজ তোপ বোম, বোমারু বিমান ইতিহাসকে জঞ্জাল ভরা কোন ঘাট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। নখধর মানুষ এখন অ্যাটমবোমের ওপর ভরসা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তার নখ এখনও বেড়ে চলেছে। এখনও প্রকৃতি মানুষকে তার ভেতরের অস্ত্রে বঞ্চিত করছে না; এখনও সে মনে করিয়ে দিচ্ছে তোমার নখ ভোলানো যেতে পারে না। পশুদের সঙ্গে একই মাটিতে বিচরণ করা মানুষ তুমি লক্ষ লক্ষ বছর আগের সেই নখদন্তাবলম্বী জীব।

অতঃ কিম্। আমি হয়রান হয়ে ভাবি যে মানুষ আজ নখ না কাটার জন্যে নিজের সন্তানকে বকে। কোনও দিন—লক্ষ বছর আগে হয়তো নখ নষ্ট করার জন্যে সে তার বাচ্চাকে বকত। কিন্তু প্রকৃতি এখনও নখ বাঁচিয়ে রেখেছে আর মানুষ এখন তাকে কেটেই চলেছে। এ অভাগারা রোজ বাড়ে, কারণ তারা অন্ধ, তারা জানে না যে মানুষ এর থেকে কয়েক কোটি গুণ অস্ত্র পেয়ে গেছে। আমার মনে হয়, মানুষ আজ আর নখ চায় না। তার ভিতরে বর্বর যুগের কোনও অবশিষ্ট থাকুক, এটা তার কাছে অসহ্য। কিন্তু তাই বা কি করে বলি? নখ কাটলে কি হয়? মানুষের বর্বরতা কোথায় কমেছে? তা তো বেড়েই চলেছে। মানুষের ইতিহাসে হিরোশিমা হত্যাকাণ্ড থোড়াই বারবার হয়েছে? এতো তাদের নবীনতম রূপ। মানুষের নখের দিকে তাকালে কখনও কখনও নিরাশ হয়ে যাই। এরা তার ভয়ঙ্কর পাশবিক প্রবৃত্তির জীবন্ত প্রতীক। মানুষের পশুত্ব যত যারাই কাটো, সে মরতে জানে না।

মানুষ কয়েক হাজার বছর আগে সুকুমার বিনোদের জন্য নখের ব্যবহার শুরু করেছিল। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' থেকে জানা যায় যে আজ থেকে দুহাজার বছর আগে ভারতবাসী নখকে দারুণভাবে সাজাত। নখ কাটার কায়দাও মনোরঞ্জক ছিল। ত্রিকোণ বর্তুলাকার চন্দ্রাকার দন্তুল—নানা আকৃতির নখ না জানি সেদিনের বিলাসী নাগরিকদের কোন কাজে আসত? সেগুলি মোম ও আলতা দিয়ে সযত্নে রগড়ে লাল আর মসৃণ করা হতো। গৌড়ের লোকেরা বড় বড় নখ ও দাক্ষিণাত্যের লোকেরা ছোট ছোট নখ পছন্দ করত। নিজের নিজের রুচি, দেশ ও কালেরও তাই। কিন্তু, কিন্তু সমস্ত অধোগামী বৃত্তিকে আরও নিচে নামানোর জিনিসকে ভারতবাসীরা মনুষ্যোচিত করেছে। চাইলেও এ কথা ভুলতে পারি না।

শারীরবিজ্ঞানীদের নিশ্চিত মত হল, মানবচিত্তের মতো মানবশরীরেও অনেকদিন পর্যন্ত তার দরকার ছিল। অতএব শরীরও নিজের ভিতর এমন গুণ সৃষ্টি করল যে সেই বৃত্তিগুলো অনায়সেই, ও শরীরের অজ্ঞাতেই, নিজে নিজেই কাজ করে। নখ বেড়ে যাওয়া প্রথম, চুল বেড়ে যাওয়া দ্বিতীয়, আবার দাঁত ওঠা তৃতীয়, ও পলক পড়া হলো চতুর্থ। আসলে অপরিচিতের স্মৃতিকেই সহজাত বৃত্তি বলা হয়। আমাদের ভাষায় এর উদাহরণ আছে। যদি মানুষ নিজের শরীর মন ও বাক্-এর অনায়স ঘটে যাওয়া বৃত্তির বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে, তাহলে তার বাস্তবিক প্রবৃত্তি চিনতে খুব সাহায্য হয়। কিন্তু কে চিন্তা করবে? ভাবা তো দূর, সে ভাবে না যে তার ভিতরে নখ বাড়ার যে সহজাত বৃত্তি আছে তা পশুত্বের প্রমাণ। সেগুলি কাটার যে প্রবৃত্তি, সে তো তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন আর যদিও পশুত্বের চিহ্ন তার ভেতরে থেকে গেছে, কিন্তু সে পশুত্ব ছেড়ে দিয়েছে। পশু হয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। তাকে অন্য কোনও রাস্তা খুঁজতে হবে। অস্ত্র বাড়ানোর প্রবৃত্তি মনুষ্যত্ব বিরোধী।

আমার মন প্রশ্ন করে—কোনও দিকে? মানুষ কোন দিকে এগোচ্ছে? পশুত্ব না মনুষ্যত্বের দিকে? অস্ত্র বাড়াবার না কমাবার দিকে? আমার অবোধ মেয়ে যেন মানব জাতিকেই প্রশ্ন করছে, জানো নখ কেন বেড়ে যায়? এটা আমাদের পশুত্বের অবশেষ। আমিও জিজ্ঞাসা করি, জানো অস্ত্রশস্ত্র কেন বাড়ছে? এ আমাদের পশুত্বের চিহ্ন। ভারতীয় ভাষায় প্রায়ই ইংরিজি 'ইন্ডিপেন্ডেন্টস্' শব্দের সমার্থক ব্যবহার হয় না। ১৫ অগস্ট যখন ইংরিজি পত্রিকা 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' ঘোষণা করছে, তখন দেশি ভাষার পত্রিকা 'স্বাধীনতা দিবস'-এর কথা বলছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্সের মানে হলো অনধীনতা বা কারও অধীনতার অভাব; কিন্তু স্বাধীনতা শব্দের অর্থ হলো নিজের অধীনে থাকা। ইংরিজিতে বলতে হলে 'সেল্ফডিপেন্ডেন্স' বলতে পারি। কখনও কখনও ভাবি যে, এতদিন ইংরাজের অনুবর্তিতা করার পরেও ভারতবর্ষ 'ইন্ডিপেন্ডেন্স'-কে অধীনতা কেন বলতে পারল না? সে নিজের মুক্তির যত নাম রেখেছে-, স্বতন্ত্রতা স্বরাজ্য স্বাধীনতা—সবগুলিতেই 'স্ব' এর বন্ধন নিশ্চয়ই রেখেছে। এটা কি কাকতালীয় না কি অজ্ঞাতসারে আমাদের ভাষার মধ্যে সমস্ত ঐতিহ্য প্রকট হয়ে চলেছে? আবার শারীরবিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ছে— অজ্ঞাত স্মৃতির নাম সহজাত বৃত্তি। স্বরাজ হওয়ার পর স্বভাবতই আমাদের নেতা ও চিন্তাশীল নাগরিকেরা ভাবতে লাগলেন সত্যিই এদেশকে কি ভাবে সুখি রাখা যায়। এমন নয় যে আমাদের দেশের মানুষ ওই প্রথম এ সব ভাবতে লাগল। আমাদের ইতিহাস অনেক পুরোনো; এ সমস্যা নিয়ে আমাদের শাস্ত্রে নানা ভাবে ও নানা দিকে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। আমরা নবস্বাক্ষর নই যে এক রাত্রেই অপরিচিত জঙ্গলে আমাদের নিয়ে গিয়ে অরক্ষিত ফেলে রাখা হবে। আমাদের ঐতিহ্য মহিমাময়, উত্তরাধিকার বিপুল ও সংস্কার উজ্জ্বল। আমদের অজ্ঞাতেই এই সমস্ত বিষয় এক বিশেষ দিকে ভাবার জন্য প্রেরণা দেয়। এটা ঠিক যে পরিস্থিতি বদলে গেছে। উপকরণ নতুন হয়েছে আর ঝঞ্ঝাটও বেড়েছে, কিন্তু মূল সমস্যা খুব বদলায়নি। ভারতীয় মন যা আগেও 'অধীনতা' না ভেবে 'স্বাধীনতা' ভাবে, তা আমাদের দীর্ঘদিনের সংস্কারের ফল। সে 'স্ব' এর বন্ধন খুব সহজে ছাড়তে পারে না। নিজের ওপর নিজের দ্বারা লাগানো বন্ধন আমাদের সংস্কৃতির বড় বৈশিষ্ট্য। আমি এমন মানি না যে আমাদের যা কিছু পুরোনো, যা কিছু পুরোনোর প্রতি মোহ সব সময় বাঞ্ছনীয় নয়। আমার বাচ্চার কোলে বসে

থাকা 'বাঁদর' মানুষের আদর্শ হতে পারে না। কিন্তু এটাও মানতে পারি না যে নতুনকে খোঁজার নেশায় চুর হয়ে নিজের সর্বস্ব হারিয়ে ফেলব। কালিদাস বলেছিলেন, সব পুরোনো ভাল হয় না, সব নতুনও খারাপ হয় না। ভালমানুষেরা দুটিই যাচাই করে নেয়, যা কল্যাণকারী তাকে গ্রহণ করে; আর মূঢ়রা অন্যের ইশারায় ভুল পথে যায়। তাই পরীক্ষা করে আমাদের পক্ষে কল্যাণকারী কথা ভেবে নিতে হবে; আর যদি আমাদের পূর্বসঞ্চিত ভাণ্ডারে কল্যাণকারী সেই বস্তু পাওয়া যায়, তবে তার থেকে ভাল আর কি হতে পারে?

এদেশে অনেক জাতি এসেছে। লড়াই ঝগড়াও করেছে, আবার ভালবেসে থেকেও গেছে। সভ্যতায় নানা সিঁড়িতে দাঁড়ানো ও নানা দিকে মুখ করে চলা এই জাতিগুলির জন্যে এক সাধারণ ধর্ম খুঁজে বার করা কোনও সহজ কথা নয়। ভারতের ঋষিরা বিভিন্ন ভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। একটি কথা তাঁরা লক্ষ করেছিলেন। সমস্ত বর্ণ ও জাতির একটি সাধারণ আদর্শও আছে। তা হলো নিজেরই বাঁধনে নিজেকে বাঁধা। কিসে মানুষ পশুর থেকে আলাদা, আহার নিদ্রা ইত্যাতি পশুসুলভ স্বভাব তার সেই রকমই যা অন্য প্রাণীদেরও আছে। কিন্তু তবু পশুর থেকে সে আলাদা। তার মধ্যে সংযম আছে, অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি সমবেদনা আছে, শ্রদ্ধা আছে, তপ্ আছে, ত্যাগ আছে। এগুলি মানুষের নিজের উদ্ভাবিত বন্ধন। এজন্যেই মানুষ ঝগড়াঝাঁটিকে নিজের আদর্শ মনে করে না, রাগে কোনও কিছু করা বিবেকহীনকে সে খারাপ মনে করে। এ কোনও জাতি, বর্ণ বা সমুদায়ের ধর্ম নয়। এ মানুষের ধর্ম। মহাভারতে এজন্যে শত্রুতাহীনতার ভাবকে সত্য ও অক্রোধকে সবার সাধারণ ধর্ম বলা হয়েছে:

এতদ্ধি ত্রিতৃয়ং শ্রেষ্ঠং সর্বভুতেষু ভারত।
নির্বৈরতা মহারাজ সত্যমক্রোধ এব চ।।

অন্যত্র তাতে নিরন্তর দানশীলতাও রাখা হয়েছে। (অনুশাসন পৃ : 120.10)। গৌতম ঠিকই বলেছিলেন, সবার সুখ দুঃখ সহানুভূতির সঙ্গে দেখাই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই আত্মনির্মিত বন্ধনই মানুষকে মানুষ তৈরি করে। এটাই হলো অহিংসা সত্য ও অক্রোমূলক ধর্মের মূল উৎস। আমি আশ্চর্য হই, অজ্ঞাতেও আমাদের ভাষায় এই ভাব কেমন করে রয়ে গেল। কিন্তু নখের বেড়ে যাওয়াও আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। অজ্ঞান সর্বত্র মানুষকে আছড়ে ফেলে দেয়। আর মানুষ সব সময় তার সামনা-সামনি করার জন্যে কোমর বাঁধে।

মানুষ কি করে সুখ পাবে? বড় বড় নেতারা বলেন জিনিস কম, আরও মেশিন বসাও, উৎপাদন আরও বাড়াও, আরও ধন বাড়াও, ও বাইরের উপকরণের শক্তি বাড়াও। এক বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—বাইরে নয়, ভিতরের দিকে দেখ। মন থেকে হিংসা দূর করো, মিথ্যা সরাও, ক্রোধ ও দ্বেষ দূর করো, লোকের জন্যে কষ্ট সহ্য করো, আরামের কথা ভেব না, প্রেমের কথা ভাবো, আত্মতোষণের কথা ভাবো, কাজ করার কথা ভাবো। তিনি বলেছিলেন, প্রেমেই বড়, কারণ তা আমাদের অন্তরে আছে। উচ্ছৃঙ্খলতা পশুর প্রবৃত্তি, 'স্ব'-এর বন্ধন মানুষের স্বভাব। বুড়োর কথা ভাল লাগল কি না জানি না। তাঁকে গুলি করে

মারা হলো; মানুষের নখ বাড়ার প্রবৃত্তিই চেপে বসল। আমি হয়রান হয়ে ভাবি—বুড়ো কত গভীরে গিয়ে মানুষের বাস্তবিক চরিতার্থতার খোঁজ করেছিল।

এমন কোনও দিন আসতে পারে যখন মানুষের নখ বাড়া বন্ধ হয়ে যবে। শারীর-বিজ্ঞানীদের অনুমান যে মানুষের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ লেজের মতই ঝরে পরে যাবে। সেদিন মানুষের পশুত্বও লুপ্ত হবে। সম্ভবত সে মারণাস্ত্র প্রয়োগ করাও বন্ধ করে দেবে। ততক্ষণ ছোট বাচ্চাদের এ কথা জানানো বাঞ্ছনীয় যে নখ-বাড়া মানুষের ভেতরের পশুত্বের চিহ্ন আর তাকে বাড়তে না দেওয়া মানুষের নিজস্ব ইচ্ছা, নিজের আদর্শ। বৃহত্তর জীবনে অস্ত্র-শস্ত্র বাধতে দেওয়া মানুষের পশুত্বের চিহ্ন আর তার বন্যা আটাকানো মনুষ্যত্বের প্রয়োজন। মানুষের মধ্যেকার ঘৃণ্য, যা না শেখালেও অনায়াসেই এসে যায়, তা পশুত্বের দ্যোতক, আর নিজেকে সংযত রাখা, অন্যের মনোভাবের সম্মান করা, মানুষের স্বধর্ম। বাচ্চারা যদি জানে যে অভ্যাস আর তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত জিনিস মানুষের মহিমা সূচিত করে তাহলে ভাল হয়।

সাফল্য আর চরিতার্থতার মধ্যে পার্থক্য আছে। মারণাস্ত্র সঞ্চয়নে বাইরের উপরণের বাহুল্যে মানুষ সেই বস্তু পেতে পারে, যাকে সে ঢাকঢোল পিটিয়ে সাফল্যের নাম দিয়েছে। কিন্তু মানুষের চরিতার্থতা প্রেমে আছে, মৈত্রীতে আছে, ত্যাগে আছে, সবার মঙ্গলের জন্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ায় আছে। নখ-বাড়া মানুষের সেই অন্ধ সহজাত বৃত্তির পরিণাম যা জীবনে তাঁকে সাফল্য এনে দিতে চায়, তা কেটে ফেলা সেই স্ব-নির্দ্ধারিত, আত্মবন্ধনের ফল, যা তাকে চরিতার্থতার দিকে নিয়ে যায়।

নখ বাড়লে বাড়ুক, মানুষ তাকে বাড়তে দেবে না।

আট

যখন বুদ্ধি শূন্য

যখন বুদ্ধি শূন্য আর মন ভরা থাকে, তখন শাস্ত্রচর্চা ভাল লাগে না। আজ আমার অবস্থা সেইরকম। এইমাত্র সেই গাট্টাগোট্টা চেহারার পাঠান যুবককে দেখেছি। হিং বেচতে এসেছিল। বিশাল শরীর, সৌম্য মুখ, নির্ভয় চোখ আর 'কুছ পরোয়া নেই' চেহারা। বলল, 'বাবুজি, ওই উঁচু বাংলোয় কে থাকে?' তার উদ্দেশ্য ছিল 'উত্তরায়ন'। উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করে বসল, 'ওকে তো হিন্দু বলে মনে হয় না, বাবু, মুসলমান নাকি?'

উত্তর দিলাম, 'না'

'খ্রিস্টান'

'না'

'মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়?'

'হ্যাঁ'

'তবে কি হিন্দু?'

'বলতে পারো।'

গুরুদেব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিচ্ছিলাম। পাঠান যুবক আমার উদাসীনতায় সামান্য রুষ্ট হলো। আর বাজে কথা না বলে কাজের কথায় এলো:

'সে হিং তো খায়, বাবু?'

'আমি কি জানি।'

বেশিক্ষণ দাঁড়ানো সে উচিত মনে করল না। সেলাম করে চলে গেল। কিন্তু আমার কানে তার শব্দগুলি এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে—'মুসলমানও নয় খ্রিস্টানও নয়, তবে কি হিন্দু?' এ অভাগা দেশে যে মুসলমানও নয়, খ্রিস্টানও নয়, সে হিন্দু হয়। এই পাঠান যুবক পাণিনি ও যাস্কের বংশজ, কিন্তু যেহেতু সে মুসলমান, সেহেতু সে হিন্দু নয়। এর পূর্বপুরুষেরা বৈদিক সাহিতের অমূল্য অংশ সম্পাদন করেছিল, কিন্তু যেহেতু সে মুসলমান, সেইজন্যে সে নয় এবং সেইহেতু সে কাফের।

পাণিনির সন্তান আজ হিং বিক্রি করছে, কারণ সে হিন্দু নয় আর যে হিন্দু নয় তার জন্যে তার নিজের পূর্বপুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুও ত্যাজ্য। এতো বিচিত্র যুক্তি। আফশোস করি না। হিন্দু বলা হয় এমন জীবদের কথাও কম বিচিত্র নয়, কখনও কখনও এমন বিচিত্র কথাও পৃথিবীর কোনও কোনায় পাওয়া যাবে না। এখানে মানুষকে কুকুর-বিড়ালের চেয়েও খারাপ মনে করা হয়; কারণ তারা হিন্দু। এখানে বিধবাদের ফুসলান হয় আর গর্ভপাতও করানো হয়, কারণ তারা হিন্দু। এখানে বেশ্যাদের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। অথচ সতী-অন্ত্যজ রমণীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, কারণ তারা হিন্দু। এখানে অন্যায়কে ন্যায় বলে চালানো হয়। এই সমাজের ভিতরে এত দুর্বলতা, এত অব্যবস্থা, এত মিথ্যাচার আছে যে এই সমাজ মরতে বাধ্য। হিন্দু মানে, হিন্দু ভাবাভাব! পুরোনো যুগে অপোহবাদী দার্শনিকদের মত ছিল যে কোনও পদার্থকে অভাবের রূপ বলা যেতে পারে অর্থাৎ ঘটের সত্য পরিচয় হলো যা ঘটের অভাবের অভাব। পাঠান যুবক আজ আমার বুদ্ধির অপোহবাদী দার্শনিককে উত্তেজিত করে দিয়েছে। আমি মনে করি হিন্দুদের পরিচয় অভাবের রূপেই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বা কি করে মানা যায়? শাস্ত্র পুরাণ স্মৃতি স্তোত্র ও কর্মকাণ্ডের বিধিনিষেধে ভরা এই পুঁথিগুলিকে কি করে আমরা ভাবশূন্য বলে মেনে নেব?

কিন্তু বুদ্ধি যখন খালি আর মন ভরা থাকে তখন শাস্ত্রচর্চা ভাল লাগে না। না হলে, যে জাতি বক্ষুতট থেকে মহাক্ষোণ পর্যন্ত একচ্ছত্র রাজত্ব করেছিল, যায় মহাসংস্কৃতি, মহাপর্বত ডিঙিয়ে আর মহাসমুদ্র পার করে জয়ধ্বজা উড়িয়েছিল, যার বিজয়-বাহিনী পূর্বাপর সমুদ্রের ভিতরে সিংহনাদ করত, তার সম্পর্কে এত চিন্তিত হওয়ায় কোনও দরকার নেই। এটা ঠিক যে পাণিনি-সন্তান আজ হিং বিক্রি করে আর কুমারজীবের আত্মীয়স্বজন আজ সীমান্তে হিন্দু বউ-মেয়েদের ব্যবসা করে। একথাও অস্বীকার করা যায় না, কালিদাসের বিহারভূমিতে আজ এমন সভ্যতার (বর্বরতা) তাণ্ডব হচ্ছে যে মন ব্যাকুল না হয়ে পারে না, তবুও ভরসা যে এখনও রক্ত বেঁচে আছে। আজ না হলেও কাল সে তার প্রভাব

ছড়াবেই, কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। বলা হয় 'ফলেন পরিচায়তে বৃক্ষঃ'— অর্থাৎ বৃক্ষের পরিচয় ফলে। আজ হিন্দুদের যা দুরবস্থা, তা সেই বহুবিঘোষিত সমৃদ্ধিকালীন সভ্যতার পরিণাম। কি করে বলি যে তা ভাল ছিল, যেহেতু তার পরিণাম খুব খারাপ দেখা যাচ্ছে।

সমৃদ্ধি কাল! সত্যিই সমৃদ্ধির যুগ ছিল। উজ্জয়িনীর সৌধবাতায়ন থেকে উকি মারা চন্দ্রবদনের অলকার্ষিত রক্তাশোক ও শ্রবণদত্ত কর্ণিকা এখনও ভোলা যায়নি, শিপ্রার চটুল-পদ্ম-প্রেক্ষি দৃষ্টির মোহিনী এখনও সদ্যসৃষ্ট স্বপ্নের মতো মদমত্ত, হিমালয়ের কুঞ্জরবিন্দুশোন ভূর্জত্যক এখনও কিন্নরবধূদের অনঙ্গলেখ মনে করিয়ে দেয়। অলকার আলতা-রাঙানো রাস্তা এখনও মনে রং ধরায়। সত্যি তা সমৃদ্ধিকাল ছিল আর সেই সমৃদ্ধ বিলাসের মাঝে-মাঝে কভা ও সিন্ধুতীরে হুনবাহিনীর হুঙ্কার আর আর্যদের অসফল প্রতিরোধ; পঞ্চনদ থেকে সাকেত পর্যন্ত আতঙ্কধ্বস্ত জনপদের বিকাশ কোলাহল ও আবার দুর্ধর্ষ দমনে কৃতসঙ্কল্প বিক্রমাদিত্যের ভীমগর্জন, সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

মগধ এবং অবন্তীর কেন্দ্রীয় শক্তি ও নাগরিক সমৃদ্ধি সত্যিই বেজোড় ছিল। সেই নাগরিক সমৃদ্ধি সত্যিই বেজোড় ছিল। সেই নাগরিকের এক হাতে ছিল তলোয়ার আর অন্য হাতে প্রিয়ার রস আলিঙ্গনে পীড়িত কলাগুরু মঞ্জরির প্রতিচ্ছবি ছিল। তার এক চোখ দিয়ে আগুন, অন্যটি দিয়ে মদিরা কিন্তু তার জনপদ পঙ্গু ছিল। নিরন্তর পৌর ও জনপদের পার্থক্য বেড়ে গেল। একজনের জন্যে কাব্য ও কামসূত্র লেখা হলো, অন্যের জন্য পুরাণ ও স্মৃতি। একটি বিলাসিতার দিকে টেনে নিয়ে গেল, অপরটি শাস্ত্রবাক্যের দিকে। একটি তার আশ্রয়ের বিষয় হলো অন্যটি ঠাট্টা ও অবহেলার। ফাঁক বাড়তে লাগল। হুনেরা লাভ করল, তাতারেরা লাভ করল, মুসলমানেরা লাভ করল, ইংরাজরা লাভ করল আর ফাঁক বাড়তে লাগল, বাড়তেই লাগল। আজ সেই ছিপছিপে পাঠান যুবক সহজেই বলে গেল, যে 'মুসলমানও নয়, খ্রিস্টানও নয়, তাহলে কি হিন্দু?' বার বার আমি ভাবছি। ফাঁক কি আরও বেড়ে যাচ্ছে না? কিন্তু শাস্ত্রের তো তার সঙ্গে কোনও মতলব নেই আর আমার মধ্যেও এত সাহস নেই যে, এই প্রসঙ্গে নতুন করে মাথা ঘামাই। বুদ্ধি যখন খালি আর মন মরা থাকে, তখন এইটুকু ভাবাই কি যথেষ্ট নয়?

নয়

শব-সাধনা

এই কথা কয়েকবার আমার মনে হয়েছে যে প্রাচীন যুগের সাধকরা যে মহান তান্ত্রিক সাধনা করতেন, তার রহস্য কি তারা জানতেন? কিছু লোক হয়তো জানতেন, সবাই হয়তো নয়।

জড়তত্ত্বের সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সংঘাত মানুষের শরীর। যতক্ষণ তাতে জীবাত্মার সংযোগ বর্তমান থাকে, যতক্ষণ তাকে বিশুদ্ধ জড়তত্ত্ব বলা যাচ্ছে না, কিন্তু তার মধ্য থেকে যখন প্রাণ বেরিয়ে যায় তো সঙ্গে সঙ্গেই মন, বুদ্ধি ইত্যাদি তত্ত্বও তার মধ্য থেকে বেরিয়ে যায়, এমনকী প্রাণবায়ুর দশ ভেদের মধ্যে ধনঞ্জয় ছাড়া বাকি নটাই বেরিয়ে যায়। সে সময় শব সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, রাগ-বিরাগ রহিত, ইচ্ছা-দ্বেষ মুক্ত, ধর্ম-অর্ধমের ওপরে উঠে যায়। সে সাক্ষাৎ আনন্দ-ভৈরবের প্রতীক হয়। সাধক যখন শিবানন্দ ও পরামানন্দের অবস্থায় যায়, তখন সে এইরকমই ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ-বিরাগ, ধর্ম-অর্ধমের ওপরে অনুভবৈকগম্য অবস্থায় থাকে। সেই সাধক এবং এই শবের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু যে শক্তিতে বিশ্বাস করে সে জানে যে উচিত সংঘাতই নতুন নতুন শক্তির জন্মদাতা। শবে সেই সংঘাত প্রায় পুরো থাকে, এজন্যে শাক্তসাধক শবকে সাধনার ভাল সাধন মনে করে। এই শবের পরিপূর্ণ জড় সংঘাত হওয়া প্রয়োজন, রোগ-ভোগ, বিষ খেয়ে ও মানসিক সন্তাপে কষ্ট পেয়ে যে প্রাণ হারিয়েছে, তার শব গ্রহণীয় হয় না। যুদ্ধ করতে করতে যে মারা গেছে, আনন্দের সঙ্গে যে নিজের বলিদান করে, জীবদ্দশায় যার শরীরে ভাঁজ পর্যন্ত পড়েনি, তাঁরই শবসাধনার জন্য গ্রহণীয় মনে করা হয়। এই শব নিষ্ক্রিয় শবের ভাল প্রতীক, সাধক চণ্ডিকার সঞ্চার করে তাকে সক্রিয় করে। শুরুতে সে শবের স্তুতি করে:

বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর।
আনন্দ ভৈরবাকার দেবীপঙ্কঃ শঙ্কর
বীর্য্যোহং তবাং প্রপদ্যম উত্তস্ট চণ্ডিকার্চনে।

আমাকে একজন তন্ত্রসাধক বলেছেন, শবের মুখ নিচু করা হয় আর সাধক তার পিঠে বসে নানা মন্ত্র জপ করে। সিদ্ধিলাভের আগে নানান বাধা আসে। যে সাধক ভয় পেয়ে যায়, সে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু যে অবিচল থাকে, শেষে সেই জয়ী হয়, তখন তার মুখ ঘুরে গিয়ে সাধকের দিকে হয়ে যায় আর সাধকের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলা শুরু করে, সেই শবের মুখ দিয়ে চণ্ডিকা বর দেয়। কিন্তু তান্ত্রিক গ্রন্থে বলা হয়েছে, শব একই ভাবে পড়ে থাকে, আকাশে দেবতারা নানান ভাবে প্রলোভন দেখাতে থাকে। সাধক অবিচলিত থেকে তাঁদের প্রতিজ্ঞাপাশে বেঁধে ফেলে তারপরেই সিদ্ধি পায়। মনে রাখা উচিত যে সাধক জড় সংঘাতের সবচেয়ে ভাল মূর্তরূপ ওই শবের গঠন ঠিকমত জানে, সেই সিদ্ধি পায়। শব

জীবিত হয় না, কিন্তু তন্ত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে খুশি হয়ে শব যা কিছু দিতে কারে তা কোনও জীবিত লোক দিতে পারে না, কারণ শব সাক্ষাৎ নিষ্ক্রিয় শিবের স্বরূপ। সে ইচ্ছা-দ্বেষের উপর পরমানন্দ স্বরূপ হয়। সে সেই শঙ্করের (নিষ্ক্রিয়) প্রতীক যে দেবতাদের বিকরাল তাণ্ডবের পাদপীঠ।

যখন আমি আমার দেশের আচার-বিচার ও ক্রিয়াকলাপ অধ্যয়নকারীদের দেখি তখন এই তান্ত্রিক শবসাধনার কথা আমার মনে পড়ে। শবসাধক শবকেই নিজের লক্ষ্য মনে করে না কিন্তু, তবুও তার মনে শবের প্রতি কত শ্রদ্ধা থাকে। মৃত যুগে বসে যে পণ্ডিত আজ জ্ঞান সাধনা করছে, তারাও মরে যাওয়া সেই যুগকে সময়কে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সেই যুগ আমাদের শাস্তি দিতে পারে না, সে যুগের উদার রাজা কোনও পণ্ডিতকে অক্ষরপ্রতি লক্ষ লক্ষ টাকা দান দিতে পারে না, সে যুগের কোনও সুন্দরী নিজের অঙ্গরাগের বর্ণ দিয়ে শৃঙ্গারদানে পড়ে থাকা রং দিয়ে নিজের আঁচলে আমাদের যশগাথা লেখে না, সেই যুগের কোনও হুন আমদের নগর আর শষ্যখেতে আগুন লাগিয়ে ঝলসে দেয় না, বস্তুত সেই যুগের ঈর্ষা-দ্বেষ, রাগ-বিরাগ, ধর্ম-অধর্ম আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। তবুও সেই যুগ আনন্দের অদ্ভুত লোকে আমাদের পৌঁছে দেয়, আমাদের শিরায় শিরায় অপূর্ব এক ভাবসৌন্দর্য জাগিয়ে তোলে। সেই যুগে কোনও ক্রিয়া নেই। বড় বড় বিশাল মন্দির বিজয়স্তম্ভ রাজপ্রাসাদ আর দূর্গাপ্রকার এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন হাসতে হাসে বজ্র তাকে আঘাত করেছে, যেন সম্মুখ-যুদ্ধে কেউ তাকে কেটে ফেলেছে। শবসাধনার এত বড় সাধন কোথায় পাওয়া যাবে?

কিন্তু আমাদের প্রাচীন জ্ঞানের লক্ষ্য কী সাধকদের জানা আছে? প্রাচীন যুগ মরে গেছে, সে বেঁচে উঠতে পারে না, তবুও তার প্রজ্ঞা ছাড়া আমরা সিদ্ধি পেতে পারি না। তাকে আমরা যত বুঝব ততই পরিষ্কার হয়ে যাবে, এই নিষ্ক্রিয় শিব আনন্দ ভৈরবাকার, পরমানন্দ স্বরূপ হয়ে, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমরা যে আনন্দ পাই তা ইচ্ছা-দ্বেষের উর্দ্ধে, রাগ-বিরাগ থেকে মুক্ত। সেই পুরো যুগটাই সাধন বস্তু। এযুগের লক্ষ্য যদি সেই যুগই হয়, তাহলে সাধনা অসম্পূর্ণ। পুরোনো যুগের মৃত শবে বসা জ্ঞানী সাধক আকাশ থেকে সিদ্ধি পাবে। শাস্ত্রজ্ঞানের লক্ষ্য শাস্ত্রজ্ঞান নয়। এই প্রাচীন যুগের আচার-বিচার অধ্যয়নের লক্ষ্য সেই আচার-বিচার নয়, লক্ষ্য হলো ভবিষ্যত যুগ। আমাদের সমস্ত পুরোনো তত্ত্বজ্ঞান যদি ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক না হয় তবে তো তা বেকার। শবদেহে শক্তি সঞ্চার হলেই সিদ্ধি পাওয়া যায়। যে কোনও ভাবে শবদেহ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা উচিত। এই রকমই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র রীতি ক্রিয়া ও আচার অধ্যয়নের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ থাকা উচিত। যদি কোনও পণ্ডিত মনে করে যে পুরোনো যুগ বেঁচে উঠবে, পুরোনো আচার আবার প্রচলিত হয়ে উঠবে, পুরোনো গৌরব আবার জেগে উঠবে, তাহলে সে সাধনার রহস্য বুঝতে পারেনি। এ যুগের কোটি কোটি মানুষের পরমুখাপেক্ষিতা, দারিদ্র, অজ্ঞান ও শোষণ থেকে মুক্ত করাই এই সবের লক্ষ্য। এটা কি সম্ভব?

শবের পিঠের ওপর বসে মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে যতই সাধনা করা হোক, যতক্ষণ তার মুখ সাধকের দিকে না ঘুরছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে সাধক সিদ্ধির কাছাকাছি আসেনি, শব তখনও শব, তাতে শক্তির সঞ্চার হয়নি। শবসাধনা তখনই শেষ হয় যখন যে তার মুখ

সাধকের দিকে ঘুরিয়ে জীবিত মানুষের মতো কথা বলে। প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধকদের কথা জানি, যাঁরা নিজের গম্ভীর অধ্যবসয়ে প্রাচীন যুগের মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিতে পেরেছে। তুলসীদাস এমনই সাধক ছিলেন। তিনি যা কিচু পড়াশুনা করেছেন, নিঃশেষে ভবিষ্যৎ নির্মাণে সেগুলি কাজে লাগিয়েছেন। জ্ঞান যদি মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে তা কেবল বোঝা হয়। তা কেবল বাহ্যাচার হয়, মৃত হয়। জ্ঞানের ফল মুক্তি। প্রাচীন জ্ঞান উপাসকদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই এই রহস্য বুঝতে পারেন। কার হাত থেকে মুক্তি? জড়তা থেকে, অজ্ঞান থেকে, পরমুখাপেক্ষিতা থেকে, দম্ভ থেকে, অহংকার থেকে দাসত্ব থেকে। যেটাই জ্ঞানের লক্ষ্য।

আমাদের এই দেশ নবসাক্ষর নয়। তার জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশাল ইতিহাস আছে। তার গুহা আর ধ্বংসাবশেষে প্রেরণার সমুদ্র বইছে। এতো আমাদের পরম সৌভাগ্য যে জড় তত্ত্বের এত পরিপূর্ণ সংঘাত আমাদের সাধনার জন্যে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। অন্য কোনও দেশে এত পরিপূর্ণ সাধন-সামগ্রী হয়তো পাওয়া যেতে পারে। যদি নিষ্ঠা আর ভালবাসার সঙ্গে এ সমস্ত সামগ্রীর ব্যবহার ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য করি, তাহলে কল্যাণ হবে। খালি এই সামগ্রী আমাদের উদ্দেশ্য মনে করলে ভুল হবে। কেবল এর জ্ঞানেই সিদ্ধি পাওয়া যাবে না, যদিও এদের সূক্ষ্ম এবং ঠিকঠাক জ্ঞান পরম প্রয়োজন। প্রাচীনত্বের অধ্যয়ন হলো উত্তম শবসাধনা। প্রতি পদে সাবধান হওয়া দরকার, প্রতিক্ষণ নিজ উদ্দেশ্য মনে রাখা দরকার আর সদাসর্বদা কঠোর সংযম ও অপার সাহস থাকাও দরকার।

দশ

ঠাকুরের জন্যে বৈঠক

এই গ্রামে একশো ঘর হিন্দু আর পনেরো ঘর মুসলমান আছে। হিন্দুরাই ধনী-মানী আর মুসলমানদের গরিব বলা যেতে পারে। তবুও গ্রামের মন্দির ও মসজিদে অনেক পার্থক্য আছে। মসজিদ ঝলমল করে আর মন্দিরে ভূত ঘুরে বেড়ায়। আমি মসজিদকে খোদার একমাত্র ঘর মনে করি না আর ঠাকুরবাড়িকেও ঠাকুরের একমাত্র মন্দির ভাবি না। এবার তিন বছর পর বাড়ি ফিরে জানতে পারলাম, একবছর ধরে একজন সাধু ঠাকুরের পূজো করছে, কিন্তু দুবেলা তার অন্ন জোটে না। একদিন আমার এক গ্র্যাজুয়েট বন্ধু যখন সাধুকে নিয়ে আমার কাছে এলো আর ঠাকুরবাড়ির দুরবস্থার কথা বলল, তখন আমি তার প্রস্তাবিত সভায়, যেখানে ঠাকুরের পূজা অর্চনা ব্যবস্থার আলোচনা হওয়ার কথা, সেখানে উপস্থিত

হয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। স্থানীয় ভাষায় প্রস্তাবিত সভার নাম 'ঠাকুরের জোগাড়' রাখা হলো।

তিনবার ঘন্টা বাজিয়ে বিজ্ঞাপন করে ও ব্যক্তিগতভাবে অনেক ভদ্রলোককে অনুরোধ করার পরেও যখন সভায় কয়েকটি বাচ্চা ছাড়া আর কেউ এলো না, তখন রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। ঠাকুরের প্রতি এত উদাসীন কেন? হিন্দুদের মধ্যে ধর্মভাবনা লোপ পেয়েছে নাকি? আমি কল্পনার চোখে দেখলাম, দেবতার মন্দিরের সামনে বসে আছি, তিন হাজার বছর ধরে তার ছত্রচ্ছায়া কোটি কোটি মানুষকে শান্তি দিয়ে আসছে। সিন্ধু উপত্যকার কোনও অর্ধ-দেবত্ব পাওয়া অনার্য বীর বা উত্তর—প্রাপ্তের উপাস্য কোনও শিশু দেবতা যুগ প্রতিষ্ঠিত ভাগবৎ ধর্মে পরমদেবতার স্থান পেয়েছে। তখন থেকেই হাজার হাজার বর্বর অনার্য জাতি তার পবিত্র নামে হতদর্প হয়ে সেরকম ভাবে জীবন কাটাতে লাগল। ঠিক যেমন মন্ত্রৌষধি প্রয়োগের পর উপগত জ্বর মহাসর্প কাটায়। আমি যেন পরিষ্কার দেখলাম ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ধার দিয়ে পিঁপড়ের মত সেনা ঢুকছে, লুটপাট কাড়াকাড়ি কিছুই তার কাছে অসম্ভব নয়। কোনও সৈন্যদলের হাতে তীক্ষ্ণ ফলার বর্শা, কারও কাছে ক্ষুরধার তরোয়াল। দেখতে দেখতে সমৃদ্ধ নগর পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হচ্ছে, মায়ের কোল থেকে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে আছড়ে ফেলা হচ্ছে, গরুর পালের মতো তরুণীদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—পুরো উত্তর ভারত নিমেষে শ্মশান হয়ে গেল। আবার দেখলাম এখানেই এই জাতিরা বসবাস শুরু করল আর পঞ্চাশ বছর পরে নিজের মুদ্রায় নিজেকে পরম ভাগবত বলায় গর্ব অনুভব করছে। এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন; সত্যিই সেই দেবতার সামর্থ্যের আন্দাজ করা মুশকিল, যে দু একটা নয় অসংখ্য আর্যেতর বর্বর জাতিকে আচারনিষ্ঠা শান্ত ভক্ত তৈরি করল। মনে মনে ভাগবতের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে সেই মহাতীর্থ দেবতাকে প্রণাম করলাম:

কিরাত হুনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা
আভীর কংকাঃ ফলাঃ খমাদয়ঃ
যেন্যৌপি পাপস্তদপাশ্রয়াশ্রয়াত
শুদ্ধান্তি তস্মৈ প্রভাবিষ্ণবে নমঃ।

ভাবতেই থাকলাম—আজ বৌদ্ধ সংস্কৃতির পূর্ণ জ্ঞানের জন্যে আমরা তিব্বত চীন জাপান শ্যাম দেশের দিকে তাকিয়ে থাকি; এমনও একদিন ছিল যখন পশ্চিম প্রান্তে গান্ধার, পারস্য শকস্থানে এই মহাবীর্য দেবতার নাম ও মহিমার কীর্তন হত। ভাবাবেশে মানুষ বিগলিত নেত্রে মহাবিষ্ণুকে মনে করত। আজ সেদিন চলে গেছে। পশ্চিমে একস্বত সম্বুদ্ধ ধর্মচিন্তার অবতার হলো যার হাতে দৃঢ়মুষ্টি কঠিন তরোয়াল ছিল আর অন্যটায় সাম্যের আশ্বাসের অমৃত বরদান ছিল। তার প্রাণদেবতা অন্তর্মুখ ছিল কিন্তু নিজের পরিধিতে সে অক্লান্তভাবে ঘুরছিল। যে কারও সঙ্গে সমঝোতা করেনি; কাউকে বন্ধু মনে করেনি, যে সামনে এসেছে তাকেই যুদ্ধে আহ্বান করেছে, যেদিকে সে ঘোরে কালচক্রও সেদিকে ঘুরে যায়। সে ছিল ইসলাম। এই ইসলামই পশ্চিমে মহাবীর্য দেবতাকে তুলে ফেলে দিল। বিজয়

গর্বে বুক ফুলিয়ে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে লাগল, যারা আত্মসমর্পণ করল তার রঙে রাঙালো। আরব থেকে গান্ধার পর্যন্ত একটিই জয়ধ্বজা বারবার প্রকম্পিত হয়ে পৃথিবীর বুক কাঁপাতে লাগল। আজ সেই কুচলে যাওয়া সংস্কৃতির জন্যে এই দেশগুলোর দিকে তাকাবার কোনও প্রয়োজন মনে করি না।

হ্যাঁ, যে মন্দিরের সামনে বসি আমি আর উপাসকের প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছি, সেটি সেই মহাবীর্য অথচ পরাজিত দেবতার প্রতীক। তার উপাসককে বহুবার কিলানো হয়েছে, লোটা হয়েছে, খামচানো হয়েছে আর জ্বালাতন করা হয়েছে। তারা ক্লান্ত হওয়া নিবীর্য নিস্পেষিত উপাসক। উপাসকের তেজেই উপাস্য তেজস্বী হয়। দেবতার এই প্রতীকও তেজহীন বীর্যহীন আর নিষ্প্রাণ।

এমন সময় দেখলাম, আমাদের আশালতাকে দোলাতে দোলাতে তিন হিন্দু বৃদ্ধ সভায় উপস্থিত হলো। তারা পাগড়ি নামিয়ে অনাড়ম্বরভাবে ঠাকুর প্রণাম করল। মনে মনেই ভাবলাম, আজও কোটি কোটি হিন্দু গভীর বিশ্বাসে এইরকম অনাড়ম্বরেই ঠাকুর প্রণাম করে শান্তি পায়। কে বলে মহাবীর্য দেবতা তেজহত হয়ে গেছে। বিজয়স্ফীত ইসলাম তাকে শেষ করতে পারে না । আজ গান্ধার মুসলমান হয়ে গেছে। সে ইসলামের অমৃত বরদান পেয়েছে, তাতে কি হলো? ইসলাম আসার আগে বিদ্যা ও জ্ঞানের মহাপীঠ গান্ধার আজ মুসলমান হয়ে বদলে গেছে। পাণিনি আর যাস্কের সন্তান আজ ভারতে হিং বিক্রি করে বেড়ায়। ইসলামের সব থেকে বড় হার আর কি হতে পারে? বৈদিক ঋচার রচয়িতা ঋষি সন্তানদের এর থেকে বেশি পতন আর কি হতে পারে? আমার যেন মনে হচ্ছে, পাণিনি ও যাস্ক, চরক ও সুশ্রুত, পতঞ্জলি ও ব্যাস ভীষণ উদাসীন ভাবে স্বর্গে বসে আছে। ভুঁরু কিছুটা কুঁচকে গেছে; বিশাল কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখ ছলছল করছে, হায়, ইসলাম তুমি কবে দেখতে পাবে?

মনে হলো, ইসলাম আমার কথা শুনতে পেয়েছে। তার হাত তরোয়ালের মাথায়, মুর্তি অত্যন্ত উগ্র অথচ নিষ্ঠুর নয়। সেই মূর্তিতে আমি বীরত্বের তেজ দেখলাম, অনেকক্ষণ তার দিকে তাকানো যায় না। শান্ত গম্ভীর স্বরে ইসলাম বলল—'তুমি ঠিকই বলছ, কিন্তু তোমার অভিযোগের কোনও পরোয়া করি না। আমি সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য আসিনি, কিছু ভাঙতে এসেছি। হাজার হাজার দাস তৈরি করে, লাখো মানুষকে দলিত ও অস্পৃশ্য করে রেখে যে সংস্কৃতির জন্ম হয় সেখানে অধর্মের প্রাবল্য হয়। আমি তা পরিষ্কার করতে এসেছি। এই অসমান ব্যবস্থার সঙ্গে আমার সমঝোতা হতে পারে না। কাঁচা-পাকা রঙের যে হাজার হাজার খাপছাড়া পটকে তুমি শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন মনে করো, তাকে আমি বিচ্ছিরি দাগের হাস্যাস্পদ নিদর্শন মনে করি, পৃথিবীকে আমি একটা পাকা রঙে রাঙা দেখতে চাই, হোক না সে রং নীল। আজ ইসলামের পতাকায় পৃথিবী কাঁপছে, কেননা তাতে ভীরুতা আছে, ভেদভাব আছে, ভুল ভ্রান্তি আছে। সমঝোতা করা তো ভীরুর কাজ, ইসলাম ভীতু নয়, সে মরতেও জানে আর মারতেও জানে। সংস্কৃতি বিনাশের ভয়ে পদে পদে সন্ত্রস্ত বুদ্ধিমান নামধারীরা কাপুরুষ।

কিছুটা বিস্ময় আর আশঙ্কা নিয়ে জবাব দিলাম—'এক রঙে পৃথিবীকে রাঙানোর চেষ্টা কি বৈচিত্র্যে ভরা মানবতার বিকাশে বাধা পৌঁছনো নয়? চামেলিকে গোলাপ করার

চেষ্টা বা চামেলি আর গোলাপ দুটিকেই কিছু বিচিত্র এক রঙের ফুল তৈরি করার চেষ্টা কি ভাল? সেটা তো নিজেই এক ভয়ংকর অধর্ম।' গর্জে উঠে ইসলাম জবাব দিল, 'শক্তিহীনেরা এরকম কথা বলে থাকে, নিবীর্যেরা এরকম কথা শুনে থাকে। আমার কথার বাস্তব অর্থ গ্রহণের শক্তি তোমার মধ্যে নেই। ধৈর্য ধরে বোঝার সাহসও নেই। উপমা আর রূপকের সাহায্যে প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করা, পৃথিবীর বুদ্ধিমান বলে কথিত লোকেদের ব্যবসা। তুমি আমার সোজা কথার বিকৃত অর্থ করছ। আমি কখনও বলছি না যে চামেলি আর গোলাপ এক করা হোক। আমি বলি চামেলি ও গোলাপ বা আম ও ধুতরো, সবারই একই খোলা আকাশ, এক সমান সার ও জনের সুবিধা, সমান যত্ন আর উপাচার পাওয়া উচিত। ইসলামের উগ্র মূর্তিতে মৃদু হাসি দেখা গেল, সে অবহেলা করে বড় সংস্কৃতিকে ধাক্কা করতে চাইছে। আমি আবার বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে প্রশ্ন করলাম—'এমন গাছও তো হতে পারে যে গোলাপ আর চামেলির অনুকূল সার পেয়েও শুকিয়ে যাবে? কিছু গাছ জল পেয়ে বাড়ে, কিছু আবার মরেও যায়। তাদের কি হবে?' চেঁচিয়ে উঠে ইসলাম বলল—'মরে গেলে মরে যেতে দাও; আমার পরোয়া নেই। যা তিনলোকের থেকে আলাদা, তাদের না থাকাই ভাল। তারা থাকলে বাকি পৃথিবী কষ্ট পাবে। দেখ, বেশি তর্ক কোরো না। এতো শক্তিহীনের লক্ষণ। এই বজ্রমুষ্টি মহা কৃপাণ দেখো। ইসলাম এর উপরেও পূর্ণ বিশ্বাস করে। এই ভগবানের বরদান, মানবতার রক্ষক, ইসলাম নিজের কৃপাণে কখনও সন্দেহ করে না।' এই বলে এক আজব মত্ততায় হাসতে হাসতে ইসলাম ওপরের দিকে উঠে গেল, যেন সে জগতের সমস্ত জড়তা, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত জঞ্জাল ধ্বংস করার মহাব্রতে নিজের সামনে অন্য কাউকে কিছুই মনে করতে চায় না। যেন তার সাফল্য নিশ্চিত, যেন সে এক অদ্বিতীয় কর্মঠ যোদ্ধা

সংস্কৃতি কি? কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। একবার মনে পড়ল বৈদিক যুগের কর্মকাণ্ডে ভরা ঋত্বিকের দল, যারা প্রত্যেক কুশ ও পল্লবের জায়গায়, পাত্র ও বিধানের আলোচনায় গম্ভীরভাবে সতর্ক ছিল। আবার উপনিষদ যুগের ঋষিরা মনে পড়ল, যারা গাম্ভীর্যের সঙ্গে মৌন হয়ে চিন্তা করছিল যে কি হবে সেই বস্তু, যা পেয়ে আমরা অমৃত পেতে পারি না। তারপর কাষাধারী বৌদ্ধভিক্ষুরা মনে পড়ল, যারা 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'-এর জন্যে বাড়িঘর ছেড়ে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা আর ভীমকায় মহাসাগর পার হচ্ছিল, আর শেষে, উজ্জয়িনীর সৌধ গবাক্ষ দিয়ে লীলা-কটাক্ষ নিক্ষেপকারী পুরবিলাসিনীরা মনে পড়ল। দেখতে দেখতে আমার কল্পনা মধ্যযুগের আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দু সংস্কৃতিকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিল নিরাভূষণা সংকুচিত অবমানিত বিক্ষুব্ধ। তার মধ্যে কর্মকাণ্ডযুগের সজীবতা ছিল না, উপনিষদযুগের স্বাধীন চিন্তাও ছিল না, বৌদ্ধ যুগের দুর্বার করুণা-ভাবনাও ছিল না, কাব্য-কালের সুধাময় বিলাস-সজ্জাও ছিল না। ইসলামের আক্রমণে তার তেজ ম্লান পড়েছিল, দর্পহত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হার মানতে রাজি ছিল না। কুচলানো বন্য গাছের মতো ম্লান হয়েও সজীব ছিল, আবার উঠে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট ছিল, নিরুপায় হয়ে যেদিকে সুবিধা পেত আশ্রয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত। এই সময়েই দক্ষিণ আকাশ দিয়ে কয়েকটা তেজপুঞ্জ জ্বলন্ত জ্যোতি প্রচণ্ড বেগে উত্তর দিকে দৌড়তে দেখা গেল। দিক তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, আকাশ ধূলোয় ভরা ছিল, পৃথিবী রক্তে ভিজে ছিল। দক্ষিণ আকাশ থেকে

এই জ্যোতিগুলি কোনও বাধা মানল না, কারও পরোয়া করল না, তারা এগিয়েই গেল, হঠাৎ স্পষ্ট হলো যে পায়ে দলে যাওয়া সংস্কৃতিলতা একটা আশ্রয় পেয়েছে। সেই আশ্রয় হলো বৈষ্ণব ধর্ম—ভক্তি মতবাদ। লতাকে কেবল আশ্রয় দিল না; রসের অবিশ্রান্ত বর্ষণে তাতে প্রাণের জোয়ার এনে দিল; পত্র ও পুষ্পের নতুন সমৃদ্ধি দেখে লোকের চোখ সার্থক হলো। আমি যে দেবতার মন্দিরের সামনে-বসে আছি, সে সেই আশ্চর্যজনক ভক্তি মতবাদের উপাশ্রয়। কে বলে এ পরাজিত দেবতার প্রতীক? আশ্রয়ের ধনভাণ্ডার, সত্য ইন্দ্রজাল ও অচিন্তনীয় যাদুকাঠি।

আমি স্পষ্ট দেখলাম, মুর্শিদাবাদের রাস্তায় মুসলমান বংশোদ্ভূত হরিদাস ভাবাবেগে হরিনাম সংকীর্তন করছে আর জল্লাদ তাকে অবিরাম লাঠি পেটা করছে, তার চেহারায় কোনও ভাজ পড়ছে না, শান্ত আর মোহক তেজ বেড়েই চলেছে, আমি স্তব্ধ আর নির্বাক। আমি দেখলাম: মেবার রাজবংশের শোভা ও গর্ব মীরাবাঈ অশ্রু বিগলিত নয়নে কম্পিত কণ্ঠস্বর ও দুর্বল শরীরে গোপাললালের বিরহে নাচছে, রাজপরিচারক বিষের পেয়ালা দিয়েছে, সে আশ্চর্য বেপরোয়াভাবে পান করছে—আমি রুদ্ধশ্বাস, হতচেষ্ট। আমি আরও দেখলাম বান্দাবীর দিল্লি শহরে বন্দি হয়ে বসে আছে, প্রাণের চেয়েও প্রিয় সাতশো সঙ্গী চোখের সামনে দেখতে-দেখতে তরোয়ালের কোপে শেষ। জল্লাদ বান্দার কোলে তার কেমল শিশুকে ফেলে দিয়ে আদেশ করল, 'নিজের হাতে একে মেরে ফেল।' বান্দা কৃপাণ ওঠালো। পিতাপুত্র একসঙ্গে বলে উঠল; 'বাহে গুরুজি!' আর কৃপাণ সেই কোমল কলেবর কলাগাছের মতো বিদীর্ণ করল—আমি বিচলিত; অশ্রু-অন্ধ, বিক্ষুব্ধ! এত শক্তি কোথা থেকে এলো? ঠাকুর তুমি ধন্য!

আমার সামনে হঠাৎ আলোর এক মহাসমুদ্র দেখা দিল, দেখতে দেখতে সেই আলো এক নিশ্চিত রূপ নিল এক ত্রিভঙ্গী মূর্তি, মাথায় ময়ূরপঙ্খ, হাতে বাঁশি আর লাঠি, কোমরে পীতাম্বর, বুকে বৈজয়ন্তীমালা, কাঁখে কম্বল। ইচ্ছা হলো মধ্যযুগের কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাই—'লাঠি আর কম্বলের পরে, রাজত্ব তিনপুরের করি ত্যাগ।'

ঠিক এমন সময়ে আমার চিন্তাকে আহত করে কিছু ভালমানুষ সভাস্থলে এসে উপস্থিত হলো। অনেক সময় বয়ে গেছে। যত লোক এসেছিল, কোন ভূমিকা না করেই তাদের সামনে আলোচ্য বিষয় রাখা হলো। ঠাকুরের পুজো আচারের সঙ্গে পুরো গ্রামের ছোট-খাট ঝগড়ার বিচার শুরু হলো। তর্ক দ্রৌপদীর বস্ত্রের মতো হয়ে উঠল। মাসিক নিতান্ত সাত টাকার ব্যবস্থা করার কথা, আমি উত্তেজনায় নিজের সামর্থ্যের বাইরে বেশি বোঝা নেবার সঙ্কল্প করায় বৃদ্ধ সজ্জনদের হয়তো কিছু আঘাত দিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও ফল হলো না। আর একবার আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না যে, মধ্যযুগের মহিমাশালী সংস্কৃতির উপাশ্রয় মহাবীর্য দেবতা আজ এত উপেক্ষিত কেন! আমার সামনে কিছুক্ষণ আগে যে তেজপুঞ্জ দেখা গিয়েছিল তা আস্তে আস্তে আবছা হতে লাগল। ভাবলাম, এও আমার বৌদ্ধিক বিকার ছিল, বাস্তবে মধ্যযুগের কোনও সংস্কৃতি বা তার আশ্রয়ে এই দেবতাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তর্ক আর কথা কাটাকাটির মধ্যে হঠাৎ আলো দেখা দিল, চমকে উঠলাম, উত্তেজিত হলাম আর কিছুক্ষণের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে থাকলাম।

ঘটনা হলো সভায় একজন পণ্ডিত বসেছিলেন। বড় আশা করে তাঁকে আমরা ডেকেছিলাম। মনোনীত সভাপতির অনুপস্থিতে তাঁরই সভাপতি হওয়ার কথা। নিজের শাস্ত্র-নিষ্ঠায় পণ্ডিতজির খুব গর্ব ছিল। কখনও পণ্ডিতজির শাস্ত্র তার বুদ্ধির ওপর চেপে বসে আর কখনও তার শাস্ত্রের ওপর, সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। সভায় আমার বন্ধুও আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, এখনও পর্যন্ত শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নিয়মেই ঠাকুর পুজো হয়ে আসছে। বর্তমানে যে সাধু করছে সে ব্রাহ্মণ নয় আর শাস্ত্রমতে ঠাকুর সেই জাতির হয়েই পুজো গ্রহণ করেন, যে জাতে পূজারির জন্ম হয়েছে। এর আগের পূজারিও অব্রাহ্মণ ছিল। গত তিন বছর ধরে ঠাকুর অব্রাহ্মণ হয়েই পূজা গ্রহণ করছে। এজন্যে অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, ব্রাহ্মণ এমন ঠাকুরকে পূজ্য মনে করতে পারে না। যথোচিত ব্রাহ্ম-ধর্ম পালন করা কঠিন ব্রত।

নিজের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে পণ্ডিতজি বললেন যে অনধিকারীর পূজায় গ্রামের অমঙ্গল হচ্ছে। এইজন্য আগে অব্রাহ্মণ সাধুকে স্থানচ্যুত করা হোক, তারপর রাগ-ভোগের ব্যবস্থা করা যাবে। আমার নাম ধরে উনি এ-বিষয়ে আমার স্পষ্ট সম্মতি চাইলেন।

ক্ষণিকের জন্যে আমার সামনে মধ্যযুগের ভূয়োভূযঃ পদধ্বস্ত ভারতীয় সংস্কৃতির যাদু ভরা মূর্তি ভেসে উঠল। তা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি ছিল না, শ্রমণ সংস্কৃতি ছিল না, রাজন্য সংস্কৃতি, ছিল না, শাস্ত্রীয় সংস্কৃতিও ছিল না। সে তো সমস্ত হিন্দুজাতির এককেন্দ্রিক সংস্কৃতি ছিল—নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ তেজোময়ী জীবন্ত। এই বৃদ্ধ ব্যক্তি, যার কপালে রামানুজি সম্প্রদায়ের বিরাট তিলক আঁকা, যিনি পণ্ডিতজির কথায় তাল দিচ্ছিলেন, আজ ভুলে গেছেন, হয়তো তাঁর কখনও জানার সুযোগই হয়নি যে রামানুজের দাদাগুরুর পরম্পরায় অনেক আলোয়ার ভক্ত অব্রাহ্মণই ছিলেন না, শূদ্রের চেয়েও নীচু বংশের ছিলেন। মহাপ্রভু আচার্য বল্লভ নিজের শূদ্র শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী (অষ্টছাপের একজন কবি)-কে শ্রীনাথজির মন্দিরের প্রধান অধিকারী করেছিলেন। মহাপ্রভুর গোলকবাসের পর একবার তিনি মহাপ্রভুর একমাত্র গুরু শ্রীগোকুলনাথ গোঁসাই এর মন্দিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। কেননা পণ্ডিতজি অব্রাহ্মণ ঠাকুরের চরণামৃত নিতে সঙ্কোচ করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মুসলমান ভক্ত হরিদাসের চরণোদক জেদ করে ছেঁকে খেয়েছিলেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি মানুন। গোপ বংশে পালিত ও ক্ষত্রিয় বংশে অবতীর্ণ অখণ্ডানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ঋষি-মুনি ভরা সভায় কী পূজার পাত্র ছিলেন বলে স্বীকার করা হয়নি?

আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। এই সভায় অব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন যে সজ্জন বসে আছেন, তার কি কোনও আত্মসম্মান নেই? তিনি এই কথার প্রতিবাদ করছেন না কেন? আর এই সভায় যে ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বসে আছেন, তার মধ্যে কি বিন্দুমাত্র লোককল্যাণ ভাবনা অবশিষ্ট নেই? তিনিই বা এই কথার প্রতিবাদ করছেন না কেন? প্রথম দলের লোকেরা কেন ভীরু কাপুরুষ ভিতু আর অন্য দলের লোকেরাই বা জেদি, অহংকারী, রূঢ় কেন? উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'যে ঠাকুর জাতি বিশেষের পূজা নিয়ে পবিত্র থাকতে পারেন, যিনি অন্য জাতের পূজা গ্রহণ করে অগ্রাহ্য-চরণোদক হয়ে যান, তিনি আমার পূজা গ্রহণ করতে পারেন না। আমার ভগবান হীন ও পতিতের ভগবান, জাতি ও বর্ণের ঊর্ধ্বের ভগবান, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ওপরের ভগবান, তিনি সবার পূজা গ্রহণ করতে পরেন, পূজা গ্রহণ করে

অব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবাইকে পূজ্য করতে পারেন।' আমার কথা তখনও শেষ হয়নি, মাঝপথেই আমার বন্ধু আমাকে থামিয়ে দিল। অরেটরের ভাষা ও ভাষ্যকারের ঢঙে বলল যে সে আমার সঙ্গে ষোল আনা একমত। কিন্তু এরকম কথা এই সময় বলা উচিত নয়। সে ভয় পাচ্ছিল যে খেটে খুটে তার ডাকা সভা পণ্ড না হয়ে যায়। আমার উত্তেজনা তার ভয়ের প্রধান কারণ ছিল। ইসলামের কথা মনে পড়ছিল— ভিতুরাই সমঝোতা করে থাকে।

আমার বন্ধু আমাকে বোঝাচ্ছিল (কারণ পুরো সভায় একমাত্র আমিই অবুঝের মতো কাজ করেছিলাম) আর আমি নিজস্ব সহজ সহচর কল্পনার সঙ্গে ওপরে উঠতে লাগলাম। সভাস্থল থেকে কিছু ওপরে উঠলাম, ঠাকুর-মন্দিরের ওপরে গেলাম, তার নিষ্কম্প ধ্বজার থেকেও ওপরে উঠলামেঃ উঠতে উঠতে আবিল আকাশের প্রত্যেক স্তর পেরিয়ে গেলাম। এখন আমি এমন জায়গায় এসে গেছি যেখান থেকে দুনিয়ার কোনও রহস্য দেখা বাকি থাকে না। আমি দক্ষিণের দিকে তাকালাম। সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকারের সঙ্গে চিতার আগুন লড়াই করছিল, সেই আলোয় কলকল-নিনাদিনী নদী রূপালি রেখার মতো চকচক করছিল, সামনে বহুদূর ছড়ানো বালির ওপর কেবল কঙ্কাল আর নরমুণ্ড পড়ে ছিল। চিতার কাছে একটি কালো মূর্তি বসেছিল, সম্ভবত সে চিতার অধিকারী চণ্ডাল। এমন সময় আমার বিস্ময় শতগুণ বাড়িয়ে চারুদর্শন এক মহাত্মাকে চিতার দিকে দৌড়তে দেখা গেল। ঘন কালো ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল, শোভা যেন চুঁয়ে পড়ছিল, বিশাল কপালে রামানুজি তিলক, পবিত্রতা তাতে নিজের ছায়া দেখছিল, কোমর ও কাঁধে পট্টবস্ত্র, মুখমণ্ডলের চারিদিকে আলোর ছটা ছিটকে পড়ছিল, মনোহর মুখ চোখ, নয়ন ধন্য হয়ে গেলে হঠাৎ মহাত্মা এসে চণ্ডালের পা জড়িয়ে ধরলেন। চণ্ডাল চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রভু, পামরকে আর পাপী কেন করছ? কী করছ দেবতা? ছাড়ো, ছাড়ো, আমি পাপী, চণ্ডাল, আমাকে রৌরব নরকে পাঠিয়ো না।'

মহাত্মা জাপটে পা ধরলেন, সেভাবেই বললেন, 'শান্ত হও। আমার সমস্ত বাসনা, আমার সমস্ত অহংকার এই পবিত্র তীর্থ নষ্ট হয়ে যেতে দাও। আমি সেই মঠের প্রধান। যেখানে তিনদিন আগে তুমি ভগবানের দর্শন করতে গিয়েছিলে, আমার শিষ্যরা তোমার অপমান করেছিল। সেই দিন থেকে ভগবান রুষ্ট হয়েছেন। তিন দিন ধরে আমি ক্ষুর্ধাত, তৃষ্ণার্ত। আমার ঠাকুর আমার অন্ন খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আজ তিনি এসেছিলেন, উদাস, জলে ভরা চোখ, উত্তরীয় চোখের জলে ভেজা, গলা ধরে আছে। কাঁদতে কাঁদতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ,'আমার প্রিয় ঠাকুর, তোমার কি হয়েছে?' ভরা গলায় তিনি গর্জে উঠে বললেন, 'রামানন্দ, আমি তোমার মঠ ছেড়ে দিয়েছি। তোমার শিষ্যরা আমার ভক্তের অপমান করেছে। আমি আর এখনে থাকতে পারি না।' ভীত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এখন কোথায় থাকবে ঠাকুর?' গম্ভীর স্বরে ভগবান বললেন, 'যেখানে আমার ভক্ত থাকে। ওই দেখ, ওই শ্মশানে আমার ভক্ত চিতা জ্বালাচ্ছে। তার কৃপাছাড়া তুমি আমায় পেতে পার না।' এই বলে তিনি চলে গেলেন আর আমি দৌড়ে তোমার কাছে এলাম। আমার শাস্ত্র-গর্ব আজ ধূলায় লুটোচ্ছে, আমার বর্ণ আর আশ্রমের অহংকার আজ শেষ হয়ে গেছে; তুমি ভক্ত, তুমি নারায়ণের রূপ, আমায় কৃপা করো। আদেশ করো, কি সেবা করতে পারি।'

চণ্ডাল ভক্ত গদগদ হয়ে বলল, 'প্রভু আমি কি কৃপা করতে পারি। ভগবান যদি আমায় এ রকম অনধিকার চর্চা করতে বলেন, তাহলে ওঠো প্রভু, আমি আদেশ করছি, স্নান করে আমাকে নিজের শিষ্য করে নাও, আমাকে এমন রাস্তা দেখাও যাতে আমি অহংকার-সমুদ্র পার হতে পারি, ভক্তি-নৌকা পেতে পারি।' রামানন্দ আদেশ পালন করলেন; আর দিগ্‌বধূরা মৌন শঙ্খ বাজাল। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ ইতিহাস না মনোবাঞ্ছিত স্বপ্ন?

দেখলাম, আমার গ্রামের মন্দির থেকেও ঠাকুর বেরিয়ে যাচ্ছেন। তিনি গম্ভীর হয়ে গেছেন, যে চপলচটুল আনন্দময়ী মূর্তির কল্পনা আজ পর্যন্ত আমি করেছিলাম, তার কোনও চিহ্ন তাঁর চেহারায় নেই। অণু-পরমাণুর সঙ্গে সমস্ত আকাশ ধিক্ ধিক্ করে উঠল। আমি ছাড়া অন্য কেউ এই ধিক্কার বাক্য শুনতে পেল না। লজ্জা ও গ্লানিতে আমার চেহারা কালো হয়ে গেল। আমার গ্র্যাজুয়েট বন্ধু এখনও আমাকে বোঝাচ্ছে। হয়তো আমি কিছুটা বুঝতেও পারছিলাম। হঠাৎ তার মুখ থেকে একটি যুক্তি বেরোতে দেখে আমার ভাবুকতা আর একবার ধাক্কা খেল। সে আমার কথার এমন মানে করল যা আমার উদ্দেশ্যে না হলেও ঠিক ছিল, আমি মুসলমানদেরও পূজার অধিকারী মনে করছি।

হায় হিন্দু আর হায় মুসলমান! নিরন্তর আটশো বছর সংঘর্ষের পর, একে অন্যের এত কাছাকাছি থেকেও, তুমি একেবারে নিজস্ব এক-সংস্কৃতি গড়তে পারলে না। কিছুক্ষণ আগে এই সভায় বসে থাকা এক ক্ষত্রিয় অধ্যাপককে অভিবাদন করে এক বৈশ্য শিষ্য বলেছিল— 'সেলাম বাবুসাহেব।' শাস্ত্রনিষ্ঠ পণ্ডিতমশাই বকে উঠে বললেন, 'এটা মুসলমানি কায়দা।' ক্ষত্রিয় অধ্যাপক ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'আমাদের মধ্যে খারাপ রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে।' কিন্তু এমন ও এইরকমের আরও দু-চারটে খারাপ রেওয়াজই তো হিন্দু-মুসলমান নামের দুই বিশাল শিলাখণ্ডকে জোড়ার আঠা ছিল। আজ তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বর্জন-পরায়ণ হিন্দু-ভাব সবকিছু ধুয়ে মুছে ফেলতে চায়, অহংকারী মুসলমান কিছুই গ্রহণ করতে চায় না।

এমন সময় আমার মনে হলো যে পশ্চিমি মহাসমুদ্রে ভয়ংকার ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দু-চারজন শ্বেতাঙ্গ নাবিক এগিয়ে আসছে। সামনে পেছনে যেদিকে চোখ যায় খালি জল আর জল খালি ঢেউয়ের শব্দ, সমুদ্রের গর্জন। তাদের চেহারা শান্ত, মস্তিষ্ক ধীর। এই শান্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। এ তো সেই শান্তি যার পেটে পুরো দুনিয়ার ঝড় ছিল। শ্বাস রুদ্ধ করে আমি তাদের অসীম সাহস আর ধৈর্য দেখতে থাকলাম— নির্বাক, নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ! শেষে এই নাবিকরা ভারতের তীরে পৌঁছল। তারপর পতঙ্গদলের মতো শত শত নৌকো মহাসমুদ্রের চঞ্চল বুকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ভারতীয় অন্তরীপ এ-কোনা থেকে ও কোনো পর্যন্ত বিদেশি লোকে ভরে গেল। সুযোগ বুঝে তার ফাটলে আঘাত করল; প্রথম থেকেই আলাদা, হিন্দু ও মুসলমান দুর থেকে আরও দূরে চলে যেতে লাগল। সুযোগ বুঝে বিদেশিরা রাজা হয়ে বসল আর অপূর্ব অধ্যবসায় ও মন দিয়ে দুই জাতিকে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। তারা যত বুঝতে পারল ততই ভেদ-ভাব জাগিয়ে তুলল। আজ প্রত্যেক কথাকেই আমরা হিন্দু-দৃষ্টি ও মুসলমান-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যেন হিন্দু মুসলমানের একসঙ্গে দেখার মতো কোনও দৃষ্টিই নেই। আমি আবার একবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মনে মনে বললাম, হায় হিন্দু আর হায় মুসলমান!

শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর পরের দিনর জন্যে সভা মুলতুবি হলো। এখনও আমি কল্পনার মনোগামী রথে বসেছিলাম। আমার পাশে একজন তরুণ পণ্ডিত বন্ধু বসেছিলেন। তিনি অন্য গ্রাম থেকে এসেছিলেন। একমাত্র তিনিই আগাগোড়া নির্লিপ্তভাবে বসেছিলেন। সব শুনলেন, কিন্তু কখনও বিচলিত হলেন না, চঞ্চল হলেন না। আমাকে নাড়া দিয়ে তিনি বললেন— 'ঠিক আছে আজ সভা শেষ হল। আপনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।' বললাম— 'ঠিক আছে'

কিন্তু কী ঠিক ছিল? আমার গাঁয়ের ঠাকুরবাড়ি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তার অব্যবস্থার জন্যে বিরাট হিন্দুসমাজ বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করবে। আর এই সভা? এ তো তার থেকেও নগণ্য। এইরকম সামান্য সভা তাহলে কি জন্যে আমার মনে ভারতীয় মহামানব সমুদ্রের প্রত্যেক ঢেউয়ের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল? সম্ভবত তা হিন্দুসমাজের জীবনীশক্তির প্রমাণ, এই বিরাট মহামানব সমুদ্রের কোনও ঢেউ স্বতন্ত্র নয়, এই সাধারণ ঠাকুরবাড়ির সমস্যাও সমস্ত বিশ্বের সমস্যার সঙ্গে জটিল ভাবে জড়িয়ে আছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে সমাধান করা যেতে পারে না। সভা হতে থাকবে, রাগ-ভোগের ব্যবস্থাও হবে, নাও হতে পারে, কিন্তু যদি বিস্তারিত ভাবে না ভাবা যায় তবে সমস্যা একইরকম থেকে যাবে। পুরো গ্রামের মানুষ সমস্ত জগতের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত, তাদের ওপর বিশ্বের রাজনৈতিক আর্থিক সামাজিক নৈতিক আধ্যাত্মিক সমস্ত রকমের গুরুতর সমস্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ পড়েছে। তারা ঠাকুরের প্রতি উদাসীন হতে বাধ্য। সামনে যে মসজিদ ঝলমল করছে তাও উপেক্ষিত। একই আলো দু রঙের কাঁচ দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে দু রকমের দেখাচ্ছে। এই ঠিক ছিল। আমি উঠে পড়লাম। উঠতে উঠতে আমি আবার ভাবলাম: কী কারণে একই আর্থিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার চাপে মুসলমানি মসজিদ ঝলমল করে উঠেছে আর এই হিন্দু মন্দির উপেক্ষিত? মুসলমান ধর্ম কি বেশি সজীব? হয়তো নয়। হিন্দুধর্ম কি বেশি মরা? হয়তো! তারা হিন্দুধর্মের উৎকর্ষে ভীত। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম প্রয়োজনের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেছে। মুসলমান নিজেদের পড়ে থাকা শেষ শক্তি দিয়ে মুসলমানত্বের প্রদর্শন করছে। এই অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। সেই আগন্তুক উৎসাহও শেষ হয়ে যাবে আর এই অত্যধিক অত্মবোধমূলক শিথিলতা তো শেষ হয়েই চলেছে। যখন দুই-ই শেষ হয়ে যাবে তখন রাস্তা দেখা যবে, তখনই শান্তি আসবে। তথাস্তু।

এগারো

ঝরো ঝরো ঝরো তো

আজ জুলাইয়ের দশ তারিখ। আষাঢ় শেষ হতে মাত্র পাঁচ দিন বাকি। বৃষ্টি হয়নি। গত সপ্তাহে পুবালি হাওয়ায় জোর ছিল, মাথার ওপর জলভরা মেঘ উড়ছিল। সারা দিন উড়ছিল, মনে হচ্ছিল এখুনি বৃষ্টি হবে, মেঘ যাবে না, কিন্তু বিকেল হতেই আকাশ পরিষ্কার (সকাল হতেই আবার মেঘের আনাগোনা, কিন্তু হলো না) পুরোনো কবির একটা লাইন মনে ঘুরপাক খচ্ছিল: 'গুণগ্রাহক বন্ধু মেঘ ঝরে যে মিছে মৌন কথায়।' কিন্তু গুণগ্রাহক বন্ধু মেঘের কানে ডাক পৌঁছোয়নি। ঝরল না তো ঝরল না! তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো আকাশে জলভাণ্ডার বইতে দেখলাম। কম নয়, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না।

পৃথিবী আর আকাশের মধ্যে কিছু সাঁঠ-গাঁঠ আছে। হয়তো বরাবরই ছিল। এখানেও লোকে বলে, অন্ন কম নেই, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। রেশন দোকান খালি। কালোবাজারে ভর্তি—সব আছে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ছে—খালি পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজে পড়ি, ভাল ব্যবস্থ করা হচ্ছে, চোখ দেখে হচ্ছে না। আকাশ ও পৃথিবীর গ্রহরা চুপচাপ। কি হবে? আকালের ভয়ানক ছায়া মেঘের সুন্দর ছায়ায় মতোই ঘনঘোর। লোকে বলছে, চাষিরা ত্রাহি ত্রাহি করছে। কে উদ্ধার করবে।

মেঘ উড়ছে, গর্জাচ্ছে না। বলা হয় যে গর্জায় সে বর্ষায় না। কিন্তু যে গর্জন করছে না সেই বা কোথায়। মনে হচ্ছে, পুরোনো সব অভিজ্ঞতা বেকার। বাবুই পাখিদের ওড়া কখনও বেকার হতে দেখিনি। কিন্তু আজকাল তাও বেকার প্রমাণিত হচ্ছে। ব্যাটা রোজ ওড়ে, হাওয়ার উল্টো দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা ওড়ে। কিন্তু বেকার। সত্যিই যুগ পাল্টাচ্ছে। যেমন যারা গর্জায়, তেমন যারা গরজায় না। পৃথিবীতে কিছু পার্টি গর্জাচ্ছে, কিন্তু পারবে না, কিছু গর্জাচ্ছে না, তারাও বর্ষাতে পারবে না। জনতার জন্যে দুই-ই সমান। যেমন নাগনাথ তেমনি সাপনাথ!

কিন্তু জলভরা এই বাদলের হলো কী? এরা কোথায় চলেছে? মুখ তো দিল্লির দিকে।

সবাই দিল্লির দিকে চলেছে। মেঘও, মানুষও। স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও কপালে এই লেখা ছিল! ভাবতাম, এখানে না হলেও, দিল্লিতে বৃষ্টি হলে ক্ষতি কি? কিন্তু শুনেছি, সেখানে অবস্থা আরও খারাপ। কাজল কালো যত মেঘ সেখানে গেছে, বিনা বর্ষণেই শুকিয়ে গেছে। এখানে ভিড় লুটিয়ে পড়ছে, ওখানে ধুলো উড়ছে।

অভিজ্ঞ লোকেদের কাছে দুটো কারণ জানতে পারলাম। একজন বললেন সে 'প্রেসার' কম হয়ে গেছে। প্রেসার মানে চাপ। পুরো দুনিয়া তো জানে না যে এদেশে চাপ ছাড়া কোনও কাজই হয় না। আকাশে যা ঘটছে, পৃথিবীতে অনেক আগেই থেকেই তা ঘটে চলেছে। আকাশ কি পৃথিবীর কাছে নতুন চালাকি শিখছে, অথবা সেখানের চালও কি এইরকম? এই বিশেষজ্ঞদের কথা যে ঠিক, তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আকাশের ওপর

কীভাবে প্রেসার দেওয়া যায়? অন্য বিশেষজ্ঞ বললেন মনসুন বেল্ট আফ্রিকা মহাদ্বীপের দিকে সরে গেছে। এখন তার চাপ দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায়। বড় খারাপ খবর। বেল্টই সরে গেছে! তাহলে কি ইরানে বর্ষণ হবে। কে জানে!

এদিকে আশা কি ছেড়ে দেওয়া উচিত? বিশেষজ্ঞের কথার মর্যাদা আছে, তবুও মন মানে না যে এই দেশের প্রতি ইন্দ্রদেব এতই অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, ঘোড়দৌড়ের মাঠই অন্য দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। এত অসন্তুষ্ট হওয়া তো উচিত নয়। আমরা তার কী ক্ষতি করেছি? তার হাজার চোখের একটাতেও আমরা তো আঘাত করিনি। আর, যদি কেউ করে থাকে, তবে পরমাণুওয়ালা কোনও দেশই হবে। আমরা তো হাত তুলে ঘোষণা করেছি যে পরমাণু বোম তৈরি করব না। যা খুশি হয়ে যাক।

অনাবৃষ্টি এদেশে নতুন কিছু নয়। বারো বছর পর্যন্ত লাগাতার অনাবৃষ্টির দলিল পাওয়া গেছে। মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ একবার এমন অসন্তুষ্ট হলেন যে সমস্ত মেঘকে মৃগচর্ম করে তার ওপর বসে ওপর সমাধিস্থ হলেন। অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো গিয়েছিল। যোগীর ক্রোধ বিকট হয়।

এবার তেমন হয়নি। এতো নিশ্চিত, কারণ মৃগচর্ম মেঘ হয়নি, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কিছু না কিছু তো অবশ্যই হয়েছে। দেশে যোগী তো কম নেই আর তার মধ্যে কিছু তো সত্যিই অসন্তুষ্ট। স্বাধীন ভারতে যোগীরাও এখন ধান্দাবাজি শুরু করেছেন।

স্বাধীনতার পর দ্রুতগতিতে যোগবিদ্যার প্রচার বেড়েছে। এমন যোগেশ্বরও হয়েছেন যিনি অভিমন্যুর মতো কুক্ষিগত অবস্থা থেকেই যোগবিদ্যার পণ্ডিত হয়ে জন্মেছেন। এরা অসন্তুষ্ট হলে সমুদ্রের জল পর্যন্ত শুকিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। মেঘ তো মেঘ, ধূমজ্যোতি সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ বর্ষ মেঘ!

মানুষের আশঙ্কা যে কোনও ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক অপরাধের জন্যে অনাবৃষ্টির প্রকোপ হচ্ছে। লোক যাগযজ্ঞ করা শুরু করেছে। আদিম টোটকাও হচ্ছে। শুনেছি অনাবৃত শরীরে মহিলারা হাল চাষ করছে, দেওয়ালে গোবরের পুতুল দেওয়া হচ্ছে—যে ভাবে হোক বৃষ্টি হওয়া চাই।

আকাশে জল ভরা মেঘ দৌড়চ্ছে। দিঙ্‌মণ্ডল জলে ভরে গেছে, কিন্তু জল পড়ছে না, ঠিক যেন শষ্যভরা ওয়াগন দৌড়চ্ছে, এক দানাও পাওয়া যাচ্ছে না।

ঝরো, আকাশের মেঘ ঝরো!' দয়া না করতে পারলে বুদ্ধির সাহায্য নাও—'বিগড়ালে বাতাস যাবে নিয়ে উড়িয়ে বালুকণাসব পাহাড়ে!' তাই বুঝেশুনে চলো। কিন্তু বুদ্ধি কোথায়? না আছে পৃথিবীতে আর না আকাশে। যাদের বুদ্ধি আছে, তারা সব কিছু জড়ো করে কুণ্ডলি মেরে তার ওপর বসে থেকে লাভ নিচ্ছে। কিন্তু কতদিন তারা ওরকম করতে পারবে? স্বাধীন ভারতের বুভুক্ষ জনতা খুব বেশি দিন এসব সহ্য করবে না। এইজন্যে বলি—আকাশের মেঘ ঝরো, জোরে ঝরো; আর পৃথিবীর মানুষ প্রেমের সঙ্গে ঝরো, মোহ-মায়া ছেড়ে ঝরো। দিনকাল খারাপ হয়ে আসছে। ঝরো তো!

বারো

নিরাশ হব কেন?

কখনও কখনও আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ঠগবাজি ডাকাতি চুরি তস্করি আর ভ্রষ্টাচারের খবরে কাগজ ভরে থাকে। আরোপ-প্রত্যারোপের এমন পরিবেশ হয়েছে যে মনে হয় দেশে কোনও সভ্য মানুষই নেই। প্রত্যেক মানুষকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। যে যত উঁচু পদে আছে, তার মধ্যে তত বেশি দোষ খোঁজা হয়। একবার একজন খুব বড় মানুষ আমাকে বলেছিলেন, এখন যে কিছু করে না সেই-ই সুখি, যেই কিছু করতে যাবে লোকে তার মধ্যে দোষ খুঁজবে। তার সমস্ত ভাল গুণ ভুলে তার দোষগুলিই বড় করে দেখানো হবে। কার মধ্যে দোষ হয় না? এই জন্যেই প্রত্যেক মানুষ দোষী মনে হচ্ছে, গুণী কম বা একদম নেই। পরিস্থিতি যদি এমন হয় তবে তা চিন্তার কথা।

গান্ধী ও তিলক যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ-কি সেই? বিবেকানন্দ ও রামতীর্থের আধ্যাত্মিক উচ্চতার ভারতবর্ষ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মদনমোহন মালব্যের মহান সংস্কৃতি-সভ্যতার ভারতবর্ষ কোন অতীতের গহ্বরে হারিয়ে গেছে? আর্য দ্রাবিড়, হিন্দু মুসলমান, ইয়োরোপ ও ভারতীয় আদর্শের মিলনক্ষেত্র 'মহামানব সমুদ্র' কি শুকিয়ে গেছে? আমার মন বলে তা হতে পারে না। আমাদের মহান মনীষীদের ভারত আছে আর থাকবে। ওপরে যতই কোলাহল গোলমাল দেখা যাক না কেন, নিচে শান্ত অচঞ্চল গাম্ভীর্যে ভারত এখনও মহান, অনুকরণীয়। এটা ঠিক আজকাল এমন পরিবেশ হয়েছে যে সততার সঙ্গে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করা, সাদাসিধে শ্রমজীবীরা পিষে যাচ্ছে আর মিথ্যা জুয়াচুরি করে রোজগার করা লোকের পেট মোটা হচ্ছে। সততাকে মূর্খামির পদবাচ্য মনে করা হচ্ছে। সততা কেবল ভীরু ও বিবশ লোকেদের ভাগে পড়ছে। এমন অবস্থায় জীবনের মহান মূল্য সম্পার্ক মানুষের আস্থা টলতে শুরু করেছে।

নতুন কথা নয়। কিন্তু এর বীভৎসতা সম্ভবত এর আগে কখনও এত ভয়ঙ্কর হয়নি। আজ থেকে চারশো বছর আগে বাবা তুলসীদাস এরকমই পরিবেশ দেখেছিলেন। ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন:

কষ্ট পায় সাধুজনে, করে সাধুতা,
করে ভোগ দুষ্ট জনে, দুষ্টকর্মে খুশি।

কিন্তু আধুনিক সুযোগসুবিধা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল ধন সংগ্রহের প্রবৃত্তি যে রকম বেড়েছে, তখনকার দিনে এ-রকম ছিল না। দুষ্টের উল্লাস বেহিসাবি বেড়ে গেছে আর সেই অনুপাতে, কিছু বেশি মাত্রাতেই 'সাধুতার চিন্তা'ও বেড়েছে। মহান জীবনমূল্যের প্রতি

তুলসীদাস আস্থা ছাড়েননি, তাঁর সমসাময়িক অধিকাংশ মানুষই ছাড়েনি, কিন্তু আজ? ছাড়ার দরকার নেই।

ওপর-ওপর যা দেখা যাচ্ছে, তা ইদানীং মানুষের তৈরি নীতির ত্রুটি। সবসময় মানুষের বুদ্ধি নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে নতুন সামাজিক বিধিনিষেধ তৈরি করে, তা যদি ঠিক প্রমাণিত না হয়, তাহলে সেগুলো বদলে নেয়। দ্বন্দ্ব গ্রহণ ত্যাগ সংশোধন পরিবর্ধন চলতেই থাকে। কয়েকবার দুর্ব্যবস্থায় জন্য নিরীহ্ মানুষের কষ্ট বেড়ে যায়। অনেক সময় সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্থিতি পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিবিশেষ বাজেভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। নিয়মকানুন সবার জন্য তৈরি হয়, কিন্তু মানবসমাজ অনেক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আরও জটিল হয়, সবার জন্যে একই নিয়ম কখনও সুখের হয় না। মানুষের বুদ্ধি দিয়ে তৈরি ব্যবস্থা সবসময় ত্রুটিযুক্ত হয়। যুগে যুগে পরীক্ষিত আদর্শের সঙ্গে কখনও সাময়িক নিয়মকানুনের সংঘাত হয়, তাতে ওপরের স্তর আলোড়িত হয়। আগেও হয়েছে, পরেও হবে। তা দেখে হতাশ হয় পড়া ঠিক নয়।

ভৌতিক বস্তুর সংগ্রহকে ভারতবর্ষ কখনও গুরুত্ব দেয়নি। তার দৃষ্টিতে মানুষের ভেতরে যে মহান আন্তরিক তত্ত্ব আছে, তাই চরম ও পরম। লোভ মোহ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি বিকার মানুষের ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই থাকে; কিন্তু তাদের প্রধান শক্তি মনে করা ও নিজের মন এবং বুদ্ধিকে তাদের ইশারায় চালানো নিকৃষ্ট আচরণ। ভারতবর্ষ কখনও এদের গুরুত্ব দেয়নি, সবসময় সংযম-বন্ধনে এদের বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খিদে উপেক্ষা করা যায় না, অসুস্থের জন্যে ওষুধ উপেক্ষা করা যায় না, পথহারাকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে আসা উপেক্ষা করা যায় না। এদেশের কোটি কোটি লোকের খারাপ অবস্থা দূর করতে অনেক নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছে যা কৃষি শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা আরও উন্নত এবং সুচারু করার লক্ষ্যে নিবেদিত। এই উদ্দেশ্য খুবই ভাল, কিন্তু যাদের এ কাজ করার কথা তাদের মন সবসময় পবিত্র হয় না। তারা প্রায়ই তাদের উদ্দেশ্য ভুলে যায় আর নিজের সুখ সুবিধার দিকে বেশি নজর দেয়। ব্যক্তিহৃদয় সবসময় আদর্শ দিয়ে পরিচালিত হয় না। এ ক্ষেত্রে যত বড় আকারে মানুষের উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে, তত বড় আকারে লোভ মোহের মতো বিকৃতিও বিস্তৃত হয়েছে। উদ্দেশ্যর কথা ভুলে গেছে। আদর্শ ঠাট্টার বিষয় হয়ে গেছে আর সংযমকে প্রাচীনপন্থি মনে করা হয়েছে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে এ তো সামান্য কিছু লোকের বেড়ে যাওয়া লোভের ফল, কিন্তু তাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শ স্পষ্টভাবে আরও বেশি মহান ও উপযোগী হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষ আইনকে সর্বদা ধর্ম মনে করে। আজ হঠাৎ আইন ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আইনকে ধোঁকা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ধর্মকে দেওয়া যায় না। এজন্যে যারা ধর্মভীরু, সংস্কারগ্রস্ত মানুষ তারা আইনের ত্রুটি থেকে ফায়দা তুলতে সংকোচ করে না।

এ কথার অনেক প্রমাণ খোঁজা যেতে পারে। সমাজের ওপর দিকে যাই হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে এখনও ভারতবর্ষ অনুভব করে যে ধর্ম আইনের চেয়ে বড়! এখনও সেবা সততা সত্যতা ও আধ্যাত্মিকতার মূল্য বেঁচে আছে। তারা অবশ্য চাপা পড়ে আছে, কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়নি। মানুষ আজও মানুষকে ভালবাসে, নারীকে সম্মান করে, মিথ্যা ও

চুরিকে খারাপ মনে করে, অন্যকে কষ্ট দেওয়া পাপ মনে করে আর বিপদে পড়া বিবশ মানুষের সাহায্য করতে পারলে, নিজেকে ধন্য মনে করে। খবরের কাগজে ভ্রষ্টাচারের প্রতি এত আক্রোশ এই প্রমাণিত করে যে আমরা এগুলোকে অন্যায় মনে করি এবং যারা অসৎ উপায়ে ধন বা যশ পায়, সমাজে তাদের মর্যাদা কম করতে চাই। দোষের পর্দা ফাঁস করা খারাপ নয়। কারও ব্যবহারের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরার সময় রসিয়ে-রসিয়ে তা করা আর দোষ দেখানোই একমাত্র কর্তব্য মনে করা খারাপ। ভাল দিকগুলো ততটা রস দিয়ে তুলে না ধরা আরও খারাপ। এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে যা তুলে ধরলে লোকের মনে ভালোর প্রতি ভাল ধারণা জেগে ওঠে।

আমি একবার রেল স্টেশনে টিকিট কাটতে গেছি। ভুল করে দশ টাকার বদলে একশো টাকার নোট দিয়ে ফেলেছিলাম। টিকিটবাবু তখন টাকা রেখে দিলেন। বুঝতেই পারিনি যে আমি কত বড় ভুল করেছিলাম। আমি তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদে তখনকার সেকেন্ড ক্লাশে প্রত্যেক লোকের মুখ চিনতে চিনতে টিকিট বাবু হাজির হলেন। আমাকে চিনতে পেরে খুবই বিনম্র হয়ে আমার হাতে নব্বই টাকা রেখে বললেন, 'খুব ভুল হয়ে গেছে, আপনিও খেয়াল করেননি, আমিও করিনি।' তার চেহারায় বিশেষ সন্তোষের গরিমা ছিল। আমি চমকে উঠলাম। কি করে বলি যে পৃথিবী থেকে সত্যতা ও সততা লোপ পেয়েছে? এমনি অনেক গটনা ঘটেছে, কিন্তু এই একটি ঘটনা ঠগবাজি ও বঞ্চনার অনেক ঘটনা থেকে বেশি শক্তিশালী।

একবার আমি বাসে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও তিন সন্তান। বাসটা একটু খারাপ ছিল, থামতে থামতে যাচ্ছিল। গন্তব্যের প্রায় পাঁচ মাইল আগে এক নির্জন জায়গায় বাস জবাব দিয়ে দিল। তখন রাত প্রায় দশটা। বাসযাত্রীরা ঘাবড়ে গেল। কন্ডাক্টর ওপরে গেল আর একটা সাইকেল নিয়ে চলে গেল। লোকের মনে সন্দেহ হলো যে আমাদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। বাসের লোকেরা নানান কথা বলতে লাগল,' এখানে ডাকাতি হয়। দুদিন আগে একটা বাস লুট হয়েছে।' আমিই একমাত্র সপরিবারে ছিলাম। বাচ্চারা 'জল, জল' করে চেঁচাচ্ছিল। জলের কোনও পাত্তাই ছিল না। তার ওপর লোকেও ভয় পেয়েছিল। কিছু যুবক ড্রাইভারকে মারবে বলে ঠিক করল। ড্রাইভারের মুখ তো শুকিয়ে কাঠ। লোকেরা তাকে ধরে ফেলল। খুব অসহায় হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমরা বাসের একটা কিছু উপায় করছি, এরা মারবে, বাঁচান।' ভয় তো আমার মনেও ছিল, কিন্তু তার কাতর অবস্থা দেখে অন্য যাত্রীদের বোঝালাম, 'মারা ঠিক হবে না।' কিন্তু যাত্রীরা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে আমার কথা শুনতে রাজি হলো না। তারা বলতে লাগল, 'এর কথা শুনবেন না, ও ধোঁকা দিচ্ছে। কন্ডাক্টরকে আগেই ডাকাতের কাছে পাঠিয়েছে।' আমিও ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু যে কোনও উপায়ে ড্রাইভারকে মারের হাত থেকে বাঁচালাম। দেড় দু ঘণ্টা কেটে গেল, আমার বাচ্চারা খাবার আর জলের জন্যে ছটফট করছিল। আমার আর স্ত্রীর অবস্থাও খারাপ, লোকেরা ড্রাইভারকে মারল না বটে কিন্তু তাকে বাস থেকে নামিয়ে আর এক জায়গায় ঘিরে রাখল। মনে করল, কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে আগে ড্রাইভারকে শেষ করে দেওয়াই ঠিক হবে। আমার পীড়াপীড়ির কোনও ফল হলো না। এমন সময় দেখলাম যে একটা খালি বাস এগিয়ে আসছে আর তাতে আমাদের বাস-কন্ডাক্টরও বসে আছে।

এসেই সে বলল, 'নতুন বাস নিয়ে এসেছি, এতে বসুন, ওটা চলার মতো নেই।' তারপর আমাকে এক ঘটি জল আর অল্প দুধ দিয়ে বলল, 'পণ্ডিতজি বাচ্চাদের কান্না দেখতে পারলাম না। দুধ পেয়ে গেলাম, অল্প নিয়ে এলাম।' যাত্রীরা নড়েচড়ে বসল। সবাই তাকে ধন্যবাদ দিল। ড্রাইভাররের কাছে ক্ষমা চাইল, রাত বারোটার আগেই সবাই পৌঁছে গেলাম। কি করে বলি যে মানবতা শেষ হয়ে গেছে, দয়া মায়া শেষ হয়ে গেছে? জীবনে এরকম ঘটনা কত ঘটেছে, যা আমি কখনও ভুলতে পারিনি।

ঠকেওছি, ধোঁকাও খেয়েছি কিন্তু খুব কম জায়গাতেই বিশ্বাস ভেঙেছে। ধোঁকা খাওয়ার ঘটনাই যদি মনে রাখি তবে জীবন খুব কষ্টকর হয়ে যাবে। অকারণ সাহায্য পাওয়ার ঘটনাও খুব কম নয়, নিরাশ মনকে তা অনেক সাহায্য দিয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের এক প্রার্থনাগীতে লিখেছেন:

সংসারেতে লভিলে ক্ষতি, পাইলে শুধু বঞ্চনা
তোমাকে যেন না করি সংশয়।

মানুষের তৈরি নিয়ম যদি ভুল পথে যায় তবে তা বদলাতে হবে। আসলে বদলানো হচ্ছে। কিন্তু এখও আশা-জ্যোতি নেভেনি মহান ভারতবর্ষকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, থাকবে।

রে মন! নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

তেরো

ভীষ্মকে ক্ষমা করা হয়নি

আমার এক বন্ধু আছেন, বিরাট বিদ্বান, স্পষ্টভাষী ও নীতিবান। তিনি এই রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক। তার সঙ্গে দেখা হলে নতুন করে আনন্দ পাই। বয়সে তিনি আমার থেকে ছোট, আমাকে সম্মান করেন। খুবই ভাল কথা, এই দেশে যদি কেউ সব দিকে ছোট হয়েও বয়সে বড় হয়, তাহলে অল্পস্বল্প সম্মান পেয়ে যায়। আমিও পেয়ে যাই। আমার এই বন্ধুর অভিযোগ ছিল, দেশের দুর্দশা দেখেও আমি কিছু বলছি না, অর্থাৎ এই দুর্দশার জন্য দায়ী লোকেদের ভর্ৎসনা করছি না। এ এক ভয়ংকর অপরাধ। কৌরবসভায় দ্রৌপদীর ভয়ংকর অপমান দেখেও ভীষ্ম যেমন মৌনব্রত রেখেছিলেন, তেমনই আমি ও আমার মতো কিছু সাহিত্যিক বন্ধুও চুপ মেরে গেছি। ভবিষ্যৎ যেমন ভীষ্মকে ক্ষমা করেনি তেমনিই

এদেরও করবে না। আমি কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে শুনছিলাম আর মনের ভেতর পাপ বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলাম, কিছু করা উচিত, না হলে ভবিষ্যৎ ক্ষমা করবে না, বর্তমানেই কি ক্ষমা করছে? অনেকক্ষণ চিন্তিত ছিলাম— চুপ থাকা ঠিক নয়. ব্যাটা ভবিষ্যৎ কখনও মাফ করবে না। তার কোনও সীমাও তো নেই। পাঁচ হাজার বছর কেটে গেছে, তবুও বেচারা পিতামহ ভীষ্মকে ক্ষমা করা হয়নি। ভবিষ্যৎ বিকট অসহিষ্ণু।

অনেক পরে ভুল ভাঙল। আমি ভীষ্ম নই। যদি কোনও হিন্দি লেখক ভীষ্ম হয়েও যায়, তাহলেও আমাকে কে পাত্তা দেয়? অনেম জ্ঞানী-গুণী পড়ে আছেন। বয়সে জ্ঞানে প্রতিভায় আমার চেয়ে তারা অনেক এগিয়ে। আমার কোনও ভয় নেই। 'ভবিষ্যৎ' নামক মহাদুরন্ত অজ্ঞাত আমাকে ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না। ভয় পেতে হলে তারা পাক, যারা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে: তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন বাবা; তুমিতো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। এই বাস্তববোধের জন্য মুক্তি পেলাম।

কিন্তু মেনে নেওয়া ভাল যে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, ভীষ্ম আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখলেন। প্রাচীন যুগে ভীষ্মের মতো ধর্মজ্ঞ ও জ্ঞানী খুঁজে পাওয়া শক্ত, মহাভারতের শান্তিপর্ব তার সাক্ষি। ভালোমানুষটি কোনও সমস্যাই বাদ রাখেননি। নিজস্ব অগাধ ইতিহাসবোধের জন্যে প্রাচীন যুগের জ্ঞানীদের মধ্যে ভীষ্ম আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেন। যুধিষ্ঠিরের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রায়—অত্রীপ্যদাহরন্তীমিতিহাসং পুরাতনম্। (এখানেও লোক পুরোনো ইতিহাসের দৃষ্টান্ত রাখেন)

আশ্চর্যের বিষয় হলো যে কীভাবে সে পুরোনো ইতিহাস দিয়ে বর্তমান সমস্যার বাস্তব স্বরূপ তুলে ধরে ও তার বিকাশক্রম বোঝায়। প্রত্যেক প্রশ্নের ভেতরে যাওয়ায় তার পদ্ধতি আধুনিক যুগেও উপযোগী। জ্ঞান ও ধর্মের সত্যরূপ চিনতে সে অদ্ভুত সাফল্য পেয়েছিল। ভারত ভীষ্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখায়নি, একথা বলা ভুল হবে। শ্রদ্ধাবানেরা আজও ভীষ্মাষ্টমীর দিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, কিন্তু আমার বন্ধু যখন অত্যন্ত প্রভাবশালী ঢঙে আমার ওপর ভীষ্মকে চাপিয়ে দিচ্ছিল তখন কিছুক্ষণের জন্যে আমার ওপর ভীষ্মের আবেশ ছেয়ে গিয়েছিল। প্রভাবশালী ভাষায় যাদুশক্তি থাকে। তাতেই কবি পাঠককে অভিভূত করে, সেই শক্তিতেই বক্তা শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমিও হয়েছিলাম। ভীষ্মের মতোই বলার প্রেরণা পাচ্ছিলাম ... অত্রাপ্যদাহরন্তীমিতিহাসং পুরাতনম।

একটা পুরোনো ইতিহাস আমারও মনে এলো। সেই ইতিহাস এইরকম। 35-36 সালের কথা, সে সময় আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম। আমি প্রাতঃভ্রমণে তখনই বেরোই যখন কোনও উৎসাহী শ্রদ্ধেয় ভ্রমণবিলাসীর কাছ থেকে প্রেরণা পাই। সেই সময় শ্রদ্ধেয় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের প্রেরণায় প্রাতঃভ্রমণে বেরোতাম। আসল কথা হলো উনি বেরোতেন আর আমি তাঁর পিছু নিতাম। সেইদিন আমি তাঁর সঙ্গেই বেরোলাম। ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। দেখলাম, গুরুদেব নিজের বাগানে ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছেন। কিছুটা গম্ভীর। আচার্য সেন বললেন, 'চলো প্রণাম করে আসি।' উনি আগে আর আমি পেছনে। আস্তে আস্তে পা টিপে আমরা তাঁর কাছে পৌঁছলাম। পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তাঁর ধ্যান ভাঙল। দেখে প্রসন্ন হলেন। আমাকে সম্বোধন করে বললেন—'ভীষ্মকে অবতার মানা হয়নি আর শ্রীকৃষ্ণকে অবতারের সম্মান দেওয়া হয়েছে কেন, কখনও ভেবে দেখেছ কী?'

কখন ভাবিই নি। কি উত্তর দেব? মনে মনেই নিজের ভাবনাচিন্তার দারিদ্রের জন্যে লজ্জা পাচ্ছিলাম। আচার্য সেন বাঁচালেন। বললেন, 'এমন প্রশ্নের উত্তর তো আপনার কাছ থেকেই শুনতে চাই।' হাসতে হাসতে গুরুদেব বললেন, 'আপনি তো নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছেন। আমি এই পণ্ডিতকেই খ্যাপাতে চাইছিলাম। এখন তরুণ, তাজা রক্ত, মার খাওয়ার শক্তি বেশি, আমার পিঠ তো জর্জর হয়ে গেছে।' বলে গুরুদেব হাসলেন। বিনম্র হয়ে বললাম, 'মনে এমন প্রশ্ন কখনও ওঠেনি, তবু আপনি যখন বলছেন, তখন ভাবব। কিন্তু কী ভাবব, আপনি বলে দিন।' গুরুদেবের ভাষা মনে নেই, কিন্তু আমার মনের ওপর তার বলার যে প্রভাব রয়ে গেছে তা এই রকম: 'শরশয্যায় শুয়ে ভীষ্ম যখন নরসংহার দেখছিলেন, তখন তার মতো জ্ঞানীর মনে, নিজের প্রতিজ্ঞা, তার পরবর্তী পরিণাম ইত্যাদি কী তাঁকে ভাবিয়ে তোলেনি?' গুরুদেবের এই সব কথা আমরা মনকে প্রভাবিত করেছিল। ভাবতে লাগলাম। কয়েকজন প্রতিভাবান বন্ধুকেও ভাবতে বলেছিলাম, আমি কিন্তু ভাবতেই থাকলাম। যিনি ভাবতে উস্‌কে ছিলেন তিনি চলে গেলেন। আজ আমার বন্ধু বললেন যে ভীষ্মকে ক্ষমা করা হয়নি, তাই আমার মনে আবার নতুন করে কথাটা জেগে উঠল। উঠলেই বা কি হবে!

শরশয্যায় শুয়ে ভীষ্ম উপযুক্ত সময়ের আপক্ষা করছেন। যেমন-তেমন ভাবে, যখন তখন, যেখানে-সেখানে মরা ঠিক নয়। উচিত মুহূর্তে মরা উচিত। সাধারণ মানুষ দিনক্ষণ বিচার না করেই মরে যায়। ভীষ্ম এমন ছিলেন না। তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছিলেন। উচিত মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু চাইতেন না। যুধিষ্ঠির ফায়দা তুলল। সমস্ত শঙ্কা তাঁকে বলে ফেলল আর উত্তরও আদায় করল। আমার এক আদিগুরু শরশয্যার গল্প বলেছিলেন। তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল যে পিতামহ ভীষ্ম অনেক বাণের ফলায় শুয়েছিলেন। তাঁর বালিশও বাণের ফলা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। আমার বালকমন ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল। খাঁটি ব্রহ্মচারী হলেও বাণের ফলা নিশ্চয় বিঁধত। বেচারা বৃদ্ধ হয়তো পাশ ফিরতেও পারতেন না। যখন পাশ ফিরতেন, হয়তো বাণের ফলা বিঁধত। আর সেই অবস্থাতেই হয়তো যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়ে প্রশ্নমালা ঝরছিল। যদিও তিনি (যুধিষ্ঠির) দয়ালু ছিলেন, তবুও তখন যদি আর একটু দয়া দেখাতেন, তাহলে কি ক্ষতি হতো? যখন সেই দৃশ্যের কল্পনা করতাম আমার খুব কষ্ট হতো, কিন্তু অন্য ছেলেরা ব্রহ্মচর্যের মহিমা অনুভব করেই খুশি হতো। তাদের চোখে ব্রহ্মচারীর কাছে এতো কোনও কষ্টই নয়। তাঁর মহিমা আমি বুঝতাম, কিন্তু কেন জানি না আমার মনে খুব কষ্ট হতো। পরে আমায় বয়স্ক এক পণ্ডিত বলেছিলেন, খাগড়াকে 'শর' বলা হতো। তা দিয়েই বাণ তৈরি হতো। এইজন্যেই 'শরের' মানে বাণ হয়ে গেল। আসলে ভীষ্ম বাণের ফলার ওপরে নয় খাগড়ার মাদুরে শুয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা ঠিক হোক বা না হোক, ভীষ্ম শরশয্যায় অর্থাৎ খাগের মাদুরে শুয়েছিলেন, একথায় আমার বালকমন খুব শান্তি পেয়েছিল। যদিও জর্জর বৃদ্ধের জন্য এ-ও কম কঠোর শয্যা ছিল না, তবে হয়তো বেঁধার মতো ছিল না। সমর্থ পৌত্রেরা একটু ভালভাবেই তৈরি করিয়েছিল। যুধিষ্ঠির ভালই করেছিল যে তাঁকে কথায় ভুলিয়ে রেখেছিল, কিন্তু যখন যুধিষ্ঠির আর অন্যরা তাঁর বিশ্রামের জন্য তাকে ফেলে চলে যেত, তখন একান্তে এই বৃদ্ধ মনে কি ভাবতেন? কিছু তো ভাবতেনই। শ্রদ্ধাবানেরা বলবেন, তৎক্ষণাৎ হয়তো তিনি ব্রাহ্মীস্থিতিতে

চলে যেতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রাহ্মীস্থিতি পেয়ে গেলে কোনও মোহ হয় না। কিন্তু যাঁরা শ্রদ্ধায় এই সম্বল পান না, তাঁর, কী করবেন? তাঁদের মনে হয় ভীষ্মের মতো জ্ঞানীও হয়তো কিছু ভাবতেন।

গুরুদেব প্রশ্ন করেন যে ভীষ্মকে অবতার মানা হয় না কেন, আর আমার বন্ধু বলে যে ভীষ্মকে ক্ষমা করা হয়নি। দুটো কথার মানে কী এক? হয়তো ভীষ্মকে ক্ষমা করা হয়নি, সেজন্য তাঁকে অবতার মানা হয়নি। নিশ্চয় কিছু কারণ আছে। কোনও বিষয়ে ভারতবর্ষ মৌন থাকলে তারও মানে হয়। কেউই বলেনি যে অমুক-অমুক কারণে ভীষ্মকে অবতার মানা হয়নি আর অমুক-অমুক কারণে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার মানা হয়েছে। একজনকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়নি, কারণ তিনি তা ছিলেন না, আর একজনকে মানা হলো, কারণ আসলে তিনি তা ছিলেন। আমাদের মনীষীরা এই ভাবেই ভেবেছেন।

দিনকরজী মহানুভব ও উদার কবি ছিলেন। তাঁর কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশায় এটুকু বলাই যেতে পারে যে ভীষ্ম নিজের ব্যোম ভোলানাথ গুরু পরশুরামের চেয়ে বেশি ভারসাম্যময়, বিচারবান এবং জ্ঞানী ছিলেন। পুরোনো রেকর্ড এরকম কিছু ভাবতে বাধ্য করে। তবুও পরশুরাম দশ অবতারের একজন আর বেচারা ভীষ্ম এমন কোনও গৌরবই পেলেন না। কারণ কী হতে পারে?

একান্তে খাগড়ার চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে নিজের সম্পর্কে ভাবেননি? আমার মন বলে নিশ্চয় ভেবেছেন। ছেলেবেলায় ভীষ্ম বাবার ভুল আকাঙ্খাতৃপ্তির জন্যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— তিনি আজীবন বিয়ে করবেন না। অর্থ্যৎ এমন সম্ভাবনাই নষ্ট করে ফেলতে হবে যে তাঁর পুত্র হবে, আর সে বা তার সন্তান কুরুবংশের সিংহাসন দাবি করবে না। সত্যি ভীষণ প্রতিজ্ঞা ছিল। বলা হয় এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যেই তিনি 'দেবদত্ত' থেকে 'ভীষ্ম' হয়েছিলেন; যদিও চিত্রবীর্য ও বিচিত্রবীর্য পর্যন্ত কৌরব-রক্ত থেকে গিয়েছিল তবুও পরে বাস্তবিক কৌরব বংশ শেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু আইনত কৌরব বংশ চলছিল। জীবনের শেষ দিনগুলিতে ইতিহাস-মর্মজ্ঞ ভীষ্মের কি একথা কখনও খারাপ লাগেনি?

যদি একথা ভীষ্মের খারাপ না লেগে থাকে তবে তা আরও খারাপ হয়েছে। পরশুরাম যদিও জ্ঞান বিজ্ঞানের বোঝা বওয়ায় ভীষ্মের সমকক্ষ ছিলেন, কিন্তু সোজা কথা সোজাভাবে বোঝায় তাঁর থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনিও ব্রহ্মচারী ছিলেন, বালক-ব্রহ্মচারী কিন্তু ভীষ্ম যখন নিজের নির্বীর্য ভাইদের জন্যে কন্যাহরণ করে নিয়ে এলেন ও এক কন্যাকে অবিবাহিত থাকতে বাধ্য করলেন, তখন তিনি ভীষ্মের অশোভন কাজ ক্ষমা করেননি। বোঝানোতেও হলো না, যুদ্ধও করলেন। কিন্তু ভীষ্ম নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন। তিনি ভবিষ্যৎ চিনতে পারেননি, লোককল্যাণ বুঝতে পারেননি। অপহৃতা অপমানিত কন্যা পুড়ে মরল।

নারদও ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি সত্যের বিষয়ে অটল থাকার চাইতেও সবার মঙ্গল বা কল্যাণকে বেশি দরকারি মনে করেছেন—সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যদপি হিতং বদে্ত!

ভীষ্ম দ্বিতীয় পক্ষের উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি সত্যস্য বচনং-কে হিতের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেল। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এর উল্টো আচরণ করেছেন। 'প্রতিজ্ঞায় সতস্য বচনম্' অপেক্ষা 'হিতম্'-কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতীয় সামূহিক হৃদয় কি তাঁকে পূর্ণাবতার

স্বীকার করে নিয়ে এই দিকটাকেই মৌন সমর্থন দিয়েছে? একবার ভুলভাল যা বলে দিলেন, তার সঙ্গে চিটিয়ে যাওয়া 'ভীষণ' হতে পারে, হিতকারী নয়। ভীষ্ম 'ভীষণ'কেই বেছে নিয়েছিলেন।

দ্রৌপদীর অপমান দেখেও ভীষ্ম ও দ্রোণ দুজনেই চুপ ছিলেন কেন? ছেলেপুলের বাবা দ্রোণ অধ্যাপক ছিলেন। এত গরিব যে গরুও পুষতে পারতেন না। বেচারি ব্রাহ্মণ চাল ধোওয়া জল দিয়ে দুধ খেতে চাওয়া বাচ্চাকে ভোলাতেন। সেই অবস্থায় আবার ফিরে যাওয়ার সাহস খুব কম লোকেরই থাকে, কিন্তু ভীষ্ম তো পিতামহ ছিলেন। তাঁর তো ছেলেপুলের চিন্তাও ছিল না, ভীষ্মের কিসের পরোয়া ছিল? কল্পনা করা যেতে পারে, মহাভারতের গল্প যেভাবে পাওয়া যায়, তা তার পরের পরিবর্তিত রূপ। হয়তো পুরো গল্প যেমন ছিল, তেমন পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজকের মানুষকে আপনি যা খুশি বলুন, পুরোনো ঐতিহাসিকরা এত খারাপ ছিলেন না যে, পুরো ইতিহাসই উল্টে দেবেন। সুতরাং এই কল্পনাতেও ভীষ্মের নীরবতা বোঝা যায় না। এইটুকু সত্যি মনে হয় যে কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয়ে ভীষ্মের কোথাও কোনও দুর্বলতা ছিল। তিনি সঠিক সময়ে যথোচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। যদিও তিনি অনেক কিছু জানতেন, তবুও কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। তাঁকে অবতার না মানা ঠিকই হয়েছে। আজকালও, এমন বিদ্বান পাওয়া যাবে যাঁরা জানেন অনেক, করেন না কিছুই। যে করে সে ইতিহাস-নির্মাতা হয়, শুধুই ভাবতে থাকা লোকেরা ইতিহাসের ভয়ংকর রথচক্রের নিচে পিষে যায়। যে ভাবে আর ভাবনাকে কাজে পরিণত করে, সেই ইতিহাসের রথ চালায়।

চোদ্দ

একটি কুকুর ও একটি ময়না

আজ থেকে কয়েক বছর আগে গুরুদেব শান্তিনিকেতন ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। সম্ভবত এই জন্যেই অথবা জানা নেই অন্য কি কারণে ঠিক করলেন শ্রীনিকেতনের পুরোনো তিনতলা বাড়িতে কিছু দিন থাকবেন। হয়তো ভাল লাগার জন্যেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সব থেকে ওপরে থাকতেন। সেই সময়ে ওপরে ওঠার জন্যে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ছিল। বৃদ্ধ ও ক্ষীণকায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। তবুও অনেক কষ্টে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো।

তখন ছুটি। আশ্রমের অধিকাংশ লোকই বাইরে। একদিন সপরিবারে গিয়ে তাঁর 'দর্শন' করতে ইচ্ছা হলো। 'দর্শন'কে আমি বিশেষভাবে দর্শনীয় করে লিখছি, কারণ যখনই

গুরুদেবের কাছে যেতাম, মুচকি হেসে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দর্শনার্থী নাকি?' প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমি এমন বাংলায় কথা বলতাম যা হিন্দি প্রবাদের অনুবাদ হয়ে যেত। বাইরের কোনও অতিথিকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বলতাম, 'এক ভদ্রলোক আপনার দর্শনের জন্যে এসেছেন।' হিন্দি এমনভাবে বলা হলেও বাংলায় তা প্রচলিত নয়। এইজন্যে গুরুদেব হেসে ফেলতেন। পরে জানতে পেরেছিলাম যে আমার ভাষা খুবই কেতাবি আর, গুরুদেব 'দর্শন' শব্দটাই চেপে ধরেছিলেন। যখনই অসময়ে যেতাম, হেসে উনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'দর্শনার্থী নিয়ে এসেছ নাকি?' দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই যে নিজের দেশের দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকে এমন প্রগলভ হতো যে সময়-অসময় স্থান-অস্থান, অবস্থা-অনাবস্থার একদম খেয়াল করত না আর বারণ করলেও এসে হাজির হতো। এরকম দর্শনার্থীদের গুরুদেব ভয় পেতেন। ছেলেপুলে সমেত একদিন শ্রীনিকেতনে চলে গেলাম। অনেকদিন তাঁকে দেখিনি।

এখানে গুরুদেব খুব আনন্দে ছিলেন। শান্তিনিকেতনের মতো ভিড় ছিল না। আমরা যখন গেলাম, গুরুদেব বাইরে আরাম-কেদারায় বসে অস্তগামী সূর্যের দিকে ধ্যান স্তিমিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে হাসলেন, বাচ্চাদের সঙ্গে খুনসুটি করলেন, খোঁজ খবর নিয়ে চুপ করে থাকলেন, এমন সময়ে তাঁর কুকুর আস্তে আস্তে ওপরে এসে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। গুরুদেব তার পিঠে হাত বোলালেন। সে চোখ বুজে প্রাণভরে স্নেহরস অনুভব করতে লাগল। আমাদের দিকে তাকিয়ে গুরুদেব বললেন, 'দেখেছ, ইনি এসে গেছেন। কি করে জানল যে এখানে আছি, আশ্চর্য! এর চেহারায় কত তৃপ্তি দেখা যাচ্ছে, দেখ।'

আমরা সেই কুকুরের আনন্দ দেখছিলাম। কেউ তাকে রাস্তা চেনায়নি, কেউ তাকে বলেও নি যে তার স্নেহদাতা দু মাইল দূরে আছে, তা সত্ত্বেও সে পৌঁছে গেছে। এই কুকুরকে উদ্দেশ্য করেই 'আরোগ্য'-তে তিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন: 'প্রতিদিন প্রাতে এই ভক্ত কুকুর স্তব্ধ হয়ে আসনের কাছে ততক্ষণ বসে থাকে যতক্ষণ নিজের হাতের ছোঁয়ার তার উপস্থিতি মেনে নিই নি। এইটুকু স্বীকৃতি পেলেই সমস্ত শরীরে আনন্দের প্রবাহ বয়ে যায়। বোবা প্রাণীলোকে এই একমাত্র জীব যে ভালমন্দ সব কিছু ছিন্ন করে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতাকে দেখতে পেয়েছে, প্রাণময় করতে পেরেছে, যার মধ্যে অহৈতিক প্রেম ঢেলে দেয়া সম্ভব, যার চেতনায় অসীম চৈতন্যালোকের পথ খুঁজে পাওয়া যায়, যখন এই মূক হৃদয়ের প্রাণভরা আত্মনিবেদন দেখি, যার মধ্য দিয়ে সে নিজের দৈন্যকেই প্রকাশ করে, তখন ভাবতে পারি না যে সে নিজের সহজ বোধে মানব স্বরূপকে অমূল্যতায় আবিষ্কার করেছে, তার ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা দিয়ে যা কিছু সে বোঝে, তা আমাকে বোঝাতে পার না বটে তবে সেই দৃষ্টি দিয়ে আমায় সে মানুষের সত্য পরিচয়টুকু বুঝিয়ে দেয়।' এভাবেই কবির মর্মভেদী দৃষ্টি ভাষাহীন এই প্রাণীর করুণ দৃষ্টির ভেতর দিয়ে সেই বিশাল মানব সত্যকে দেখেছে, যা কিনা মানুষ মানুষের ভেতরেও দেখতে পায় না।

আমি যখন এই কবিতা পড়ি তখন আমার সামনে শ্রীনিকেতনে তিনতলার সেই ঘটনা ভেসে ওঠে। চোখ বুজে অপরিসীম আনন্দ, সেই 'মূক হৃদয়ের প্রাণভরা আত্মনিবেদন' মূর্ত হয়ে ওঠে। সেদিন আমার কাছে ঘটনাটি ছোট্ট ছিল, আজ বিশ্বের অনেক গৌরবময় ঘটনার

একটি হয়ে গেছে। আশ্চর্য হলো, এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন গুরুদেবের চিতাভস্ম কলকাতা থেকে আশ্রমে নিয়ে আসা হলো, সেই কুকুরটি আশ্রমের দরজা পর্যন্ত এসেছিল আর শান্ত গম্ভীরভাবে চিতাভস্মের সঙ্গে, অন্যান্য আশ্রমবাসীর সঙ্গে উত্তরায়ণ পর্যন্ত গেল। সবার সামনে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে চিতাভস্ম কলসের কাছে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেও ছিল।

আরও কিছু আগের ঘটনা মনে পড়ছে। শান্তিনিকেতনে তখন নতুন এসেছি। গুরুদেবের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠিনি। তখন সকালে নিজের বাগানে গুরুদেব প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। একদিন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আরও একজন পুরোনো অধ্যাপক ছিলেন, আসলে সত্যি কথা হলো তিনিই আমকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রতিটি ফুলপাতা দেখতে দেখতে গুরুদেব বাগানে বেড়াচ্ছিলেন আর সেই অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি চুপচাপ শুনছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে গুরুদেব বললেন, 'আচ্ছা ভাই, আশ্রমে কাকেদের কি হলো? তাদের আওয়াজ শোনাই যায় না।' আমার সঙ্গী অধ্যাপকের না কিছু জানা ছিল, না আমার। পরে আমি লক্ষ করেছিলাম যে কিছুদিন ধরে আশ্রমে সত্যিই কাক দেখা যাচ্ছে না। তখনও পর্যন্ত কাককে আমি সর্বব্যাপক পাখি ভাবতাম। হঠাৎ সেদিন জানলাম যে এই ভালোমানুষেরা কখনও কখনও প্রবাসে চলে যায় বা চলে যেতে বাধ্য হয়। একজন লেখক আধুনিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে কাকের উপমা দিয়েছেন: মিশচিফ ফর মিশচিফ সেক (দুষ্টুমির জন্যই দুষ্টুমি)।

আরও একবার সকালে গুরুদেবের কাছে ছিলাম। সেই সময় একটা ল্যাংড়া ময়না লাফাচ্ছিল। গুরুদেব বললেন, 'দেখেছো এটা দলছাড়া! এখানে এসে রোজ লাফায়। এর চালে করুণভাব দেখতে পাই।' গুরুদেব যদি বলে না দিতেন তবে আমি ওর করুণভাব একদম দেখতে পেতাম না। আমার ধারণা ছিল যে ময়না করুণভাব দেখানোর পাখিই নয়। সে অন্যাকে অনুকম্পা দেখায়। তিন চার বছর একট নতুন বাড়িতে থাকছি। বাড়ির মালিক দেয়ালের চারদিকে একটা করে গর্ত করে রেখেছে। কোনও আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিপদের সমাধান হবে হয়তো। প্রতিবছর এক একটা ময়না দম্পতি নিয়মিত এখানে সংসার পাতে। খড় কুটো আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো গাদা জমা করে ব্যাটারা গোবর পর্যন্ত নিয়ে আসতে ভোলে না। বিরক্ত হয়ে ইঁট দিয়ে গর্ত বোঝাই, কিন্তু তারা পড়ে থাকা ফাঁকা জায়গাই কাজে লাগায়। স্বামী-স্ত্রী যখন একটা তৃণ নিয়ে গর্তে থাকে তখন দেখার মতো! স্ত্রীরত্নের তো তুলনা নেই! একটা তৃণ নিয়ে এসে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাপটাল, নিজের পা দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে নিল আর নানারকম মিষ্টি ও বিজয়োদ্‌ঘোষী শব্দে গান শুরু করে দিল! সে তো আমাদের কোনও পরোয়াই করে না। এমন সময় পতিদেব হঠাৎ যদি কোনও কাগজ বা গোবরের টুকরো নিয়ে হাজির হয়, তাহলে দেখার মতো হয়। দুজনের নাচ গানে আর আনন্দনৃত্যে সারা ঘর মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপরেই পত্নীদেবী আমাদের দিকে একটু তাকিয়ে বেপরোয়াভাবে কিছু বলে ওঠে। পতিদেবও যেন একটু হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে কিছু রিমার্ক করে আর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পাখির ভাষা তো আর জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাদের মধ্যে কিছুটা এইরকম কথাবার্তা হয়ে থাকে :

পত্নী— এরা এখানে কি ভাবে এলো গো?

পতি— উঁহু! বেচারারা এসে গেছে, থাকতে দাও, কি আর করবে?

পত্নী— তবুও, এদের খেয়াল থাকা উচিত যে এটা আমাদের প্রাইভেট ঘর।

পতি— মানুষ যে, এত বুদ্ধি কোথায়?

পত্নী— থাকগে।

পতি— ঠিক আছে।

আমার বিশ্বাস হয়নি যে ময়না কখনও করুণ হতে পারে। গুরুদেবের কথায়, খুব মন দিয়ে দেখার পর জানলাম যে সত্যিই তার মুখে করুণ ভাব আছে। সে হয়তো বিধুর স্বামী ছিল, গত স্বয়ংবর সভায় যুদ্ধে যে আহত আর পরাস্ত হয়েছিল। অথবা বিধবা স্ত্রী হতে পারে, যে বিড়ালের গত আক্রমণের সময় স্বামী হারিয়ে, যুদ্ধে সামান্য চোট পেয়ে একান্তে বিহার করছে, হায়, এমন দশা কেন হয়? এই ময়নাকে লক্ষ করেই হয়তো গুরুদেব পরে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার কিছু অংশের সার এইরকম:

'সেই ময়নার কি হয়েছে, তাই ভাবি। কেন সে দলছাড়ার হয়ে আলাদা থাকে? আমার বাগানে শিমূল গাছের নিচে প্রথম দিন দেখেছিলাম, মনে হচ্ছিল ল্যাংড়াচ্ছে। তারপর রোজ তাকে দেখি সঙ্গীহীন হয়ে পোকা শিকার করে বেড়ায়। বারান্দায় উঠে আসে। নেচে নেচে হাঁটাচলা করে, আমায় একটুও ভয় পায় না। এর এমন দশা কেন? সমাজের কোন শাস্তিতে তার নির্বাসন হয়েছে? দলের কোন অবিচারে সে অভিমান করেছে। একটু দূরে অন্য ময়নারা বকবক করছে, ঘাসে লাফালাফি করছে, শিরীষ শাখায় উড়ে বেড়াচ্ছে। এ বেচারির এমন কোনও শোক নেই। ভাবি, এর জীবনে কোথায় জট পাকিয়ে আছে। যেন সকালের রৌদ্রে সহজ মনে খাবার খুঁটতে-খুঁটতে সারা দিন ঝরা পাতার ওপর লাফিয়ে বেড়ায়। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আছে বলে মনেই হয় না। এর চালে বৈরাগ্যের গর্বও নেই, আগুনের মতো জ্বলন্ত দুটি চোখও দেখা যায় না।' ইত্যাদি।

যখন এই কবিতা পড়ি তখন চোখের সামনে সেই ময়নার চেহারা ভেসে ওঠে ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে কি করে তাকে দেখেও দেখিনি আর কীভাবে কবির দৃষ্টি এই বেচারির মর্মস্থলে পৌঁছেছিল। একদিন সেই ময়না উড়ে গেল। বিকেলবেলা কবি তাকে দেখেননি: 'যখন সে একা যায় সেই ডালের কোণে, যখন অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ করে, হাওয়ায় বাঁশপাতা করে সন্‌সন্‌, ঘুম ভাঙানো সন্ধ্যাতারা গাছের ফাঁকে ডাকে। কত করুণ তার হারিয়ে যাওয়া।'

পনেরো

ব্যোমকেশ শাস্ত্রী ওরফে হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী

ঘটনা অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। জড়িত লোকেরাও প্রায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। যারা আছেন তারা খারাপ মনে করবেন না, এইজন্যে আজ বলে ফেলার ইচ্ছা হলো।

প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা। শান্তিনিকেতন থেকে কাশী এসেছিলাম। মহানুভব মালব্যজি 'সনাতন ধর্ম' নামক পত্রিকা বার করতেন। আমার সহযোগী বন্ধু পণ্ডিত (এখন ডক্টরেট) ভুবনেশ্বর মিশ্র 'মাধব' তার সম্পাদনা করতেন। কাশী এসে মাধবজির সঙ্গে দেখা না করে কি ভাবে চলে যেতে পারি! অনেক দিন পর দুজনের দেখা হয়েছিল। অনেকক্ষণ কথাবর্তা হলো, ঠাট্টা ইয়ার্কিও চলল। যেতে যেতে মাধবজি বললেন, 'সনাতন ধর্ম-এর জন্য কিছু লিখুন না।' আমি মেনে নিলাম। শান্তিনিকেতনে ফিরে মাধবজির আজ্ঞা পালন করা দরকার মনে হলো, কিন্তু কি লিখব? 'সনাতন ধর্ম-এর যোগ্য কি লিখতে পারি? আমি বুঝেছিলাম যে ধর্মোপদেশ দেওয়া আমার কাজ নয়। জ্যোতিষের নেশা তখনও কাটেনি, ভাবলাম পঞ্জিকা বিষয়েই লিখে ফেলি। 'সনাতন ধর্মে' এর খুবই গুরুত্ব আছে। প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। নাম মনে নেই। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বপঞ্জিকার কথা এসে গিয়েছিল। এই পঞ্জিকা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হতো। সম্পাদকদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নামও ছিল। মহাদেবতুল্য ভ্রমণকারী আমার গুরু পণ্ডিত রামরত্ন ওঝার নামও ছিল। কোনও সময়ে আমিও এ বিষয়ে কিছু কাজ করেছিলাম। সেই গণনাপদ্ধতি যাকে আমার গুরু 'দৃশ্যাদৃশ্যবাদ' বলতেন, একেবারেই পছন্দ করতাম না। গুরুজির সঙ্গে কয়েকবার তর্ক করার ধৃষ্টতাও করেছিলাম। কিন্তু তিনি ভোজপুরি ভাষায় 'অবহি সমুঝত নই খে, বাদ মেঁ সমুঝি যইবে' (এখন বুঝছ না, পরে ঠ্যালা বুঝবে) বলে হেসে ফেলতেন, তাঁর স্নেহভরা কথায় নিরুত্তর হয়ে যেতাম। এবার গুরুজির নাম না নিয়ে তাঁর মতের আলোচনা করে ফেললাম। খুবই উৎসাহ নিয়ে প্রবন্ধ লিখলাম কিন্তু পাঠাবার সময় মনে ভয় হলো। গুরুজী পড়লে কি বলবেন? আবার ভাবলাম উনি তো জানেনই; খুব বেশি হলে বকাঝকা করবেন। তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া তো খুবই সহজ। কিন্তু আসল কথা বলে ফেলা উচিত। তখন নতুন উৎসাহ ছিল, ভাবতাম, আমি যা সত্য মনে করি সেটিই সমস্ত পৃথিবীর সত্য। অনেক পরে গুরুজির কথা বুঝতে পেরেছিলাম। বলেছিলেন 'পরে ঠ্যালা বুঝবে', এখন অল্প অল্প বুঝতে পারছি। প্রবন্ধ লেখা হয়ে গিয়েছিল, ছাপাও উচিত। পাঠানো ঠিক করলাম। লেখকের নাম দিলাম: ব্যোমকেশ শাস্ত্রী, নাম ঠিকানা কিচ্ছু নেই। এতো মাধবজিকেও চকমা দেওয়ার চেষ্টা। খুশি হলাম যে কেউ জানতে পারল না, ওদিকে বিধাতা কুটিল হাসি হাসছিলেন, 'লুকোচ্ছ? লুকোনো কি এত সহজ।'

পরের ঘটনা খুবই মজার। একদিন ব্যোমকেশ শাস্ত্রীর ঠিকানা খুঁজতে-খুঁজতে শান্তিনিকেতনের পিওন বিশাল এক প্যাকেট (রেজিস্টার্ড পার্শেল) নিয়ে আমার কাছে

হাজির হলো। বললাম, 'এখানেই থাকে, দিয়ে যাও।' পার্শেল নিয়ে নিলাম। ব্যোমকেশ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম 'সনাতন ধর্ম'-এ অবতরিত হয়েছে। তার নামে এত ভারি পুঁথি কোথা থেকে এলো? উৎসাহ নিয়ে বান্ডিল খুললাম। মোটা পুঁথি ছিল। ইন্দোর পঞ্জিকা সমিতির রিপোর্ট, খুবই কাজের বই। বইটি আজও আমি কাজে লাগাই। ছোট ছোট আরও কিছু বই ছিল আর সঙ্গে প্রসিদ্ধ পঞ্জিকানির্মাতা পণ্ডিত দীননাথ শাস্ত্রীর চুলেট-এর চিঠি। তিনি ইন্দোর মহারাজের জ্যোতিষী ছিলেন আর ওখান থেকেই পঞ্জিকা বার করতেন। একবার তার সঙ্গে দেখাও করেছি। ব্যোমকেশ শাস্ত্রীকে সম্বোধন করে লিখেছেন, 'সনাতন ধর্ম'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়ে তিনি খুব প্রভাবিত হয়েছেন। তাতে যে মত প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে তিনি একমত। ইন্দোরে নিখিল ভারত জ্যোতিষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতিত্ব করবেন। পঞ্জিকা সমিতি দেশের সমস্ত পঞ্জিকা রচয়িতাদের নিমন্ত্রণ করেছে। সারা ভারতে একই পদ্ধতিতে পঞ্জিকা রচনার রাস্তা খুঁজে বার করাই এর উদ্দেশ্য। এগারোজন নিয়ে নির্ণায়ক সমিতি করা হয়েছে, বাংলার প্রতিনিধিরূপে ব্যোমকেশ শাস্ত্রীকে রাখা হয়েছে। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পণ্ডিত দীননাথ শাস্ত্রী যাওয়ার জন্যে লিখেছেন।

আমি তো হয়রান। মালব্য মহাশয় সভাপতি, নিজের নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে পঞ্জিকা রচয়িতা বিদ্বানদের মধ্যে গুরুজিও থাকবেন আর বিচারকমণ্ডলীতে সিদ্ধান্ত শোনাবার জন্যে এই অপদার্থ ব্যোমকেশ শাস্ত্রী বিরাজমান থাকবে। এরকম অঘটন কখনও ঘটেছে কি? নিশ্চয় মাধবজি হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন। কিন্তু পরে জানতে পেরেছিলাম, ব্যোমকেশ শাস্ত্রী আর হজারিপ্রসাদ দ্বিবেদি যে একই লোক তা তিনি চিনতে পারেননি। বুকপোস্টে শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ছাপ দেখে ভেবেছিলেন যে দীননাথ শাস্ত্রী নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনের কোনও মহাপণ্ডিত। আমি চিন্তায় পড়লাম। মালব্যজি জেনে যাবেন, গুরুজিও জেনে যাবেন যে তাঁরই পত্রিকায়, তাঁরই ঘরের ছেলে তাঁরই আলোচনা করেছে। হায়, ধরণী দ্বিধা হয় না কেন? বড় গ্লানি হলো। পণ্ডিত দীননাথ শাস্ত্রীকে সত্যি কথা লিখে জানালাম—'আমি বাংলার প্রতিনিধি হতে পারি না, আমি ব্যোমকেশ শাস্ত্রী নয়, ঠুঁটো হজারীপ্রসাদ। আমাকে ডাকবেন না। কোনও বৃদ্ধ বিদ্বান নির্ণায়ক হলে ভাল দেখাবে। আমি কি করে নির্ণায়ক হতে পারি।' আমার নাম জেনে পণ্ডিত দীননাথ শাস্ত্রী আরও খুশি হলেন। জানালেন, 'তোমাকে আমি ছাড়ব না। সত্য বলতে ভয় পাও? কেমন যুবক?' যুবক হওয়াটাই দোষ। সারাদিন চিন্তায় কাটালাম। কি করে অস্বীকার করি যে সত্যি কথা বলতে যুবকদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। সারা দেশ উত্তাল ছিল। সেই সময় এত যুবক স্তুতি লেখা হয়েছে যা আর কখনও হয়তো হয়নি। সব ছেড়ে তারা বেরিয়ে পড়ে, হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে, তাদের রক্তে ধরা পবিত্র হয়, আরও কত কি! শাস্ত্রীজিকে লিখলাম, 'নিশ্চয় যাব। সত্য বলায় ভয় কিসের?' শাস্ত্রীজি খুশি হলেন। এদিকে নাড়ি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম। নির্ণায়ক সমিতিতে ব্যোমকেশ শাস্ত্রীর হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর নাম ছাপা হলো। চলো, দেখা যাবে।

সম্মেলনের দিন যত এগিয়ে এলো, ধুকপুকুনি বাড়তে লাগল। গুরুজি কি বলবেন, মালব্যজি কী ভাববেন?

ইন্দোর যাওয়ার দুদিন আগে আমার ছটফটানি বেড়ে গেল। সকাল ন টায় খুব ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। হঠাৎ মনে এলো, গুরুদেবের পরামর্শ নেওয়া যাক। বেরিয়ে পড়লাম। তাঁর দরজায় গিয়ে থামলাম। তিনি উত্তরায়ণের বারান্দায় চুপচাপ একা বসে ছিলেন। আমাকে দেখেই স্নেহসিক্ত গলায় বললেন, 'এসো'। এত তাড়াতাড়ি দেখা পাওয়ার আশায় আসিনি। প্রণাম করে একদিকে বসে পড়লাম। স্নেহভরে তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'চিন্তিত মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার?' এখন ভাবনাচিন্তার কোনও সুযোগ ছিল না। হুবহু সমস্ত কথা জানালাম। নিজের সমস্ত দ্বিধা ও সংকোচের কথাও বললাম এবং কেতাবি বাংলায় ছোট করে বললাম, 'মুর্খতার জন্যে ধর্ম-সংকট তৈরি করে ফেলেছি, এখন আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। যাওয়া ঠিক হবে কি? যাওয়ার কথা দিয়ে ফেলেছি।' জানি না কি দেখলেন। তারপর সহজভাবে বললেন, 'যেয়ো না। সত্যের প্রতি তোমার যতটা আস্থা হাছে, তার থেকেও বেশি ভয় আর সংকোচ আছে। ভয় আর সংকোচ তোমাকে সত্যের পক্ষ নিতে দেবে না।' আমি শিউরে উঠলাম। হাত জোড় করে চুপচাপ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, 'সত্য অনেক বড় মাশুল চায়। নিজের নাম লুকিয়ে তুমি ভুল রাস্তায় গেছ। দেখ, কারও প্রতিকূল কোনও আলোচনা করতে হলে নাম লুকোবে না। নাঁম লুকোনো প্রথম দুর্বলতা। তারপর সে আরও অনেক দুর্বলতা ডেকে আনে। নাম লুকোনোয় সত্যকে লুকোনো হয়।'

আমার মনে হলো গুরুদেব আমার ভেতর পর্যন্ত আঘাত করেছেন। তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করে, তাঁর দিকে না তাকিয়েই বললাম: 'তাহলে এই আদেশ?' উত্তর পেলাম 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ'। আমি উঠছিলাম এমন সময় জোরে বললেন, 'বসো।' বসতে হলো, তারপর পণ্ডিতজি সম্পর্কে কি লিখেছি জানতে চাইলেন আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করলেন। মনে হলো আমার ক্ষতে উনি অমৃত লাগাবার চেষ্টা করছেন। বড় কোমল মনের মানুষ ছিলেন। বললেন, 'ভাল লাগছে যে তুমি সঠিক ভেবেছ। কিন্তু ভয় পেয়ো না। যা সঠিক মনে করেছ, খোলাখুলি বলো। ভল করেছ জানতে পারলে, তক্ষুনি শুধরে নাও। সত্য পুরো মূল্য চায়।'

গুরুদেব ওখান থেকে ফিরে তার পাঠালাম, 'আসতে পারব না। ক্ষমা করবেন।'

কথা শেষ হলো। মনের বোঝা হাল্কা হলো। আর একটা এখনও বাকি ছিল। গুরুজি তো জেনেই গেছেন, কি ভাবছেন? ভাবলাম ক্ষমা চেয়ে নিই। খসড়া লিখলাম, কাটাকুটি করলাম, আবার লিখলাম। কিন্তু ঠিক হচ্ছিল না। এর মধ্যে গুরুজির চিঠি এলো। লিখেছেন, 'তুই ইন্দোর কেন এলি না? যেদিন তোকে নির্ণায়কের আসনে দেখতাম, সেদিন আমার বিদ্যা সফল হয়েছে মনে করতাম।'

চোখে জল এসে গেল। আমি এত মহান গুরুর শিষ্য। হাঁফাতে-হাঁফাতে আবার গুরুদেবের কাছে গেলাম। চিঠি দেখালাম। তিনিও খুব আনন্দ পেলেন। বললেন, 'তোমার গুরুই খাঁটি গুরু। তাঁর মহত্ত্ব দেখে আমি মুগ্ধ।' আমার মনে হলো কোনও যাদু বলে আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। আমার দুই খাঁটি গুরু আজ ইহলোকে নেই। ভাবি—'আমার মতো এমন গুরুর শিষ্যত্ব পাওয়ার ভাগ্য কজনের হয়।'

ষোলো

আমার জন্মভূমি

সাহিত্যচর্চার জন্য যে গ্রামে বসে আছি, তার নাম ওঝবলিয়া। আমার জন্মভূমি। এই গ্রামের আর এক অংশকে 'আরত-দুবের-ছাপরা' বলা হয়। আসলে এটাই আমার জন্মভূমি, কিন্তু সবসময় এই গ্রামেরই অংশ ছিল। আরত দুবে আমারই পূর্বপুরুষ ছিলেন। তিনিই এই ছোট্ট অংশ আবাদ করেছিলেন, বলিয়া গ্রামের মালিক ওলারা তাঁকে অল্প কিছু জমি বসবাসের জন্য দিয়েছিলেন। এখন দুটি অংশই এক হয়ে গেছে। এইজন্য 'অবলি' পল্লি আর 'ছাপরা'— শব্দ দুটো সবসময় গ্রামের নামের সঙ্গে জুড়ে থাকে। ছাপরার ঐতিহ্য পূর্বে ছাপরা পর্যন্ত আর 'অবলি' গ্রামের ঐতিহ্য পশ্চিমে বলিয়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। ভাগ্যবশত আমার গ্রাম ছাপরা আর অবলীকে যুক্ত করেছে। এই ভূভাগের চিরন্তন ইতিহাস আমার কাছে এই শব্দদুটি দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে বলিয়া আর ছাপরা শহরের মধ্যবর্তী ভূভাগকে গঙ্গা আর সরযূর মতো দুটি মহানদীর কোপ বারবার সইতে হয়েছে। প্রত্যেক বছর গঙ্গার বন্যায় ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় গ্রামের অধিকাংশ ঘর খড়ের চালায় তৈরি। বন্যার জন্যেই বহু গ্রাম চাক বেঁধে একই জায়গায় গড়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। যে কোনও পর্যবেক্ষক এই গ্রামগুলির অবলি লক্ষ করতে পারে। ভাঙাগড়াই এই ভূভাগের ইতিহাস। সেজন্যে এখানকার নিবাসীদের মধ্যে একরকমের 'কুছ পরোয়া নেই' ভাব দেখা যায়। এদের চেহারায় আজব রকমের 'মস্তি' আর নির্ভয় ভাব দেখা যায়। বিপদের চপেটাঘাতে সহজেই চেহারা শুকিয়ে যায় না। বিপদের মধ্যেও রাস্তা বের করে নেওয়া এদের স্বভাব। ইতিহাসের এই রকম ঐতিহ্যই এরা পেয়েছে। তাই গঙ্গার দুই তীরে কয়েক মাইল পর্যন্ত এখানে না কোনও পুরাতাত্ত্বিক অবশিষ্ট বেঁচে আছে অথবা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের প্রলুব্ধ করার মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী আছে। ছাত্রজীবনে যখন হিন্দি বা সংস্কৃতির ইতিহাস পড়তাম তখন আশ্চর্য হয়ে আর লোভ নিয়ে দেখতাম যে আমাদের এই ভূভাগের কোন চর্চাই তাতে নেই। কিন্তু, মজার কথা হল, এই মাটিতে সংস্কৃতের এত বিদ্বান জন্ম নিয়েছেন যে অনেক গ্রাম 'লুহরি কাশি' (ছোট কাশি) হওয়ার দাবি করে। ঠিকই করে। আমার গ্রামের একটু দূরে 'ছাতা' নামের একটা গ্রাম আছ। তাকে এখানে 'লুহরি কাশি' বলে। অনেক দিন আমার মনে ক্ষোভ ছিল, ভাবতাম বিদ্বতপ্রসবা এই মাটির কি সাহিত্যে কোনও অবদান নেই। হঠাৎ আজ সাহিত্যচর্চার সুযোগ পেয়ে আমার মনে শ্রাবণের মেঘের মতো সেই ক্ষোভ গুমরতে লাগল। এই ভূভাগ কি সবসময় উপেক্ষিত? বুদ্ধদেব যেখানে যেখানে গেছেন, তার মানচিত্র তৈরি করলে নিসন্দেহে বলা যায় হয়তো এখানে তাঁর পদার্পণ হয়েছিল, কিন্তু প্রমাণ কোথায়? স্কন্দগুপ্তের বিশাল বাহিনী ভেতরের গ্রাম দিয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই মাটিতে তিনি কোনও না কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ কোথায়? কুমারজীবের বাবা নিসন্দেহে এখানকার নবরত্ন ছিলেন কিন্তু কি করে বলব যে তিনি কোন গ্রামে থাকতেন? কালিদাস যখন গঙ্গা আর সরযূর জল-সন্নিপাতে ধোয়া ভূমির শোভা দেখতে

বেরিয়েছিলন, তখন কি উড়ে গিয়েছিলেন? নিঃসন্দেহে এই গ্রামের কোথাও না কোথাও থেকে ছিলেন। হয়তো রঘুবংশের গুরুত্বপূর্ণ সর্গের কোনও অংশ এখানেই লেখা হয়েছিল, কিন্তু আমার কথা কে বিশ্বাস করে? সাহিত্যচর্চার সুযোগ পেয়ে যতটা খুশি হওয়ার কথা ততটা নই। ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাসে আমাদের এই ভূভাগের কীই বা গুরুত্ব হবে।

ভালই ভাবুন বা খারাপ, আমার ভেতরে একটা গুণ আছে, তাকে আপনারা বালি থেকে তেল বার করা ভাববেন। সত্যিই বালি থেকে তেল বার করা চেষ্টা করি। হ্যাঁ সে বালি আমার পছন্দের হতে হবে। নিজের জন্মভূমিকে ভালবাসি একথা লুকোলেও লুকোনো থাকে না—'প্রেমের কথায় সখি থাকে কি লাজ, তাই বাঁধলে জালে কেমনে পড়বে বাঁধা জল?' আমার মতে, কিছু বড় বড় ব্যক্তির উদ্ভব আর বিলয়ে লেখাজোখাই ইতিহাসের সাহিত্য নয়। মানুষের ধারাবাহিক জীবনের সারভূত রস প্রবাহই জীবন। আমাদের গ্রামে যে জাতির বসবাস, তা কোনও ভাঙাচোরা অট্টালিকা বা ঢিবির চেয়ে কম নয় বরং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই ছোট্ট গ্রামে ভারতবর্ষের অনেক বড় সাংস্কৃতিক ইতিহাস পড়া যেতে পারে। লোক ব্রাহ্মণদের অনেক কথার জানে (যদিও কম লোকেই জানে যে তারা কত কম জানে)। আমার গ্রামে ভুজার ব্যবসা করা 'কাঁদু' জাতি আছে, যা সংস্কৃত 'কান্দবিক' শব্দের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন নিবন্ধে পড়েছি যে গুপ্ত সম্রাটরা এদের বৈশ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। মজার একটা কথা বলি। খুব ভাল এক বাঙালি পণ্ডিত শিল্প সম্পর্কিত একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ে দশ-বারো পাতায় 'কন্দু-পক্ক' অন্নের শিল্প বিবেচনা করা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কন্দু-পক্ক অন্ন স্পর্শদোষে দূষিত হয় না। অনেক অভিধান আর স্মৃতির শ্লোক উদ্ধৃত করে সেই বাঙালি পণ্ডিত প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে কন্দু-পক্ক অন্ন পাঁউরুটির মতো কোনও জিনিস। তিনি যদি আমাদের গ্রামে আসতেন তাহলে ভুল জিনিস সত্য প্রমাণিত করার দরকার হতো না। কন্দু এই কাঁদুদের ভাঁড়কে বলা হয়। কে না জানে, যে ভুজাওলাদের ভাজা জিনিস স্পর্শদোষ মুক্ত হয়। যে পণ্ডিতমশায়ের কথা বলছি, আমি তাঁর পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির ভক্ত আর আমার গ্রাম এত বড় পণ্ডিতের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারত জেনে সামান্য গর্ব হচ্ছে।

এছাড়া, আমাদের গ্রামে কালোয়ার বা প্রাচীন কল্যপালদের বসতি আছে, তারা একদম ভুলে গছে যে তাদের পূর্বপুরুষ কখনও রাজপুত সৈনিক ছিল। আর সৈন্যদলের পেছনে থেকে 'কল্যবর্ত' বা 'কলেউ' (খাবার) রক্ষা করত। জানি না কোন যুগে এরা দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়েছিল আর এখন পুরো 'বেনে' হয়ে গেছে। এরা কি পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোনও ইট পাথর থেকে কম মূল্যবান? আমার গ্রামে বেনে জাতির আরও অনেক লোক আছে। তাদের ঐতিহ্যের কথা শোনানোর সময় রাসেল সাহেবের সেই কথা মনে পড়বেই। তিনি বলেছেন মধ্যপ্রাচ্যে এমন কোনও বেনে জাতি তিনি পাননি যাদের ঐতিহ্য কোনও না কোনও রাজপুত বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আমাদের গ্রামের ঐতিহ্য সে কথার সমর্থন করে।

এখানে তুরহা নামের আর এক জাতি বাস করে। জাতি তালিকায় এদের নাম তো পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও নৃতত্ত্ববিদের লেখায় এদের কথা পড়িনি। আমার অনুমান যে এরা আর্য ও গোন্ডোদের মিশ্রণের একটি অংশ। নৃতত্ত্বের ছাত্ররা এদের নিজের পড়াশোনার

উপযোগী বিষয় করতে পারে। নিজের গ্রামের ধোপাদের নাচগানে আমার ভুলে যাওয়া কোনও বড় ঐতিহ্য মনে পড়ে।

জোলা আমার গ্রামের সবচেয়ে মনোরঞ্জক জাতি। এদের পুরোহিত আমার গ্রামে আছে। আমার 'কবীর' বইতে জোলাদের সঙ্গে নাথ পরম্পরার যোগাযোগের কথা বলেছি। সেখানে আমার গ্রামেরই একটি মজার কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। জোলাদের পুরোহিতকে এখানে 'সাঁই বলা হয়। সাঁই মানে স্বামী। নাথ পরম্পরায় গুরুকে 'নাথ' বা 'স্বামী' বলা হতো। 'গোরখবাণী'তে গোরখনাথ মচ্ছেন্দরনাথকে সাঁই বলে সম্বোধন করেছেন। এখন এরা পুরোপুরি মুসলমান হয়ে গেছে। নামের মধ্যে তারা কেবল পুরোনো স্মৃতি বয়ে চলেছে। আমাদের গ্রামে শাকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণও খুব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক জাতি। শক-দ্বীপ সম্ভবত আধুনিক মগডিয়ানা, যেখানকার 'মগী'-রা সারা পৃথিবীতে তন্ত্র-মন্ত্রের জন্যে বিখ্যাত। শুনেছি, ওল্ড টেস্টামেন্টেও এদের কথা আছে। ইংরিজি 'ম্যাজিক' শব্দেও মগেদের স্মৃতি রয়ে গেছে। এরা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে। আসল কথা হলো যে এরা যেখানেই গেছে সেখানেই আদর ও সম্মান পেয়েছে। এখনও এরা সুসংস্কৃত ও চতুর।

আমার গ্রামে 'দুসাধ' নামে অন্ত্যজ জাতি আছে, আদবকায়দা দেখে কেউ এদের অন্ত্যজ বলতে পারবে না। ইংরেজরা যখন এদেশে রাজ্যস্থাপনা করতে সক্ষম হলো তখন কিছু অত্যন্ত দুর্দান্ত জাতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। উত্তর ভারতে আহির দুসাধ ও বাংলার ডোমেরা খুব লড়াকু ছিল তারা আইন মানতে অস্বীকার করত। চৌকিদারের কাজ দিয়ে চতুর ইংরেজরা এদের বশ করেছিল। লোহা দিয়ে লোহা কাটার নীতিতে ইংরাজের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আহিরদের ওপর অনেক গবেষণা হয়েছে। কোনও সময়ে অনেক অঞ্চলে এই দুর্দান্ত জাতির রাজ্য ছিল বলে জানা যায়। বাংলার ডোমেরা সহজিয়া বৌদ্ধ ছিল ও কোনও এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যের অধীশ্বর ছিল। অধিকার বঞ্চিত হওয়ার পরই এরা দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল। দুসাধদের পুরোনো ইতিহাস আমার জানা নেই, কিন্তু নিঃসন্দেহে এরা অধিকারচ্যুত কোনও বড় জাতির ভগ্নাবশেষ। আমার গ্রামের দুসাধরা বড় বীর, বিনয়ী এমং ভদ্র। বর্তমানে এরা নিজেদের দুঃশাসনের বংশধর বলে। রাহুবাবা এদের দেবতা। কখনও কখনও ভাবি যে হিন্দু গ্রহমগুলে যে রাহুদেবতা আছে তা এদের অবদান নয় তো! এটা নিশ্চিত যে রাহু বৈদিক দেবতা নন। আজকাল রাহুর নামে প্রচলিত বৈদিক মন্ত্রে (কাণ্ডত্ কাণ্ডং প্ররোহন্তী) 'র' ও 'হ' অক্ষর ছাড়া এমন কিছুই নেই, যা রাহু সম্পর্কিত মনে করা যেতে পারে। যাই হোক, এই জাতি অবশ্যই ভারতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কি করে বলি।*

আমার বিশ্বাস যদি নিজের গ্রামের সংস্কৃতি মাপার সুবিধা পাওয়া যায় তাহলে কিছু না কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক জিনিস অবশ্যই পাওয়া যাবে। এখানকার গ্রামে কয়েক জায়গায় কালী মন্দির আছে, নিম গাছের নিচে চাতালে মাটির গোল গোল শঙ্কু আকৃতির

শ্রীভগবতশরন উপাধ্যায় আমাকে বলেছেন যে, গুপ্তরাজাদের শিলালেখে 'দুঃসাধ্য সাধন' করা যে জাতির উল্লেখ আছে, দুসাধ জাতি তাদেরই বর্তমান রূপ। 'দুঃসাধ্য সাধনিক' গুপ্ত সম্রাটদের পুলিশের কোনও বিভাগ ছিল। আমার জন্মভূমির এই ছোট্ট গ্রামে মহাকাল দেবতার রথচক্রের দাগ একেবারে পড়েনি।

টুকরো আছে। বলা হয় এটি খুব পুরোনো প্রথা নয়। আমার গ্রামের লাগোয়া চূড়োছাড়া ভগবতীর মন্দির এখানে একটাই আছে। মহাবীরের (হনুমানজির) স্থান সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এই প্রদেশে ওপর-ওপর সাজানো সরু হয়ে আসা তিনটি চৌকোর চবুতরাকে মহাবীর বলা হয়। এগুলো দেখে বৌদ্ধস্তূপের কথাই মনে পড়ে। মজার কথা হলো যখন মহাবীরের জয়ধ্বনি দেওয়া হয় তখন 'মহাবীর স্বামীর' জয় বলা হয়, 'স্বামী' আর স্তূপাকৃতি-স্থান 'মহাবীর' শব্দে আমি নানারকম অনুমানের প্রেরণা পাই। কোনও প্রাচীন বৌদ্ধ বা জৈন অথবা মিশ্র পরম্পরার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে? গ্রামের ঠাকুরবাড়িতে যে হনুমান আছে, তা স্তূপের আকারে না হয়ে মূর্তিরূপে বর্তমান। আমার গ্রামে, দেবতামণ্ডলীতে ইদানীং আরও একজন নতুন দেবীর আগমন হয়েছে। তিনি হলেন 'পিলেক-মা' অর্থাৎ 'প্লেগ মাতা' তার স্থানও তৈরি হয়ে গেছে, পূজোও শুরু হয়ে গেছে আর একজন ভক্তের ওপর ভরও হয়। একশো বছর পর যদি কেউ বলে যে প্লেগ ইংরিজি শব্দ আর দেবী ইংরেজের দান, তাহলে নিষ্ঠাবান হিন্দুরা হয়তো বক্তার মাথাই ফাটিয়ে দেবে! কিন্তু আমার গ্রামের 'পিলেক-মা' হিন্দুদের অনেক দেবতার সামনে ভয়ংকর প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে থাকবে। আমি যখন আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম যে করুকুল্লা আর তাঁর শ্রেণীর দেবীরা তিব্বতি পরম্পরার অবদান, এমনকী তিব্বতের প্রাচীন 'বোত' ধর্মের সঙ্গে দশ মহাবিদ্যার তারা ও ছিন্নমস্তার সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়, তখন সে 'বজ্রনাস্তিক' বলে আমাকে তিরস্কার করেছিল। হায়, আমার বন্ধু যদি জানত যে 'বজ্র' আর্যেতর জাতির সংস্রবের ফল হতে পারে।

এখানে এরকম ঐতিহাসিক অবশেষের মধ্য দিয়ে মানুষের দুর্জয় বিজয়যাত্রা চলেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সংস্কৃতি চিহ্নগুলির কোনও উল্লেখ না থাকা নিঃসন্দেহে ক্ষোভের বিষয়। আমাদের ভাষায় এর এক স্মৃতি আছে, আমাদের জীবনে এর পদচিহ্ন আছে। কি করে মেনে নেব, আমাদের চিন্তাধারায় এদের কোনও স্থানই হবে না। কিন্তু সাহিত্যের যে ইতিহাস আমাদের পড়ানো হয়, তা কি মানুষের অপ্রতিহত বিজয়যাত্রার কোনও আভাস দেয়? আমরা নিজেদেরকে পড়ার চেষ্টা কেন করি না? আপনারা যখন আমাকে সাহিত্য বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করেন, তখন আমার মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। কিন্তু আপনাদের একটা প্রশ্ন আমাকে খুব উৎফুল্ল করতে পেরেছে। আপনারা প্রশ্ন করেন, এই যুগসন্ধিতে সাহিত্যিকদের কর্তব্য কী? এখানে বসে আমি সেই কর্তব্য যত স্পষ্ট আর অনাবিল ভাবে দেখেছি, অন্য জায়গা থেকে অতটা দেখতে পারতাম কি?

আমি স্পষ্ট দেখছি, নানা জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত মানুষ গুটিয়ে আসছে। তার কোনও বিশ্বাস ও রীতি-নীতি চিরন্তন হয়ে থাকতে পারেনি। মন্দিরও অবিমিশ্র নয় ও দেবতাও চিরকালীন নয়। কোন দুস্তর পার করার জন্যে মানুষ কৃতসঙ্কল্প। জাতি ও গোষ্ঠীর ভেতর দিয়ে তার বিজয়যাত্রা অনাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সে নিজের ইষ্ট সিদ্ধির জন্যে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে। এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু খুঁজতে সে কখনও বিচলিত হয়নি। এই আধভোলা নাচগানের ঐতিহ্য আর নবগ্রাহিণী প্রতিভার চিহ্ন, নতুন দেবতার কল্পনা, তার পথ খোঁজার চিহ্ন আর বিস্মৃত ঐতিহ্য, এটাই সংকেত করে যে সে ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি নাকের ওপর জমে থাকা কিট্টাভ সংস্কার ঝেড়ে ফেলার যোগ্যতা রাখে। আমাদের গ্রামের নানান জাতি এটি প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট যে তথাকথিত জাতিপ্রথা কোনও বিপ্লবী

গড়ন নয়, তাতে নানা রকমের ওঠানামা হয়েছে আর হতে থাকবে। যুগসন্ধি বলতে আপনি কি বোঝেন আমি জানি না, কিন্তু সাহিত্যিকদের কর্তব্য স্পষ্ট যে তাঁরা যেন কখনও কোনও প্রথাকে চিরন্তন না ভাবেন, কোনও লোকপ্রসিদ্ধিকে দুর্বিজেয় মনে না করেন, আর আজ তৈরি হওয়া রূঢ়িকেও যেন ত্রিকালসিদ্ধ মনে না করেন। ইতিহাস বিধাতার ইঙ্গিত এদিকেই যে মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব আছে, যার জন্যে সে পশু থেকে ভিন্ন, তাই আরাধ্য। মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই সাহিত্য বা রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

সতেরো

ভারতের সাংস্কৃতিক সমস্যা

সংস্কৃতি মানুষের বিবিধ সাধনার সর্বোত্তম পরিণতি। ধর্মের মতো সে-ও অবিরোধী বস্তু। সে সমস্ত দৃশ্যমান বিরোধে সামঞ্জস্য স্থাপন করে। ভারতীয় জনতার বিবিধ সাধনার সব থেকে সুন্দর পরিণতিকেই ভারতীয় সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। সত্যি কথা হলো, এটাই সমস্যার সমাধান তার নিজস্ব কোন সমস্যাই নেই, কিন্তু নানা কারণে সমস্ত ভারতীয় জনসমূহ সেই বড় উপলব্ধ সত্য আত্মসাৎ করতে পারেনি। কেন এমন হতে পারেনি বা কী করলে ভারতীয় সংস্কৃতি—অর্থাৎ ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সর্বোত্তম—সমস্ত জনতার নিজস্ব জিনিষ হতে পারে, সেটাই সমস্যা।

ভারতবর্ষ অনেক বড় দেশ। এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। এই ইতিহাসের যতটা অংশ জানা যেতে পারে, তার থেকেও বেশি যতটা জানা যেতে পারে না, তা আরও পুরোনো ও গুরত্বপূর্ণ। জানি না কোন অজ্ঞাত সময় থেকে এ দেশে নানা জাতি এসে বসবাস করছে আর নানাভাবে তার সাধনাকে নতুন মোড় দিয়েছে, নতুন রূপ দিয়েছে ও সমৃদ্ধ করেছে। আর্য সাহিত্যই এদেশের সবচেয়ে উপলব্ধ সাহিত্য। নানা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভাঙাগড়ার মধ্যে তৈরি আর্যদের ধর্ম ও বিশ্বাস এখনও এদেশের জনতার নিজের ধর্ম আর বিশ্বাস হয়ে আছে। কিন্তু আর্য সাহিত্য যতই প্রাচীন ও বিশাল হোক না কেন, ভারতবর্ষের সমস্ত জনসমুদায়ের বিকাশের অধ্যয়নে তা পর্যাপ্ত ও অবিসম্বাদিত নয়। এই দেশে অনেক আর্যেতর জাতি অত্যন্ত সভ্য ও সংস্কৃত জীবন ধারণ করত, অনেকে এই রকমও ছিল যাদের আচার-আচরণে জংলিপনার প্রাধান্য ছিল। সংঘাতে পড়ে দুই রকম জাতির দ্বারাই আর্যদের প্রভাবিত হতে হয়েছিল। তাদের সাহিত্য শিল্প ও আচার, এর প্রভাব স্পষ্ট। আর্যদের পরেও এখানে অনেক জাতি এসেছে। কেউ আর্যদের ধর্ম-বিশ্বাসের কিছু অংশ মেনে নিয়েছে, কেউ তাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে, আবার এমনও কিছু এসেছে,

যাঁরা আর্যদের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে পারেনি; তবুও একজায়গায় থাকার জন্যে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। ভারতবর্ষ এই রকম নানা জাতির মিলনক্ষেত্র। এই মানুষদের কল্যাণপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের আসল সমস্যা। নানা আকারে বিভিন্ন সময়ে আসতে থাকার জন্যে এই বিশাল জনসমুদায়ের ঐতিহাসিক বিকাশ একরকম হয়নি, এদের মিলন-ভূমিকাও সর্বত্র প্রশস্ত হতে পারেনি। এইজন্যে কোনও নতুন কার্যক্রম সবাইকে একইভাবে প্রভাবিত করতে পারে না; যার ফলস্বরূপ সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষ অনেক সময় চিন্তা ও নিরাশার কারণ হয়ে ওঠে। আসলে, আমরা যদি সমস্ত জনতাকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারি, তাহলে নিরাশা আর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ থাকবে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও ধৈর্যের প্রয়োজন হবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সময়ের দরকার অনুভূত হবে। ইতিহাস-বিধাতার কোনও কাজে তাড়াহুড়ো থাকে না। তার নিজের কার্যক্রম সবসময় কম শক্তিমান পুরুষের ভাবা কার্যক্রমের অনুকূল হয় না। ভারতবর্ষের ইতিহাস সাক্ষি যে, অনেক এমন সাংস্কৃতিক সংকট যা কখনও অসমাধানযোগ্য মনে করা হতো, কেবল সময়ের মলমে অতিবাহিত হয়েছে। আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সংঘর্ষ এবং পরে তার সমন্বয়, চিন্তাযোগ্য ঐতিহাসিক সত্য। মহাভারত আর পুরাণ পড়লে আর্য ও নাগের ক্রান্তিকারী সংঘর্ষের কথা জানা যায়, কিন্তু মহাকালের ছায়া সেই সংঘর্ষকে স্মৃতিপট থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পরে, নাগজাতির অনেক রীতিনীতি আর্য বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে গেছে। সিঁদুর তো নাগ-চূর্ণ, আর্য নারীরা নাগজাতির আচার-পদ্ধতি থেকে তা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আজ হিন্দু বিয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত, আর্য-দ্রাবিড় সংঘর্ষের ফল শুধু সুখকর হয়েছিল, এমন কথা নয়। আর্য-মোঙ্গল, শক-দ্রাবিড় সংঘর্ষও সমানভাবে সমন্বয়ের সোনালি ফলে পরিণত হয়েছে। মানুষ যুক্তি তর্ক মেনে চলা জীব। ছোট ছোট কথা নিয়ে দীর্ঘকাল সে লড়তে পারে না।

মুসলমানদের আসার আগে এদেশে নানা বিশ্বাস ও আচারভেদে নানারকমের ধর্মমত প্রচলিত ছিল। কিন্তু জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে একরূপ ছিল। এই একরূপের জন্যে বিভিন্ন মর্যাদায় বাঁধা অনেক জনশ্রেণীকে এক সমান নামে ডাকা হতে লাগল। এই নাম হলো 'হিন্দু', অর্থাৎ ভারতীয়। মধ্যযুগে ভারতীয় জনসমুদায় দুই বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলঃ হিন্দু ও মুসলমান। জীবনের প্রতি দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতাই ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল। হিন্দু নামধারী জনসমুদায়ে অনেক স্তরভেদ ছিল। এই জনসমুদায়ের অধ্যয়নের জন্যে নানাভাবে তার শ্রেণীকরণ হয়েছে। রিজলির শ্রেণীকরন অত্যন্ত সহজ ও জনপ্রিয়। তিনি সমস্ত জনসমুদায়কে সাত ভাগে ভাগ করেছেনঃ

(1) এমন কিছু জাতি আছে যারা দলের পরিবর্তিত রূপ 'আভীর' (পরবর্তী সময়ে 'আহির') এক বিশেষ মানবশ্রেণী (দল) ছিল, যারা ঘুরতে ঘুরতে এদেশে এসে পৌছয় ও আসার পর হিন্দু সমাজের একটি জাতি হয়ে যায়। এদের বৈশিষ্ট্য হলো যে এরা নিজেদের বিষয়ে বিশেষ রকমের সামাজিক নিয়ম ও রীতিনীতি পালন করে কেবল অংশত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে থাকে। বিয়ে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে তারা ব্রাহ্মণ ডাকে, কখনও কখনও তাও করে না। ডোম দুসাদ ইত্যাদি জাতি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে, কিন্তু তাদের কোনও অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ডাকা হলেও হতে পারে। (2) এমন কিছু জাতি আছে, বিশেষ পেশাগত

কারণে যাদের স্বতন্ত্র শ্রেণী মানা হয়। পেশার জন্যে চামার কর্মকার ছুতোর ইত্যাদি জাতি তৈরি হয়েছে। কখনও কখনও এই জাতির ইতিহাস থেকে বিচিত্র সামাজিক আলোড়নের কথা জানা যায়। সরাক জাতি কাপড় বোনার পেশা থেকে তৈরি হয়েছে, আসলে তারা জৈন শ্রাবকদের পরিবর্তিত রূপ। পটবেগর জাতি নিজের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করে। পেশার জন্যে মধ্যপ্রদেশে যাদের বেনে বলা হয়, যেই জাতির ইতিহাস ঘেঁটে রাসেল জানতে পারেন, তারা সবাই রাজপুত। সমস্ত হিন্দু জাতি পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত কত ব্রাহ্মণ জাতি চাষবাসের পেশা মেনে নেওয়ায় মর্যাদাভ্রষ্ট হয়েছে। (3) এমন কিছু জাতি আছে যারা মূলত কোনও ধার্মিক সম্প্রদায় ছিল। উত্তর ভারতে অতীথ, বাংলায় যুগি আর বোষ্টম (বৈষ্ণব) ও দক্ষিণ ভারতে এমন অনেক জাতি আছে। (4) দুই জাতির সংমিশ্রণে অনেক জাতি তৈরি হয়েছে। (5) এমন কিছু জাতি আছে, রিজলি যাদের রাষ্ট্রীয় জাতি (ন্যাশনাল কাস্ট) বলেছেন। নেওয়ার এমনই এক জাতি। (6) নিজেদের মূল ভূভাগ থেকে দূরে চলে যাওয়ার জন্য কত জাতি নতুনভাবে তৈরি হয়েছে। গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে, গুজরাতে নগর ব্রাহ্মণ ও বাংলার কায়স্থদের উৎস সম্ভবত একই। (7) আবার এমনও জাতি আছে, আচারবিচার ঠিকমতো পালন না করার জন্যে যাদের একটি বিশেষ জাতি থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে, আর তারা নিজেদের নতুন জাতি বলে পরিচয় দেয়। কখনও কখনও বিধবা বিবাহের প্রশ্নে এক জাতির দুটি শাখা হয়ে গেছে। যে জাতিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত তাদের হীন মনে করা হয়। এইভাবে এই দেশের হিন্দু জনসমুদায় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত এই বিভাজন দৃঢ় করার জন্যে এমন অনেক কঠোর নিয়ম তৈরি করা হয়েছে, যা দুর্বিলঙ্ঘ্য। ছোঁয়াছুঁয়ি, অন্তর্বিবাহ, ওঠাবসা এদের পারস্পরিক মিশ্রণে বাধা হয় আর এদের সামাজিক মর্যাদাও চিহ্নিত করে। পুরোনো সাহিত্য ও ইতিহাস সাক্ষি, মুসলমানরা আসার আগে এই মর্যাদা ততটা দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না, পরে যতটা হয়েছে। পরেও সমাজ একেবারে প্রাণহীন ও গতিহীন কাঠের বাক্সে বন্ধ ছিল না, যদিও উত্তরোত্তর বন্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি বেড়েছে।

এই পুরো জনসমুদায়কে একরূপ করার একটি দৃষ্টিকোণ আছে। বৈদিক যুগ থেকে মুসলমান যুগ পর্যন্ত অনেক সংঘটন এবং ঘাত-প্রতিঘাতের পর পুরো ভারতীয় জনসমুদায়ে এই দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাকে কর্মফল-তত্ত্ব বলা হয়।

কর্মফল-তত্ত্ব ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। খুঁজলে অন্যান্য দেশের মনীষীর মধ্যে পুনর্জন্ম-তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু অন্য কোথাও কর্মফল-তত্ত্ব পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) পুনর্জন্ম-তত্ত্ব মেনেছেন, কিন্তু উইলিয়াম জোন্স, কোলবুক্‌ল, গারওয়ে, হপ্‌কিন্স ইত্যাদি বিদেশি পাণ্ডিতরা স্বীকার করেছেন যে ভারতবর্ষ থেকেই তাঁরা এই তত্ত্ব শিখেছেন। ইয়োরোপের কিছু পণ্ডিত একথা স্বীকার করেন না। উল্টে, কেউ কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, পিথাগোরাসের কাছ থেকেই হিন্দুরা এই তত্ত্ব শিখেছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য বিশারদ কীথ 1909 খ্রিস্টাব্দে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এই বিষয়ে অত্যন্ত সুচিন্তিত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নানান বিবেচনার পর কীথ সাহেব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, পিথাগোরাসের ওপর হিন্দুদের কোনও প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু হিন্দুদের কর্ম-বন্ধন তত্ত্ব অবশ্যই অদ্বিতীয়। তাদের এই তত্ত্ব পৃথিবীর অন্যান্য জাতি থেকে তাদের আলাদা করে দেয়। যে কোনও ব্যক্তি ভারতের

ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে চাইলে, এই তত্ত্ব না জেনে এগোতে পারবে না। এর সুদূরপ্রসারী ফল সমস্ত ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করে রেখেছে। এর জন্যে হিন্দুদের মনোবৃত্তি নিশ্চিতভাবে এমন বাঁক নিয়েছে, সারা পৃথিবীতে যার তুলনা মেলে না। এই তত্ত্ব স্বীকার করে নেওয়ার জন্যেই হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় ইতিহাসে জন্ম থেকেই নীচু শ্রেণী বলে যারা চিহ্নিত, সেই জাতির মধ্যে উৎকট বিদ্রোহ ভাব জাগেনি। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে তার কৃতকর্মের ফল দূর হতে পারে না। চণ্ডাল নিজের দুর্গতির জন্যে কর্মের দোহাই দেয়, ব্রাহ্মণ নিজের উচ্চপদের জন্যেও কর্মের দোহাই দেয়। নিজের নিজের কর্মফলের জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই জবাবদিহি করে। কেউ অন্যের কর্মফল ভোগ করতে ও চেষ্টা করে সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ কর্মও বদলে ফেলতে পারে না। এই তত্ত্ব কর্মোদ্যোগ হিন্দুদের অত্যন্ত ব্যক্তিপ্রবণ করে দিয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জাগতিক ব্যবস্থার প্রতি উদাসীনও করে দিয়েছে। যা কিছু হচ্ছে তার নিশ্চিত কারণ আছে। তাকে বদলানো যেতে পারে না। খুব বেশি হলে মানুষ আবার নিজের ভাল করতে পারে।

একদিকে কর্মফল-তত্ত্ব আর অন্যদিকে পেশাগত আধারের স্তরভেদকে সনাতন করে ফেলার ব্যবস্থা—এই দুটিই সম্পূর্ণ জনসমুদায়ের আধ্যাত্মিক বিকাশে এক অদ্ভুত জড়তা এনে দিয়েছে যখন ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের তুলনায় সামাজিক কল্যাণের ভাবই প্রমাণ হয়। ময়লা পরিষ্কার করার পেশা, শ্মশানে শবদাহের পেশা ও হাল জোতার কাজ সমাজ মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এগুলো যারা করে তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অনেক ত্যাগও আছে। কিন্তু যে ত্যাগের জন্যে গৌরব অনুভূত হয় না, তাকে ধর্ম বলা যেতে পারে না। মেথর যদি তার পেশার জন্যে গর্ব অনুভব করে তবে সে ধার্মিক, কিন্তু যদি সে নাচার হয়ে বা জড়তার জন্যে যেন তেন প্রকারেণ নিজের বংশবৃত্তি পালন করে যায়, সুযোগ পেলেই তা ছাড়ার চেষ্টা করে, তাহলে তার মধ্যে ধর্মবুদ্ধি নেই। এই জন্য যে ব্যক্তি কোনও গৌরবানুভূতি ছাড়াই মেথরের পেশা চালিয়ে যায়, সে সমাজের মঙ্গলবুদ্ধির জন্যে তা করতে পারবে না। জাতি ব্যবস্থা একদিকে পেশাকে ধর্মের সঙ্গে সম্বৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে বিভিন্ন পেশায় সম্মানে উঁচু-নিচুর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দুটি একসঙ্গে চলতে পারে না; হয় সমস্ত পেশাই ধর্ম আর এই জন্যে সমান সম্মানের অধিকারী; তা না হলে, যদি সমান না হয় তবে তাকে ধর্ম বলা যেতে পারে না। তাতে সমাজে জড়তা এবং ধৃষ্টতা আসবেই।

মধ্যযুগে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই উঁচু-নিচু ভেদাভেদের ওপর জোর আঘাত করেছেন। তাঁরা তা দূর করার চেষ্টাও করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা ধার্মিক চিন্তা দ্বারা অনুপ্রেরিত। এই আন্দোলনের মূলে সর্বত্রই যুক্তি হচ্ছে: ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সবাই পরমপিতার সন্তান, অতএব সবাই সমান।

এই আন্দোলনগুলি সফল হয়নি। ধার্মিক সাধুদের নামে সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে আর প্রায়ই এমন হয়েছে যে হয় সম্প্রদায় সেই কঠোর ব্যবস্থা অনুসরণ করেছে আর নয়তো নিজেই আলাদা একটি জাতি হয়ে গেছে। নাথদের জাতি তৈরি হয়েছে, দক্ষিণে লিঙ্গায়দের জাতি তৈরি হয়েছে, বাংলায় বৈষ্ণবদের জাতি তৈরি হয়েছে। কাহ্নুর শিষ্যরা সাপুড়ে জাতি হয়ে গেছে। যারা ময়লা পরিষ্কার করেতে চেয়েছিল তাদের নামে আরও কিছু আবর্জনা বেড়েছে। ভারতীয় ইতিহাস সাক্ষি যে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ শেষ করার জন্যে ধার্মিক ও

আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা সফল হয়নি, যারা এখনও আশা করেন যে ধার্মিক আন্দোলন করে এই কঠের ব্যবস্থা শিথিল করা যাবে, তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেননি। সমাজের খুব কম লোকই আধ্যাত্মিক উচ্চতায় পৌঁছতে পারেন। বাকি সবাই ছোটখাটো বৈষয়িক জগতে জড়িয়ে থাকে। এরাই আধ্যাত্মিক আদর্শ বিকৃত করে।

রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণেও জাতির মর্যাদা কম-বেশি হয়েছে। রাজকীয় শক্তি পাওয়ার পর যাদের ছোট জাত মনে করা হয়, তাদেরও ক্ষত্রিয় মেনে নেওয়া হয়েছে এবং আর্থিক উন্নতির জন্যে শূদ্র বৈশ্যে উন্নীত হয়েছে। এমন উদাহরণ অনেক আছে। আসলে এই কারণে জাতের সামাজিক মর্যাদা যত বেড়েছে তা একেবারেই ধার্মিক আন্দোলনের জন্যে হয়নি। মনে হয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক মর্যাদা উন্নত করাই ভারতবর্ষের শতাধিক জাতিকে কল্যাণপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। যেদিন এই অকারণ দলিত জনসমুদায়ে রাজনৈতিক গরিমা ও আর্থিক স্বাধীনতার সঞ্চার হবে, সেই দিন তারা সত্যিই মুক্ত হতে পারবে। ভগবানের সন্তান হওয়ার অধিকার আগেই স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু সেই অধিকারে কোনও লাভ হয়নি। নতুন করে সেই অধিকারশক্তি দ্বারা এই জাতিরা আরও উন্নত ও অগ্রসর হয়ে যাবে, এমন বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু এদেশে কেবল হিন্দুরাই থাকে না। অন্য ধর্মাবলম্বীও কম নেই। মুলসমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। জীবনের প্রতি এদের দৃষ্টিকোণ হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। মুসলমানেরা এক সংগঠিত ধর্মমতে (মজহব) বিশ্বাস করে। মজহব ধর্মসাধনা ব্যক্তিগত না হয়ে সামগ্রিক হয়। এতে সামাজিক ও ধার্মিক বিধিনিষেধ একসঙ্গে গাঁথা থাকে। হিন্দু জনগোষ্ঠীতে এক জাতির লোক অন্য জাতিতে রূপান্তরিত হতে পারে না, কিন্তু মুসলমান জনগোষ্ঠীর ('মজহব') ঠিক তার বিপরীত। সেখানে ব্যক্তিকে সমুদায়ের অঙ্গ করে ফেলা হয়। হিন্দু সমাজে জাতি কয়েকজন ব্যক্তির সমুদায়, কিন্তু মুসলিম সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি এক বড় সমুদায়ের অঙ্গ। সোজা মানে হলো, হিন্দু সমাজে ব্যক্তির পৃথক সত্তা থাকে, কিন্তু বাইরের লোক তার অঙ্গ হতে পারে না। মুসলমান সমাজে ব্যক্তি নিজের আলাদা সত্তা রাখে না। আর বাইরের যে কোনও লোক সেই সমাজের অঙ্গ হতে পারে। এই দুটি দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য আছে। এইরকম পার্থক্যে এটা প্রমাণিত হয় না যে এরা কখনও এক হতে পারবে না। আসলে আর্য এবং দ্রাবিড়দের দৃষ্টিকোণ এর থেকেও বেশি ভিন্ন ছিল। এইজন্যেই হিন্দু-মুসলমান এক হতে পারে না, এমন মন্তব্য ভুল, কোন পথে এক হতে পারে সেটিই বিচার্য প্রশ্ন।

যখন মিলনের প্রশ্নে ভাবনাচিন্তা করি, তখন যাতে সমস্ত মনুষ্যত্ব কল্যাণপথে এগিয়ে যেতে পারে, এমন মিলনই আমাদের উদ্দেশ্য। ঠগদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অনেকদূর পর্যন্ত সফল হয়েছিল; সেই ঐক্য বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে আমরা হয়তো ইতিহাস থেকে কিছু শিখতে পারি। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্যে আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক চেষ্টা হয়েছিল। তাঁদের ভগবানের দুই প্রিয় চোখের মতো বলা হয়েছে। এখন এই তর্কের সাহায্যে হিন্দু-মুসলিম মিলনের ভূমিকা প্রস্তুতের চেষ্টা হয়েছে। এই চেষ্টার পেছনে যে শুভবুদ্ধি আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। সর্বত্রই শুভবুদ্ধিকে স্বাগত জানানো উচিত, কারণ, তাতে কোনও না কোনও কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হলো যে খুবই

অপ্রত্যক্ষভাবে কল্যাণ সাধিত হয়। মুসলিম সাহিত্য পড়ার বিশেষ সুযোগ পাইনি, হিন্দু সাহিত্যের জ্ঞানও সামান্য। এইজন্যে দৃঢ়ভাবে কিছু বলতে সংকোচ হয়। কিন্তু অন্য উৎস থেকে সাহিত্যের যা কিছু পেয়েছি, তাতে আমার মনে কিছু প্রভাব পড়েছে, যা বলে ফেললে, মনে হয় কল্যাণ হবে। নিজের অল্পবিদ্যার ভয়ে চেপে রাখা ঠিক হবে না।

তিনভাবে আমি হিন্দু-মুসলিম মিলনের সন্ধান পেয়েছি। একটি শুণ্ড ও বিদ্বজনের রাস্তা। উচ্চতর অর্থে হিন্দু ও মুসলিম জনতা একই ধর্ম পালন করে। ফারসিতে এ বিষয়ে কিছু বই লেখা হয়েছিল। একটি দারা শিকোহর লেখা 'মজ্জ-অ-উল-বহরন'। আমি এর ইংরিজি ভাষান্তর দেখেছি। এতে হিন্দু-মুসলিম সম্মেলনের চেষ্টা করা হয়েছে। হিন্দিতেও এমন বই লেখা হয়েছে। এমন বইও অনেক আছে যাতে কোরান ও গীতা এবং বেদ ও কোরানের ভক্তিময় আবেগভরা পদ্যে সাম্য খোঁজা হয়েছে, ও উচ্চতর নীতির ক্ষেত্রে এদের উপদেশের মধ্যে অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। এটি এক ধরনের চেষ্টা, কিন্তু আমার মনে হয় এতে সাফল্য পাওয়া যাবে না। আসলে প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে উচ্চতর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোনও মতবিরোধ নেই। দুজনেই একই পরম শক্তিকে ভিন্ন নামে ডাকে, সবাই একই পরমপিতার সন্তান, সমস্ত মহাপুরুষ একই ত্যাগময় জীবনকে আদরণীয় বলেছেন। তবুও কাজ হয়নি, কারণ উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতির তুলনায় সাধারণ জনতা ধার্মিক সংস্কার মেনে চলে। এই সংস্কারই তাদের কাছে ধর্ম। শাঁখ বাজানো বা আজান দেওয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আচার আর এইজন্যেই এইগুলো আসল মনে করেই ঝগড়ার সূত্রপাত হয়।

দ্বিতীয় রাস্তা নিতান্ত লৌকিক। নাচ-গান, খেলাধূলো, পোশাক-আশাক, গয়না-গাটি, কেনাবেচা ইত্যাদিতে হিন্দু-মুসলমান মিলন অনেক সুদূরপ্রসারী। কিন্তু সমস্যা হলো যতক্ষণ না এর সঙ্গে উচ্চতর মনোবৃত্তি যুক্ত হয়, ততক্ষণ এসব কথা হাওয়ায় উবে যায়। সামান্য উস্‌কানিতেই ভিত নড়ে ওঠে।

তৃতীয় ক্ষেত্রেও আছে, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান সংকোচ আর ভয়ডর ছাড়াই মিলেছে। এই ক্ষেত্রে মিলন এত পাকা ও অকৃত্রিম হয়েছে যে ঐক্যের আবেদনকারী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও তার কোনও খবরই রাখেন না। কেননা সে ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। আরবি ভাষায় অনেক আগে আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত ইত্যাদির জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলির ভিত্তিতে ও অনুসরণে মুসলমান জ্যোতিষীরা অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। অল্‌খারিজমি দশগুণোত্তর সংখ্যাক্রম সমস্ত ইয়োরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমান ধর্মে দিক এবং সকাল ও সন্ধ্যায় গোধূলির খুব গুরুত্ব আছে, কারণ নমাজ পড়ার জন্যে দুটিই বিশেষ দরকারি। এর সূক্ষ্ম বিবেচনার জন্যে মুসলমান জ্যোতিষীরা অক্ষাংশ, দেশান্তর-সংস্কার ও চর এবং উদয়াস্তের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন। হিন্দুদের মুহূর্ত-শাস্ত্র মুসলিম জ্যোতিষবিদ্যায় গৃহীত হয়েছে ও আরবদের তাজক-শাস্ত্র ও রমল বিদ্যা সংস্কৃতে সম্মানজনক স্থান পেয়েছে। আরবি ভাষার শব্দই এই শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। তাজক নীলকণ্ঠীর প্রসিদ্ধ ষোলো যোগের নাম, সোজা আরবি থেকে নেওয়া হয়েছে। ইসরাফ ইকবাল মানট (মনঅ) ইত্যাদি সংস্কৃত নয়, আরবি ভাষার শব্দ, আরবিতে চিকিৎসাগ্রন্থের অনুবাদও হয়েছে। য়ুনানি চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে

ভারতীয় পদ্ধতির মিলনে এক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি হাকিমির জন্ম হয়েছে, যা হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার মিলনের অত্যন্ত সুন্দর ফল। এইভাবেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান ভয়ডর এবং সংকোচ ছেড়ে মিশে গেছে। মুসলমান বাদশারা সৌর বছরের সঙ্গে হিজরি সম্বতের সামঞ্জস্য স্থাপন করে নতুন সাল চালু করেছিলেন। যা আজ হিন্দুদের জাতীয় সম্বত হয়ে গেছে। ফসলি সাল, বিলিতি সাল, বঙ্গাব্দ এই রকমই সন। আসলে এই ক্ষেত্রে মিলন এত পোক্ত হয়েছে যা অন্য কোনও ক্ষেত্রেই হয়নি। সম্ভবত ইতিহাস এখনও আমাদের শেখা বাকি আছে, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিই সাম্প্রদায়িক মিলনের ভূমি। সেটি উত্তেজিত করাই বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় মনীষা শিল্প ধর্ম দর্শন ও সাহিত্যক্ষেত্রে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফল পেয়েছে ও ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়ার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু নানা কারণে সমস্ত জনতা একই ধরাতলে নেই এবং সবার মুখও একদিকে নয়। তাড়াতাড়ি কোনও ফল পাওয়ার আশায় ভুল অনুমানভিত্তিক তত্ত্ব খাড়া করে তার ওপর কার্যক্রম তৈরি করলে অভীষ্ট ফল পেতে সবসময় সাহায্য নাও পাওয়া যেতে পারে। বিকাশের নানা সিঁড়িতে দাঁড়ানো জনতার জন্যে বিভিন্ন কার্যক্রম দরকার হবে। উদ্দেশ্যের একতাই বিবিধ কার্যক্রম ঐক্য আনতে পারে, কিন্তু এও নিশ্চিত যে যতক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে না ততক্ষণ কোনও কাজ, তা যতই শুভেচ্ছা নিয়ে শুরু করা হোক না কেন, ফলপ্রসু হবে না। অনেকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বা হিন্দু সংঘটনকেই লক্ষ্য মনে করে উপায় ভাবতে থাকেন। বস্তুত হিন্দু-মুসলিম একতাও সাধন, সাধ্য নয়। মানুষকে পশুবিশেষ স্বার্থপর ধরাতলের ওপরে উঠিয়ে 'মনুষ্যত্বের' আসনে বসানো হল সাধ্য। হিন্দু ও মুসমিল যদি এক হয়ে পৃথিবীতে লুটপাট করার জন্যে সাম্রাজ্য স্থাপনে বেরিয়ে পড়ে তাহলে সেই হিন্দু-মুসলিম মিলনে মনুষ্যত্ব কেঁপে উঠবে, কিন্তু মানুষকে দাসত্ব জড়তা মোহ কুসংসকার আর পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচানো, মানুষকে ক্ষুদ্রস্বার্থ ও অহমিকার দুনিয়া থেকে ওপরে উঠিয়ে সত্য ন্যায় ঔদার্যের পৃথিবীতে নিয়ে আসা, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে বাঁধাই, হিন্দু-মুসলিম একতার উদ্দেশ্য। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণই আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে। তাই মানুষের সর্বোত্তম প্রাপ্য। আর্য দ্রাবিড় শক নাগ আভীর ইত্যাদি জাতির হাজার হাজার বছরের সংঘর্ষের পর হিন্দু দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে। নতুন করে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ তৈরি করার জন্যে এত লম্বা সময়ের দরকার নেই। আজ আমরা ইতিহাসকে আরও বাস্তবভাবে বুঝতে পারি ও সেইমত নিজেদের বিকাশের পরিকল্পনা তৈরি করতে পারি। ধৈর্য হারানো উচিত নয়। যদি ইতিহাস-বিধাতার ইঙ্গিত বুঝেই আমরা পরিকল্পনা করি, তাহলে সাফল্যের আশা করতেই পারি।

আঠারো

মানুষই সাহিত্যের লক্ষ্য

আমি সাহিত্যকে মানুষের দৃষ্টি দিয়ে দেখার পক্ষপাতী। যে বাক্‌জাল মানুষকে দুর্গতি হীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচাতে পারে না, যা তার আত্মাকে তোজোদীপ্ত করতে পারে না, যা তার হৃদয়কে পরদুঃখকাতর ও সংবেদনশীল করতে পারে না, তাকে সাহিত্য বলতে আমার সংকোচ হয়। আমি অনুভব করি, আমরা এক কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আজ নানান সংকীর্ণ স্বার্থ মানুষকে এমন অন্ধ করে দিয়েছে যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণে কথা ভাবা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমন লাগছে যে, কোনও বিকট দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিতে দলগত স্বার্থ-প্রেম মনুষ্যত্বকে চেপে ধরেছে। পৃথিবী ছোট ছোট সংকীর্ণ স্বার্থের ভিত্তিতে অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। নিজের দলের বাইরের লোককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। তার হাসি কান্নার ওপরেও অসদুদ্দেশ্য আরোপ করা হয়ে থাকে। তার তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠার ঠাট্টা করা হয়। তার প্রত্যেক ত্যাগ ও আত্মদানেরও 'চাল' খুঁজে বার করা হয়। নিজের নিজের দলে এমন ব্যক্তিকে সফল নেতা মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ-রকম করে মানুষ সবচেয়ে আগে নিজেকেই আহত করে। বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক যখন নিজের বিরাট অনুচরবাহিনীর সঙ্গে এরকম নোংরা প্রচার করে, তখন ওপরে-ওপরে, সাফল্য যতই তার পক্ষে আসুক না কেন, ইতিহাস-বিধাতার নিষ্ঠুর নিয়ম-প্রবাহ ভেতরে ভেতরে তাদের স্বার্থের উন্মূলন করতে থাকে। ইতিহাস শক্তিশালী ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের চিতাভুমি সাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তবুও নোংরা পদ্ধতি শোধরানো হয়নি, বরঞ্চ তাকে আরও কৌশলপূর্ণ ও প্রভাবশালী তৈরি করা হচ্ছিল। যাঁরা দ্রষ্টা তার এই ভুল বোঝেন, কিন্তু তাদের কথা তাবৎ ব্যক্তির উঁচু গদি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। পৃথিবীতে ভাল কথা বলার লোকের অভাব নেই, কিন্তু মানুষের সামাজিক সংগঠনেই কোথাও এমন কিছু দোষ রয়ে গেছে, যা কাউকে ভাল কথা শুনতে আর বলতে বাধা দিচ্ছে। ভাল কথা কি করে বলা যায়, তাই আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়, বরঞ্চ সমস্যা হলো ভাল কথা শোনা মানার জন্যে মানুষকে কি করে তৈরি করা যায়।

এইজন্য সাহিত্যিক আজ কেবল কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকতে পারে না। বহু শতাব্দীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি করাই বড় কথা নয়। সম্পূর্ণ সমাজকে এমন করে সচেতন করা খুব দরকার যাতে সেই উত্তম সৃষ্টিকে নিজের জীবনে ব্যবহার করতে পারে। সাহিত্যসভা এরকম কাজ করতে পারে, সম্পূর্ণ জনসমাজকে উত্তম সাহিত্য শোনানোর মাধ্যমে তৈরি করতে পারে। এই বিশাল দেশে শিক্ষার হার খুবই কম। যে সব দেশে শিক্ষার সমস্যা মিটে গেছে, সেখানকার সাহিত্যিকদের তুলনায় এখানকার সাহিত্যিকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তার ওপর আমরা যে ভাষার সাহিত্যভাণ্ডার ভরার ব্রত নিয়েছি, তার গুরুত্ব অনেক বেশি। তা হলো ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় প্রদেশের ভাষা, তাকে

বহু কোটি মানুষের জ্ঞানপিপাসা শান্ত করতে হবে। এইজন্যে তাকে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিকাশের বাহন হতে হবে।

আমরা যখন হিন্দি সেবার কথা ভাবি তখন প্রায় ভুলে যাই যে এটি বাচ্যার্থে প্রয়োগ। হিন্দি সেবার অর্থ হলো সেই মানবসমাজের সেবা করা, হিন্দি যার ভাবনাচিন্তার আদর্শ প্রদানের মাধ্যম ভাষা। মানুষই বড় জিনিস, ভাষা সেবার জন্যে হয়। সাহিত্যসৃষ্টির অর্থও তাই। যে সাহিত্য নিজের জন্যে লেখা হয়, তার কি মূল্য আছে। আমি বলতে পারি না, কিন্তু যে সাহিত্য মানবসমাজকে রোগ শোক দারিদ্র অজ্ঞান ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচিয়ে তার মধ্যে আত্মশক্তি সঞ্চার করে, তা নিশ্চয় অক্ষয় নিধি। সেই গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য আমরা নিজের ভাষায় নিয়ে আসতে চাই। আমি মানুষের এই অতুলনীয় শক্তিতে বিশ্বাস করি যে আমরা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য দিয়ে এই বিষম পরিস্থিতি বদলাতে পারব।

কিন্তু সাবধানে ভাবতে হয় যে হিন্দি বলা জনসম্প্রদায় কি বস্তু আর বাস্তবে কি সেই পরিস্থিতি, যাকে আমরা বদলাতে চাই। কাল্পনিক প্রেতকে ঘুষি মারা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নগর ও গ্রামে ছড়িয়ে থাকা হাজারো জাতি এবং সম্প্রদায়ে বিভক্ত, অশিক্ষা দারিদ্র ও রোগে পীড়িত মানবসমাজ আপনার সামনে উপস্থিত। ভাষা আর সাহিত্যের সমস্যা আসলে তাদেরই সমস্যা। কেন তারা এত দীন ও দলিত? বহু শতাব্দীর সামাজিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক গোলামির ভারে চাপা পড়ে থাকা মানুষই ভাষার প্রশ্ন এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কষ্টিপাথর। যখন আপনি কোনও বিকট প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করছেন তখন সেগুলো সোজাসুজি দেখুন। আমেরিকা বা জাপানে এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হয়েছে সেটা কম ভাবুন, কিন্তু আসলে এটি কি এবং কী কারণে এমন হয়ে গেছে এটা বেশি ভাবাই দরকার। বড় বড় পণ্ডিতরা এই দেশের জনসমুদায়ের ওপর গবেষণার চেষ্টা করেছেন, এখনও করছেন, কিন্তু হয় এদের ভাল প্রজা তৈরি করার উদ্দেশ্যে আর নয়তো বৈজ্ঞানিক কৌতুহল নিরসনের উদ্দেশ্যে, এই গবেষণা করা হয়েছে। তাদের কি ভাবে মানুষ তৈরি করা যায়, এই দৃষ্টি দিয়ে দেখা এখনও বাকি আছে। আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের রাজনীতি সবকিছুরই এই উদ্দেশ্য হতে পারে যে কীভাবে দুর্গতি থেকে রক্ষা করে এদের মনুষ্যত্বের আসনে বসানো যায়।

আমাদের এই দেশ জাতিভেদের। অকারণে কোটি কোটি মানুষ অপমানের শিকার। নিরন্তর দুর্ব্যবহার পাওয়ার জন্যে তাদের মনে হীনমন্যতার গিঁট পড়ে গেছে। যতক্ষণ না সেই গিঁট মিলিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ ভারতবর্ষের আত্মা সুখি থাকতে পারে না। কর্মের ফল পেতেই হয়। তার থেকে বাঁচার উপায় নেই। যাদের অকারণ অপমানের বন্ধনে রেখে আমরা অপমানিত করেছি, তারাই এই পৃথিবীতে আমাদের অপমানের কারণ হয়েছে।

তাদের বর্তমান অবস্থার কারণ আমাদের সাবধানে খুঁজতে হবে। অনাদিকাল থেকে এদের হীন ভাবা হচ্ছে। নানা রকমের ঐতিহাসিক সামাজিক ও আর্থিক কারণ-পরম্পরার ভিতর দিয়ে পার হয়ে হাজার হাজার জাতি ভরা সমাজ তৈরি হয়েছে। এই শতচ্ছিদ্র আমরা হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যায় খুবই চিন্তিত। নিঃসন্দেহে এটি খুবই গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই মহান প্রশ্ন আমাদের জীবনকে গভীরভাবে বিচার করতে চ্যালেঞ্জ করছে। আমাদের ভাষা ক্ষেত্রে এই কঠিন সমস্যায় হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি। আমাদের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মিটমাটের ব্রত নিয়েছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে হিন্দু-হিন্দু মিলনের জন্যে আমাদের এর থেকেও কঠোর সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। অশান্তির চিহ্ন এখন থেকেই প্রকট হতে শুরু করেছে। যখন আমরা ভাষা বা সাহিত্য সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের সমাধান করতে বসি, তখন কেবল বর্তমানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে আমরা ধোঁকা খেতে পারি। নিজের বুদ্ধি বা দূরদর্শিতার কোনও গর্ব আমার নেই, কিন্তু যা কিছু অনুভব করি, সততার সঙ্গে তা প্রকট করলে হয়তো কিছু লাভ হবে, এই আশাতেই কথাগুলো বলছি। হাজারো ব্যর্থ কল্পনার মতো এগুলোও অনন্ত বায়ুমণ্ডলে বিলীন হয়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের দেশবাসীর মনে যেমন-যেমন আত্মচেতনা সঞ্চারিত হবে, হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ সমস্যাও তেমন-তেমন উগ্ররূপ ধারণ করবে, থাকবে। রাজনৈতিক বন্ধন দূর হতেই আমদের মানসিক বা আধ্যত্মিক গোলামির বন্ধন আরও কঠোর মনে হবে। দুশো বছরের রাজনৈতিক গোলামি ভাঙতে আমাদের যত চেষ্টা করতে হয়েছে, সহস্রাধিক বছরের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গোলামির শিকল ভাঙতে তার থেকেও অনেক বেশি চেষ্টা করতে হবে।

কবি অনেক আগেই সমাধান করেছেন, 'যাকে তুমি নিচে ফেলে রেখেছ, সে তোমাকে নিচে থেকে কষে বাঁধবে, যাকে পেছনে রেখেছ, সে পেছনে টানবে, অজ্ঞানের আড়ালে যাকে ঢেকে রেখেছ, সে তোমার সমস্ত মঙ্গলকে ঢেকে ঘোর ব্যবধান সৃষ্টি করবে। হে আমার দুর্ভাগা দেশ, অপমানে তোমাকে সমস্ত অপমানিতের সমান হতে হবে।' (গীতাঞ্জলি)

বহু শতাব্দীর বিকট অপমানের প্রতিক্রিয়া কঠোর হবে। তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার মনে হয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যখন চিন্তাভাবনা করা হয় তখন এ-কথা ভুলে যাওয়া হয়। হিন্দুদের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ সমস্যাও আছে আর সেই সমস্যার জন্যে যে বিচার-বিনিময় হয়েছে বা হচ্ছে, তা নানা কারণে সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। ছোট জাতির মধ্যে ওপরে ওঠার আকাঙ্খা থাকা স্বাভাবিক আর তার জন্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাদের ঝোঁক থাকা অস্বাভাবিক নয়। যদি সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহারে ও সমস্ত জাতিকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলার সঙ্গে কোটি মানুষের মধ্যে নিজস্ব হীনতার মনোবৃত্তি কিছুটা কম হয়, তাহলে এমন করা বাঞ্ছনীয় না অবাঞ্ছনীয় তা আমি দেশনেতাদের ভাববার জন্যে ছেড়ে দিচ্ছি।

একটা সময় ছিল যখন ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে বিশ্বাস করা হতো। মনে করা হতো যে ভাষা দিয়ে বংশ চেনা যায়। কিন্তু তাড়াতাড়ি সেই ভুল ভেঙে গেল। দেখা গেছে যে এই দুটি শাস্ত্র একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেয়। ভারতবর্ষ ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের ঝগড়ার সবচেয়ে বড় আখড়া বলে প্রমাণিত হলো। বর্তমান হিন্দু সমাজে দু একটা নয়, বরঞ্চ ডজন কয়েক এমন জাতি আছে যারা নিজের মূল ভাষা ভুলে গেছে ও আর্যভাষা ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণপ্রধান ধর্ম জাতির এমন স্তরভেদ মেনে নিয়েছে যে নিম্ন শ্রেণীর জাতি সর্বদা সুযোগ পেলেই উঁচু স্তরে যাওয়ার চেষ্টা করে। না জানি কোন অনাদিকাল থেকে এদেশে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক বংশ এবং জাতির লোকেই নিজের ভাষাকে সংস্কৃতবর্গের ভাষায় বদলে নিয়েছে। গ্রিয়র্সন নিজের বিশাল সার্ভেতে এমন একটিও প্রসঙ্গ দেখেননি, যেখানে আর্যভাষা সংস্কৃতবর্গীয় ভাষা বলা কোনও

জনসমুদায় অন্যের সঙ্গে নিজের ভাষা বদলেছে, এমনকী আর্য ভাষার কোনও বুলি ব্যবহার করা লোকেরাও অন্য বুলি মেনে নেয়নি।

বেশ স্পষ্ট যে সংস্কৃত প্রাধান্য এদেশে কোনও নতুন ঘটনা নয়। এটাও স্পষ্ট যে এই ভাষার আশ্রয়ে অনেক জাতি ওপরে উঠেছে। আমি কেবল সেই তথ্যগুলি আপনাদের সামনে রাখছি যার ওপর আমার ধারণা হয়েছে, এই দেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সংস্কৃত আত্মচেতনা জাগানোর কাজ করে আসছে আর ভবিষ্যতেও করবে, এমন সম্ভাবনা আছে। যারা সংস্কৃতবহুল ভাষার ব্যবহার করছেন তাঁরা কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা বা হিংসাবশে করছেন, এমন মনে করা উচিত নয়। এমন অর্থহীন কথায় বিশ্বাস করা আমাদের দুর্ভাগ্য। বহুদিন ধরে জ্ঞানের আলোকে বঞ্চিত এই মানুষদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করতে হবে। বহু শতাব্দী ধরে গৌরবহীন এই মানুষের মধ্যে আত্মগরিমা সঞ্চার করতে হবে। অকারণে অপমানিত এই মূক নরকঙ্কালে বাণী দিতে হবে। এদের রোগ শোক অজ্ঞান ক্ষুধা তৃষ্ণা পরমুখাপেক্ষিতা ও মূক অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে। এটাই সাহিত্যের কাজ।

এর থেকে ছোট উদ্দেশ্যকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই দিই না। কি লিখবেন, কেমন করে লিখবেন, ও কোন ভাষায় লিখবেন, এদের দিকে তাকিয়েই এ-প্রশ্নের সমাধান করুন। যদি এদের মনুষ্যত্বের উঁচু আসনে বসাতে না পারেন, তবে সাহিত্যিক নামে পরিচিত হতে পারবেন না। একথা প্রয়োজন যে স্বয়ং মানুষ না হয়ে, নিজে ছোট ছোট তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটির ওপরে না উঠতে পারলে, কোনও ব্যক্তি আর একজনকে তুলতে পারে না। মানুষের সেবা করতে হলে সাহিত্যসাধকদের দেবতা হতে হবে: নান্যঃ পন্থা বিদ্যত্যেপনায়।

আমার মতো সম্ভবত আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করেন, এই বহুধা-বিভক্ত জনসমুদায়কে একজোট করতে হবে। যদি একথা সত্যি হয়, তাহলে আমি মনে করি যে আমরা এখনও সাহিত্য শুরুই করিনি। কত জনসমূহের পরিচায়ক গ্রন্থ আমরা হিন্দিতে লিখেছি? এই বিশাল মানবসমাজের রীতিনীতি, আচারবিচার আশা আকাঙ্খা, উত্থান-পতন বোঝার জন্যে আমাদের ভাষায় কত বই আছে? এদের জীবনকে সুখময় করার সাধন, এদের ভূমি, এদের পশু, এদের বিনোদ-সহচর, এদের পেশা, এদের বিশ্বাস, এদের নতুন নতুন মনোবৃত্তির গবেষণা করেছি? গণদেবতার সামনে রাখার মতো সেই সহানুভূতি ও ব্যথার প্রমাণ কোথায়? হিন্দির উন্নতির মানে হল হিন্দি বলতে ও বুঝতে পারা লোকেদের উন্নতি।

আমার এই দেশ কোনও নতুন সাহিত্যিক প্রয়োগ করতে বেরোয়নি। এর সাহিত্যিক ঐতিহ্য বেশ ধারাবাহিক ও গম্ভীর। সাহিত্যের ভেতরে মানুষ যা কিছু ভাবতে পারে, সেই সব কিছুর প্রয়োগ এদেশে সাফল্যের সঙ্গে হয়ে গেছে। এতো আমার ভাষার দুর্ভাগ্য যে আমাদের প্রাচীন চিন্তারাশি আমরা সঞ্চিত করিনি। ইংরিজি ফরাসি জার্মান ভাষায় সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃতের ভাল বইয়ের যত ভাল অনুবাদ হয়েছে, হিন্দিতে হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যও লাক্ষণিক প্রয়োগ, আর এতো আসলে সেই বিশাল মানবসমাজের দুর্ভাগ্য যারা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে চায় বা করে। যদি এই বিশাল সাহিত্য নিজের ভাষায় অনূদিত হতো তাহলে আজ সম্পূর্ণ সমাজকে দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী করে তোলা সেই হাজার

বছরের অপপ্রচার ও হীনভাবনার শিকার হওয়া থেকে আমাদের সাহিত্যিকরা সহজেই বেঁচে যেত। বিভিন্ন স্বার্থের পোষক-প্রচার এই দেশের অতিমাত্র বৈশিষ্ট্যের ডঙ্কা বাজিয়ে থাকে।

ইতিহাসকে কখনও ভৌগলিক ব্যাখ্যার ভেতরে, কখনও জাতিগত ও কখনও ধর্মগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রতিফলিত করে বোঝানো হয়, হিন্দুস্তানি যেমন আছে, তাদের সেইরকম হতেই হবে আর সেইরকম হয়ে থাকাই তাদের পক্ষে ভাল। প্রচারকেরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের যে অ-ভদ্র ব্যাখ্যা করেছেন তা আমাদের প্রতিটি শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। যদি ওই বিষ দূর করতে হয় তাহলে প্রাচীন গ্রন্থের দেশি প্রামাণিক সংস্করণ ও অনুবাদ ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু শুধু অন্য স্বার্থপর লোকদের অপপ্রচারের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যেই নিজের ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থ ভরে ফেলতে হবে, তা নয়। বিদেশি পণ্ডিতরা অপূর্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের অধ্যয়ন মনন ও সম্পাদনা করেছেন। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু এ কথা ভোলা উচিত নয় যে অধিকাংশ বিদেশি পণ্ডিতদের কাছে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র প্রদর্শনীয় বস্তুর সমান। এগুলির প্রতি তাদের যা সম্মান তাকে ইংরিজিতে 'ম্যুজিয়াম ইন্টারেস্ট' শব্দ দিয়েও বোঝানো যেতে পারে। প্রদর্শনীতে রাখা বস্তু আমরা প্রশংসা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি; কিন্তু নিশ্চিত জানি যে নিজেদের জীবনে তার ব্যবহার করতে পারি না। কোনও প্রদর্শনীতে কোনও মোগল সম্রাটের চোগা দেখতে পেলে আমরা যতই তার প্রশংসা করি, কিন্তু নিশ্চিত জানি, পরতে পারব না। আমাদের দেশবাসীর কাছে ভারতীয় শাস্ত্র প্রদর্শনীর বস্তু নয়, বরঞ্চ আমাদের রক্তে মিশে আছে। ভারতবর্ষ আজও তার ব্যবস্থার ওপর চলে এবং প্রেরণা পায়। এইজন্যে আমাদের নিজেদের ঢঙে এই গ্রন্থগুলি সম্পাদন করে প্রকাশিত করতে হবে। এর এমন অনুবাদ প্রকাশিত করতে হবে যা পুরোনো অনুশ্রুতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও অসম্বদ্ধও হবে না এবং আধুনিক জ্ঞানের আলোকে দেখে নিতেও হবে। এ অনেক বড় বিশাল কাজ। সংস্কৃত ভারতবর্ষের মহিমাময়ী ভাষা। সে হাজার হাজার বছরের দীর্ঘসময়ে ও লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলে ছড়িয়ে থাকা মানবসমাজের সর্বোত্তম মস্তিষ্কে বিচরণকারী ভাষা। তার সাধন গহন ও উদ্দেশ্য সাধু। হিন্দির মাধ্যমে সেই ভাষাকে বোঝার চেষ্টাও এক তপস্যা। সেই তপস্যার জন্যে সংযম ও আত্মশক্তির প্রয়োজন আছে। নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে তার গভীর অধ্যয়নে আমাদের লেগে পড়া উচিত। হিন্দিকে যারা সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে তারা তার অধিকাংশ মহিমার সঙ্গে অপরিচিত।

মহান কাজের জন্যে বিশাল হৃদয় থাকা উচিত। হিন্দি সাহিত্য সৃষ্টি সত্যিই মহান কাজ, কেননা তার দ্বারা কোটি কোটি মানুষের ভাল হবে। আজকাল আমরা প্রায়ই গর্ব করে বলে থাকি, ভারতবর্ষে হিন্দি বলা লোকের সংখ্যা সব থেকে বেশি। এতো চিন্তার কথা, কেননা হিন্দি বলা জনসমূহের মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক খিদে মেটানোর কাজ সহজ নয়।

ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশগুলিতে আজকাল হিন্দি সাহিত্য পড়া ও বোঝার তীব্র লালসা জেগেছে। চিন মালয় সুমাত্রা জাভা, সমস্ত এশিয়া থেকে চাহিদা হচ্ছে। এশিয়ার দেশ এখন ইংরিজি বই থেকে পাওয়া তথ্যে সন্তুষ্ট নয়। তারা দেশি দৃষ্টিতে দেশি ভাষায়

লেখা সাহিত্য খুঁজতে আরম্ভ করেছে। ভবিষ্যতে এই জিজ্ঞাসা আরও তীব্র হবে। আমার চিন্তা যে আমরা কি এই শ্রদ্ধার উপযুক্ত পাত্র হিসাবে নিজেদের প্রমাণিত করতে পারব? যেদিন ইতিহা-বিধাতা বিশ্বজনতার দরবারে আমাদের ঠেলে ফেলবে, সেদিন পর্যন্ত আমরা এতুটুকুও ঠিক করতে পারব না যে আমাদের ভাষা কেমন হবে, তাতে বিভিন্ন ভাষার শব্দের অনুপাত কি হবে আর শব্দের 'শুদ্ধ' 'অ-শুদ্ধ' উচ্চারণের মধ্যে কোনটা গ্রহণ করা হবে?

সম্পূর্ণ জনসমূহে ভাষা ও ভাবের ঐক্য এবং সৌহার্দ্য থাকা ভাল। তার জন্যে তর্কশাস্ত্রী নন, এমন বোঝা ভাবযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন, যে পুরোপুরি সমস্ত বাধা বিঘ্ন স্বীকার করে কাজে লেগে যাবে। তারাই সাহিত্যের নির্মাণ করে এবং ইতিহাসেরও। আজ কাজ করাই বড় কথা। এই দেশে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, স্পৃশ্য আছে, অস্পৃশ্য আছে, সংস্কৃত আছে, ফারসি আছে, বিরোধ এবং সংঘর্ষের বিরাট বাহিনী আছে; কিন্তু সবার ওপরে আছে মানুষ—দিনরাত বিরোধগুলি মনে করতে থাকার চেয়ে নিজের শক্তি সম্বল করে তার সেবায় লেগে পড়া ভাল। আপনার কাছে যা কিছু আছে, ব্যাস তাই দিয়ে মানুষকে ওপরে ওঠানোর কাজ শুরু করে দিন, আপনার ভাষা আপনার উদ্দেশ্য তৈরি করে দেবে।

এদেশে ভাল কথা বলার লোকের অভাব কোনও দিন হয়নি। আজও খুব সততা ও সত্যতার সঙ্গে ভাল কথা বলার লোক এদেশে কম নেই। তারা প্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের মন্ত্র দিয়েছেন। অনাদিকাল থেকে মহাপুরুষেরা আর এক সৌহার্দ্যের বার্তা শুনিয়েছেন। বলা হয়, ব্যাসদেব শেষ জীবনে নিরাশ হয়ে বলেছিলেন; 'আমি হাত তুলে চিৎকার করছি যে ধর্মই প্রধান বস্তু, তাতে অর্থও কাম প্রাপ্তি হয়, কিন্তু আমার কথা কেউ শুনছে না:

ঊর্দ্ধবাহুবিরৌম্যেষ নৈব কবিকচ্ছৃনোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ সধর্ম কিং ন সেব্যতাম্।

কেন এরকম হলো? এজন্যে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ, আর্থিক সংযোজন, আর সামাজিক সংগঠন মূলেই এমন কিছু ভুল থেকে গেছে যে এক দল যাকে ধর্ম মনে করে, অন্যরা তা বুঝতে পারে না। এই বৈষম্য মনে রেখেই প্রেম ও সৌহার্দ্যের কথা শেখানো উচিত। দই যত দুধ ঢালুন, দই হতেই থাকবে। শঙ্কাশীল হৃদয়ে প্রেমের বাণীও শঙ্কা উৎপন্ন করে।

আমরা অল্পবুদ্ধিতে এই বুঝি যে বিভিন্ন স্তরের জন্যে নানা রকমের ভাষা হবে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নানা ধরনের চেষ্টা করতে হবে। সমস্ত প্রতীয়মান বিরোধের সামঞ্জস্য একটি কথাতেই হবে মানুষের কল্যাণ।

ভারতেই হাজারো গ্রাম ও শহরে ছড়িয়ে থাকা শত শত জাতি ও উপজাতিকে বিভক্ত সভ্যতার বিভিন্ন সিঁড়িতে দাঁড়ানো জনতাই আমাদের সমস্ত বক্তব্যের উদ্দেশীভূত শ্রোতা। তাদের কল্যাণই 'সাধ', বাকি সব, সংস্কৃত ও ফারসি, ব্যাকরণ ও ছন্দ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সবকিছু 'সাধন'। তাদের বর্তমান দুর্গতি থেকে বাঁচিয়ে ভবিষ্যতে আত্যন্তিক কল্যাণোন্মুখ করাই আমাদের লক্ষ্য। এই সত্য ও ধর্ম। যা মুখ দিয়ে বলা হয় তাই সত্য।

মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণে যা করা হয় তাহ-ই সত্য। নারদ শুকদেবকে বলছিলেন, সত্য বলা ভাল, কিন্তু হিত বলা আরও ভাল। আমার মতে তাই সত্য, যা ভূতমাত্রেরই আত্যন্তিক কল্যাণ-হেতু হয়ঃ

সত্যস্য বচনং শ্রেয় সত্যদপি হিতং বদেত।
যদ্ভুতহিতমত্যংতমেতত সত্যং মতঃ মম।।

এই সর্বভূতের আত্যন্তিক কল্যাণ সাহিত্যের চরম লক্ষ্য। যে সাহিত্য কেবল কল্পনা বিলাস, যা কেবল সময় কাটানোর জন্য লেখা, তা বড় কিছু নয়। মানুষকে আহার নিদ্রা ইত্যাদি পশুসাধারণের ধরাতল থেকে যা ওপরে ওঠায়, তাই বড়। মনুষ্য শরীর দুর্লভ বস্তু, এ পাওয়াও কম তপস্যার ফল নয়, কিন্তু একে মহান লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ করা আরও শ্রেষ্ঠ কাজ।

এদিকে এমন এক হাওয়া বইছে যে প্রত্যেক সস্তা জিনিসকেই সাহিত্যের বাহন মনে করা হচ্ছে। এই প্রবৃত্তিকে বাস্তবিকতার ভুল নামে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন প্রমাণ দিয়ে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে মানুষের লালসা উন্মুখ বৃত্তিই সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন। কোনও মনোরোগের পক্ষে বা বিপক্ষে আমার কিছু বলার নেই। এইটুকুই বলতে পারি যে সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ধারণের উপায় একটাই হতে পারে, তা মানুষের কল্যাণ সাধন করে কি, করে না। যে কথা বললে মানুষ পশু সাধারণের ধরাতল থেকে ওপরে ওঠে না, সেটি পরিত্যাজ্য। তাকেই সস্তা জিনিষ বলি। সস্তা এই জন্যে যে তার কোনও রকম সংযম বা তপস্যায় দরকার হয় না। ধুলোয় লুটিয়ে পড়া খুব সহজ কিন্তু ধুলোয় লুটোলে পৃথিবীর কোনও বড় উপকার হয় না আর হয় কোনওরকম মানসিক সংযমের প্রয়োজন। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যদি কেউ নিঃসঙ্কোচে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে তবে তাকে আমরা খুব বড় পুরুষার্থ বলতে পারি না। ভয় করার মতোও মানব না, কিন্তু যদি পাঁচ দশজন ভালো-মানুষ বড় গলায় বলা শুরু করে দেয় যে ধুলোয় লুটিয়ে পড়া ওস্তাদি তাহলে একটু ভয় পাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। এর সস্তাপনাই ভয়ের কারণ। মানুষের মধ্যে অনেক আদিম মনোবৃত্তি আছে, যা একটু আশ্রয় পোলই ঝনঝন করে ওঠে। যদি তাদেরও সাহিত্য সাধনার বড় আদর্শ বলা আরম্ভ হয় তাহলেও পালন করার লোকের অভাব হবে না। এই ধরনের কথা এমন উৎসাহিত করা হয় যেন সেই কাজ সাহস ও বীরত্বের।

পুরোনো ও পচা সংস্কারের পক্ষপাতী আমি নই, কিন্তু সংযম ও নিষ্ঠা সংস্কার নয়। তা মানুষের দীর্ঘ চেষ্টায় পাওয়া গুণ এবং তা দীর্ঘ চেষ্টাতেই পাওয়া যায়। তার প্রতি বিদ্রোহ প্রগতি নয়। আদিম যুগে মানুষের বৃত্তিগুলি খুব প্রবল ছিল, এখনও তা নিশ্চয়ই আছে এবং প্রবল হয়ে আছে; কিন্তু মানুষ নিজের তপস্যায় সেগুলো স্ববশ করছে এবং বশ করার জন্যে তা সুন্দর করতে পেরেছে। মানুষের রঙ্গমঞ্চে আসার আগে প্রগতি গড়িয়ে-গড়িয়ে চলছিল। প্রত্যেক কাজ নিজের পূর্ববর্তী কাজের পরিণাম। পৃথিবীর কার্য পরম্পরায় কোথাও ফাঁক ছিল না। যে বস্তু যেমন হওয়ার, তেমনই হবে। এমন সময় মানুষ এলো। সে এই নীরন্ধ্র ঠাসা কার্য পরম্পরায় ফাঁক আবিষ্কার করল। যা যেমন আছে, তাকে তেমনই মানতে

অস্বীকার করল। তাকে সে নিজের মনের মতো তৈরি করার চেষ্টা করল অর্থাৎ, মানুষের পূববর্তী সৃষ্টি যেমন-যেমন তৈরি হচ্ছিল, মানুষ তাকে নিজের অনুকূল করতে চাইল, এখানেই মানুষ পশু থেকে আলাদা হয়ে গেল। সে পশু সাধারণের ধরাতল থেকে ওপরে উঠল। বারবার সেই ধরাতলের দিকে উন্মুখ করা প্রগতি নয়, বরঞ্চ পিছিয়ে যাওয়া। স্বীকার করছি যে কখনও এমন সময় ছিল না, যখন লালসা উত্তেজিত করার মতো সাহিত্য লেখা হয়নি আর এমন কোনও দেশ নেই যেখানে এ ধরনের কথা লেখা হয়নি; কিন্তু আমার বিশ্বাস সামূহিক ভাবে মানুষ এই ভুল বুঝতে পারবে এবং ত্যাগ করবে। এটা ঠিক যে মানুষের ইতিহাস তার ভুলের ইতিহাস, কিন্তু এও ঠিক যে মানুষ সবসময় ভুলকে জয় করেছে। লালসা উত্তেজিত করা সাহিত্য তার ভুল। এক দিন না একদিন সে তাকে জয় করবে।

সত্য নিজের পুরো মূল্য চায়। তার সঙ্গে সমঝোতা হতে পারে না। সাহিত্যের চরম সত্য পাওয়ার জন্যে তার পুরো মূল্য চুকিয়ে দেওয়াই সমীচীন। পদে পদে যারা সোজা সহজ সমাধানের দোহাই দিয়ে থাকে, তারা সম্ভবত কোনও বড় লক্ষ্যের কথা ভাবে না। মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে তার দৈনন্দিন ব্যবহারে আসা বৃত্তির সঙ্গে সমঝোতা করলে চলবে না। কঠোর সংযম ও ত্যাগের সাহায্যেই তাকে বড় করা যেতে পারে। যে কথা একটি ক্ষেত্রে সত্য, তা সাহিত্যে ভাষায় আচারের বিচারে; সমস্ত ক্ষেত্রেই সত্য। ভাষার কথাই ধরুন। মানুষ নিজের আহার ও নিদ্রার সাধন জোগাড়ের জন্যে যে ভাষা ব্যবহার করে তা তার অনায়াসলব্ধ ভাষা, কিন্তু যদি এই ধরাতল থেকে ওপরে উঠতে হয়, তাহলে ওইটুকুতে কাজ হবে না। সহজ ভাষা প্রয়োজন। সহজ ভাষার মানে হলো সহজেই মহান হওয়া ভাষা, রাস্তায় কুড়িয়ে জড়ো করা ভাষা নয়।

সোজা দাগ কাটা খুব কঠিন কাজ। সহজ ভাষা পাওয়ার জন্যে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। যতক্ষণ মানুষ সহজ হবে না, ভাষার সহজ হওয়া ততক্ষণ অসম্ভব। দেশবিদেশের বর্তমান ও অতীতের সমস্ত বাঙ্‌ময়ের রস নিংড়ালে সেই সহজ ভাব পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষ কি বলে বা বলে না, তা দিয়ে সহজ ভাষার অর্থ স্থির করা যেতে পারে না। আসলে, কি বললে বা না বললে মানুষ সেই উচ্চতর আদর্শে পর্যন্ত পৌছতে পারবে থাকে মনুষ্যত্ব বলে, সেটিই আসল প্রধান কথা। সহজ মানুষই সহজ ভাষা বলতে পারে। দানী মহান হলে দান মহান হয়।

গহন সাধনা করে যারা নিজেকে সহজ করতে পারেনি, তারা সহজ ভাষা পেতে পারে না। ব্যাকরণ ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ভাষা তৈরি করা যেতে পারে না; অভিধানে প্রযুক্ত শব্দের অনুপাতে বানানোও যেতে পারে না। কবীরদাস ও তুলসীদাস ওই ভাষা পেয়েছিলেন, মহাত্মা গান্ধীও এই ভাষা পেয়েছিলেন, কারণ তাঁরা সহজ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দান করার ক্ষমতা ছিল। শব্দের হিসাবনিকাশে এই দায়িত্ব পাওয়া যায় না, নিজেকে দলিত দ্রাক্ষার মতো নিংড়ে মহাসহজের সমর্পণ করলেই পাওয়া যায়। নিজেকে নিঃশেষে যে দিতে পারে না, সে দাতা হতে পারে না। নিজের মধ্যে দেওয়ার মতো যদি কিছু থাকে তাহলে ভাষাও সহজ হয়ে যাবে। আগে ভাষা সহজ হবে, তারপর তাতে দেওয়ার মতো যোগ্য পদার্থ ভরে যাবে,

এ ভুল পথ। প্রথমে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করাই সঠিক পথ। এর জন্যে তপস্যা দরকার, সাধনার দরকার, নিঃশেষে নিজেকে দান করার দরকার।

হিন্দি সাধারণ জনতার ভাষা। জনতার জন্যেই তার জন্ম হয়েছিল, আর যতক্ষণ সে নিজেকে জনতার কাজের জিনিস করে রাখবে, জনচিত্তে আত্মশক্তির সঞ্চার করতে থাকবে, ততক্ষণ কারও কাছ থেকে ভয় নেই। সে নিজের ভিতরের অপরাজেয় শক্তির সাহায্যে বড় হয়েছে, লোকসেবার মহান ব্রতের জন্যে বড় হয়েছে আর যদি নিজের মূলশক্তির স্রোত ভুলে গিয়ে না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কেউ তার অনিষ্ট করতে পারবে না। সে বিরোধ এবং সংঘর্ষের মধ্যেই বড় হয়েছে। তার জন্মের সময়েই তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু মরেনি, কারণ জনচিত্ত তার জীবনীশক্তির অক্ষয়স্রোত। সে কোনও রাজশক্তির হাত ধরে পথ চলার ভাষা নয়, সে নিজের ভিতরের শক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করার অদ্বিতীয় ভাষা।

পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কোনও ভাষা নেই যার উন্নতিতে এমনভাবে পদে পদে বাধা দেওয়া হয়েছে, এবং তবুও সেই ভাষা এত অপার শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে। আজ শতশত 'প্ল্যাটফর্ম' থেকে, অগুনতি বিদ্যালয়ে আর প্রেস থেকে নিত্য মুখরিত হওয়া পরম শক্তিশালী ভাষা। জনতার হৃদয়ে তার শিকড় আছে। সে কোটি কোটি নরনারীর আশা আকাঙ্খা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ধর্ম ও বিজ্ঞানের ভাষা। হিন্দি সেবার অর্থ কোটি কোটি মানুষের সেবা। সেই সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

আসলে প্রত্যক্ষ মানুষ আমাদের অধ্যয়নের বিষয়। আপনারা মানুষের ধারাবাহিক জয়যাত্রার গল্প ইতিহাসে পড়েছেন, সাহিত্যে তারই আবেগ, উদ্বেগ ও উল্লাসের স্পন্দন দেখেছেন, রাজনীতিতে তার লুকোচুরির খেলা দেখেছেন, অর্থশাস্ত্রে তার মেরুদণ্ডের শক্তির অধ্যয়ন করেছেন। এই মানুষই আসল লক্ষ্য। আপনি সোজা তার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়তে চলেছেন। প্রত্যক্ষ মানুষকে পড়াই বড় কথা। আমাদের শিক্ষার বেশির ভাগ যে সব দৃষ্টান্তের সাহায্য নেয়, তা আমাদের সামনে আসে না। ইতিহাসকে আমরা যতক্ষণ না এই জীবন্ত মানবপ্রবাহের সঙ্গে এক করে দেখতে পারি ততক্ষণ তা পড়া ব্যর্থ। আমাদের দেশের ইতিহাস যদি সত্যিই আমাদের দেশের হয়—নিশ্চয় আজও আমাদের দেশের ধুলির কণায় কণায় তার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। যতক্ষণ না দেশের প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, ততক্ষণ ইতিহাসর যথার্থ জ্ঞান কি করে পাব? আমাদের মধ্যে তারা নিজেকে শিক্ষিত মনে করে, তাদের উঁচু অট্টালিকা থেকে নিচে নেমে দেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে থাকা বিশাল, বিস্তৃত ভূভাগ ও সজীব চিন্তাধারাকেই প্রধান পাঠ্য বই করতে হবে। এই মহাগ্রন্থ বোঝার জন্যে বইকে সাধন মানা উচিত। নোটবই বা সহায়ক বই তৈরি করার মানসিকতা নিষ্ঠুরভাবে দমন করা উচিত। নৃতত্ত্বের বই আমরা যে পড়ি না তা নয়, কিন্তু যখন আমরা দেখি যে গ্রন্থ পড়ার জন্যে আমদের আশেপাশে যেসব চামার জেলে তাঁতি কুমোররা থাকে, তাদের সম্পর্কে জানার জন্যে আমাদের মনে এতটুকু উৎসাহ হয় না, তখন ভালভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে বই সম্পর্কে আমাদের ভেতরে কত অন্ধবিশ্বাস হয়েছে, বইকে আমরা কত বড় ভাবি আর বই যাদের ছায়া তাদের কত তুচ্ছ মনে করি! এতো খারাপ কথা। এসব শোধরানো উচিত। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেকেন্ডহ্যান্ড জ্ঞানের প্রাধান্য

স্থাপিত হওয়া বাঞ্চনীয় নয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থাপিত হয়ে গেছে। সত্যি যদি আমাদের নতুন কিছু করতে হয় তাহলে অনেক চেষ্ট করতে হবে। সমস্ত দেশের মস্তিষ্কে যে জড়-সংস্কার সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সঙ্গে লড়তে হবে। তখনই তার সমর্থন হতে পারে, যখনই আমরা দৃঢ় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাব।

হয়তো মাতৃভাষা এবং তার সাহিত্য দিয়ে দেশসেবা করা সম্ভবতঃ আপনাদের অনেকের রাস্তা, কিন্তু ভালভাবে আমাদের বুঝে নেবার প্রয়োজন যে সাহিত্যসেবা বা মাতৃভাষাসেবার অর্থ কি! কাকে সামনে রেখে আপনি সাহিত্য লিখতে চলেছেন? আপনার বক্তব্যের উদ্দেশ্য কোন শ্রোতা? হিন্দি তো কোনও দেবদেবীর মূর্তির নাম নয়। হিন্দি সেবার অর্থ হিন্দির প্রতিমা তৈরি করে পূজা করা নয়। এতো বাচ্যার্থে প্রয়োগ। তার অর্থ হলো হিন্দির মাধ্যমে বুঝতে পারা বিশাল জনতার সেবা। কখনও কখনও এই ভাষার প্রতি অন্যায় দেখে আমরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ভুলভাবে স্বভাষা প্রেমের পরিচয় দিই। নিজের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি-প্রেম খারাপ কথা নয়, কিন্তু যে প্রেম জ্ঞান দ্বারা চালিত ও অনুশাসিত হয়, তাই ভাল। শুধু জ্ঞান হলো বোঝা, শুধু শ্রদ্ধা অন্ধ করে দেয়। হিন্দির প্রতি আমাদের যে ভালবাসা তাও জ্ঞান দ্বারা চালিত ও শ্রদ্ধা দ্বারা অনুগমিত হওয়া উচিত। সঠিক ভাবে আমদের বুঝতে হবে যে হিন্দির শক্তি কোথায়? হিন্দি এইজন্যে বড় নয় যে আমরা কিছু লোক এই ভাষায় গল্প বা কবিতা লিখি, অথবা সভা সমিতিতে বক্তৃতা করি। না, এইজন্যে বড় যে সে এদেশের কোটি কোটি জনতার হৃদয় ও মস্কিষ্কের খিদে মেটাবার সাধন হতে পারে। দীর্ঘকালের তপস্যা ও মননে আমাদের পূর্বপুরুষ যে জলরাশি সঞ্চিত করেছেন, তাকে সংরক্ষিত রাখার এটি খুব মজবুত পাত্র, অকারণ ও সকারণ, শোষিত ও পোষিত, মূঢ় নির্বাক জনতা পর্যন্ত এই জীবন্ত ও সমর্থ ভাষা দ্বারা আশা ও উৎসাহের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। যদি আমরা জনসাধারণ পর্যন্ত আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান পৌঁছে দিতে চাই, তবে সে কাজ এই ভাষার সাহায্যে করতে পারি। এই সম্ভাবনার জন্যই হিন্দি বড়। যদি সে একাজ করতে না পারে তাহলে 'হিন্দি-হিন্দি' চেঁচানো বেকার। যদি সে একাজ করতে পারে তবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই মহান উদ্দেশ্যের অনুকূলে থাকতে পারলেই সে এদেশে হিমালয়ের মতো অচল হয়ে থাকবে। হিমালয়ের মতোই উন্নত, তার মতোই মহান, জনতার ভাষা হিন্দি। জনতার জন্যেই তার জন্ম হয়েছিল, যতক্ষণ জনচিত্তে সে আত্মবল সঞ্চারিত করতে থাকবে, তার হৃদয়ে ও মস্তিষ্কের খিদে মেটাতে থাকবে, ততক্ষণ তার জীবন সার্থক। যারা এই ভাষা ও সাহিত্যসেবার ব্রত নিতে চলেছে, তাদের এই কথা কখনও তোলা উচিত নয়।

ভারতবর্ষ কি? অনাদিকাল থেকে বিভিন্ন জাতি তার নিজের নানারকমের সংস্কার আচারবিচার ইত্যাদি নিয়ে এদেশে আসছে। এখানেও অনেক রকমের মানবীয় সমূহ বিদ্যমান আছে। এই জাতিগুলি কিছু সময় ঝগড়া করেছে, ঝগড়াঝাঁটি করে আবার পাশাপাশি ভাইয়ের মতো বসতি গড়েছে। ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সংস্কার, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন আচারবিচারের জীবন্ত সমন্বয়। এর স্বাভাবিক বিকাশে বিদেশি পরাধীনতা বাধা দিয়েছে। তার বাহ্যিক রূপ বিচিত্ররকমের দেখা যাচ্ছে। এই বৈচিত্র্যভরা জনসমুদায়কে আশা উৎসাহের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই সাহিত্যসেবার লক্ষ্য। হাজারো গ্রাম ও শহরে ছড়ানো, শতাধিক জাতি

ও উপজাতিতে বিভক্ত, সভ্যতার নানা ধাপে স্থির থাকা জনতাই আমার চেষ্টার প্রধান লক্ষ্য। এদের কল্যাণই সাধ্য। বাকি সব কিছু সাধন। নিজের ভাষার ওপর আপনি যে অধিকার পেয়েছেন, তাই শেষ নয়। তা সাধন। এই ভাষার সাহায্যে আপনাকে জনতা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। তাকে নিরাশা ও সাহসহীনতা থেকে বাঁচানো আপনার কর্তব্য, কিন্তু তা খুব সরল কাজ নয়। শুধু ভাল করার ইচ্ছাতে সে কাজ হবে না। আজকের সমস্যা অত্যন্ত ঝামেলা ভরা ও জটিল। বিজলি বাতি যে ফুঁ দিয়ে নেভানো যায় না তা আমাদের বুঝতে হবে, যে দুর্গতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি, তার যথার্থ কারণ কি? সাহিত্যসাধক শুধু কল্পনাজগতে ঘুরে বেড়িয়ে, 'হায় হায়' অথবা 'বাহ-বাহ' করে চেঁচিয়ে নিজের সামনের কুৎসিত কুরূপ বদলাতে পারে না। সেই সমস্ত বিদ্যা আমাদের শিখতে হবে, যা বিশ্বরহস্যের নতূন নতূন দ্বার খুলেছে, যা প্রকৃতির সমস্ত গুপ্ত ভাণ্ডারে হামলা করার জন্য বদ্ধপরিকর, যা মানুষকে অসীম সুখ ও সমৃদ্ধি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। তারপর সেই স্বার্থশক্তিকেও আমাদের বুঝতে হবে, যা এই এই বিদ্যার অপপ্রয়োগ করে সর্বত্র মানুষকে লাঞ্ছিত আর অপমানিত করছে। মানুষের জীবন নিয়েই সাহিত্যের কারবার। যারা আজও ভাবেন যে সাহিত্যে কিছু কিছু বিশেষ বিষয়ই পড়ার আছে, তারা বড় ভুল করেন। আজ যদি সত্যিই আপনি জনতার দুর্দশা শেষ করতে চান, তাহলে যে রাস্তাই নিন না কেন, রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারবেন না, অর্থনীতির উপেক্ষা করতে পারবেন না ও বিজ্ঞানের নতুন প্রবৃত্তির সঙ্গে অপরিচিত থেকেও কিছু করতে পারবেন না। সাহিত্য কেবল বুদ্ধিবিলাস নয়। জীবনের বাস্তবিকতা উপেক্ষা করে সে সজীব থাকতে পারে না।

সাহিত্য উপাসক নিজের পায়ের তলার মাটি উপেক্ষা করতে পারে না। সমস্ত বাইরের জগত অ-সুন্দর করতে পারে না। সমস্ত বাইরের জগত অ-সুন্দর রেখে আমরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারি না। সৌন্দর্য সামঞ্জস্যের নাম। যে পৃথিবীতে ছোট বড়, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞানীর মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য আছে, সেই পৃথিবীকে বাহ্য সাম্যঞ্জস্যময় বলা যেতে পারে না; আর এইজন্যে সে সুন্দরও নয়। এই বাহ্য সৌন্দর্যের 'ঢিবি'তে দাঁড়িয়ে আন্তরিক সৌন্দর্যের উপাসনা করা যেতে পারে না। সেই বাহ্য অ-সৌন্দর্যকে দেখতেই হবে। নিরন্ন, নির্বাসিত জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে আপনি পরীর সৌন্দর্যলোকের কল্পনা করতে পারেন না। সাহিত্য সুন্দরের উপাসক, এইজন্যে প্রথমে সাহিত্যিককে অসামাঞ্জস্য দূর করার চেষ্টা করতে হবে, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের সঙ্গে লড়তে হবে, ভয় ও গ্লানির সঙ্গে লড়তে হবে। সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের মধ্যে কোনও সমঝোতা হতে পারে না। সত্য নিজের পুরো মূল্য চায়। তার দাম মিটিয়ে দেওয়াই তাকে পাওয়ার সোজা ও একমাত্র রাস্তা। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। আমাদের দেশের বাহ্যরূপ চোখ কান মন বুদ্ধি কারও পক্ষেই সুখকর নয়। এটাই সত্য।

যদি কোনও দেশের বাহ্যরূপ সম্মানযোগ্য বা সুন্দর না হয়ে থাকে, তবে বোঝা উচিত যে রাষ্ট্রের আত্মায় এক উচ্চ জগতের নির্মাণ কাজ শুরুই হয়নি। অর্থাৎ আসল সাহিত্যসৃষ্টির শ্রীগণেশ হয়নি। সাহিত্যই মানুষকে অন্তর থেকে সুসংস্কৃত আর উন্নত করে এবং তখনই তার বাহ্যরূপ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যবান দেখা যায়। বাহ্যরূপ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যবান হলে তার আন্তরিক স্বাস্থ্যও তৈরি হয়। দুটি কথাই একে অপরের আশ্রিত। আমাদের দেশে যখন

নানারকমের কুসংস্কার ও নোংরামি বর্তমান, আমাদের শরীর যখন পর্দায় ঢেকে আছে, আমাদের নব্বই শতাংশ জনতা যখন অজ্ঞানের আবর্জনার নিচে চাপা পড়ে আছে, আমাদের তখন মেনে নেওয়া উচিত যে দিল্লি অনেক দূর। সাহিত্যের নামে আমরা যা কিছু করছি, যা কিছু দিচ্ছি, তার মধ্যে কোথাও ভারি খামতি রয়ে গেছে। আমাদের ভিতর ও বাহির এখনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। যতক্ষণ আমরা পাঠকের মধ্যে সমস্ত মানবসমাজকে বাইরে এবং ভেতর থেকে সুন্দর ও সম্মানযোগ্য দেখার জন্যে ব্যাকুল রাখার মতো অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগাতে না পারি, সাহিত্যসাধনা ততক্ষণ বন্ধ্যা হয়েই থাকবে। যদি এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তবে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে অবশ্যই নিজ শক্তি অনুসারে উক্ত ইচ্ছাপূরণে সহায়ক সেই সামগ্রী সংগ্রহ করে নেবে। যদি এই আকাঙ্ক্ষা না জাগে তবে যত লেখাপড়াই করা হোক না কেন, তা জঞ্জাল বলেই প্রমাণিত হবে আর দুনিয়াদারি ও চালাকির মিথ্যাচার হয়েই থাকবে। যে সাহিত্যিক নিষ্ঠাপূর্বক ইচ্ছা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে, সে স্বয়ং রাস্তা খুঁজে বার করবে। সাধনের স্বল্পতায় কোনও মহৎ ইচ্ছা আজ পর্যন্ত থেমে থাকেনি। খিদে থাকা চাই। একবার খিদে পেলে খাদ্যসামগ্রী জুটেই যায়, কিন্তু ভরপুর খাদ্যসামগ্রী থাকলেই খিদে পায় না। জন্ম নিয়েই গরুড় বলেছিল, 'মা খুব খিদে পেয়েছে।' মাতা বিনতা ঘাবড়ে গিয়ে বিলাপ শুরু করেছিল: এই প্রচণ্ড ক্ষুধাশালী পুত্রকে কোথা থেকে অন্ন দিই। পিতা কশ্যপ আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কোনও চিন্তার কথা নয়। মহান পুত্র উৎপন্ন হয়েছে, কারণ তার খিদে মহান।' আমাদের ভাষাও এখনও প্রচণ্ড সাহিত্যিক ক্ষুধাসম্পন্ন মহান পুত্রের প্রয়োজন আছে। আমাদের মাতারূপী ভাষার গর্ভ থেকে যতক্ষণ না এমন পুত্র জন্ম নিচ্ছে, ততক্ষণই বিনতার মতো সে কষ্ট পাচ্ছে। যেইদিন এমন পুত্রের জন্ম হবে, সেই দিন মাতৃভাষা ধন্য হয়ে যাবে।

এদেশে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ধনী ও গরিব আছে। বিরুদ্ধ সংস্কার ও বিরোধী স্বার্থের বিরাট বাহিনী আছে। পদে পদে এতে ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে; প্রতিক্ষণ বিরোধী-বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে পিষে যাওয়ার ভয় আছে, সংস্কার ও ভাবাবেগের শিকার হওয়ার ভয় আছে, কিন্তু এই সমস্ত বিরোধ ও সংঘাতের থেকেও অন্য সব কিছু বড় ছাপিয়ে মানুষ বিরাজ করছে। মানবকল্যাণে নিজেকে নিঃশেষে দান করেই আপনি সার্থক হতে পারেন। পুরো দেশ আপনার। ভেদ ও বিরোধ বাইরে। ভেতরে মানুষ এক। এই একককে দৃঢ়তার সঙ্গে চেনার চেষ্টা করুন। যারা ভেদাভেদ ধরেই নিজের রাস্তা বার করতে চায়, তারা ভুল করে। বিরোধ থাকলে ভবিষ্যতে তা থাকবে, কোনও কাজের কথা নয়। নতুন করে আমাদের সবকিছু গড়তে হবে, ভাঙতে নয়, ভাঙাকে জুড়তে হবে। ভেদাভেদের জয়মালায় আমরা পারে নামতে পারাব না। চিন্তিত হয়ে কবীর বলেছিলেন:

কবীর এ সংসারকে বোঝাই কতবার।
লেজ যে ধরে ভেদের, নামতে চায় পার।।

মানুষ এক। তার সুখদুঃখ বোঝা, তাকে মনুষ্যত্বের পবিত্র আসনে বসানোই আমাদের কর্তব্য।

উনিশ

কবীর : এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

কবীরদাসের বাণী সেই লতা, যা যোগক্ষেত্রে ভক্তিবীজ পড়ায় অঙ্কুরিত হয়েছিল। সেই সময় উত্তরের হঠযোগী ও দক্ষিণের ভক্তদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। একদল ভাঙলেও মচকাত না, অন্যদল মচকালেও ভাঙত না। একদলের কাছে সমাজে উঁচুনিচু ভেদাভেদের ভাবনা ঠাট্টা ও আক্রমণের বিষয় ছিল, অন্যের কাছে মর্যাদা ও স্ফুর্তি ছিল। তবুও বিরোধাভাস হলো এই যে, একদল যেখানে সামাজিক বৈষম্যকে অন্যায় মনে করেও ব্যক্তিকে সবার ওপরে রাখত, অন্যরা সেখানে সামাজিক উচ্চতার অধিকারী হয়েও নিজেকে 'তৃণাদপি সুনীচেন' (তৃণের চেয়েও তুচ্ছ) মনে করত। যোগীরা শক্তভাবে জাতিভেদের ওপর আঘাত করত, বাহ্যাচার ও তন্মূলক শ্রেষ্ঠত্বকে ভর্ৎসনা করত, কিন্তু ভিতরে এবং বাইরে, যোগমার্গের প্রত্যেক অনুসরণকারী নিজেকে সমাজের অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবত, অন্যের বহির্মুখী বৃত্তির ওপর করুণা করত, নানান প্যাঁচালো কথায় তাদের ঠাট্টা করত ও আশা করত যে তাদের আশ্চর্য করিশমা দেখে লোক অবাক হয়ে যাব। ভক্ত জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ও উঁচুনিচু মর্যাদা পুরো স্বীকার করে নিত, নিজের পুরোনো পাপবোধের জন্যে অনুতাপ করত, আশা করত সর্বান্তর্যামী ভগবান অবশ্যই তার হৃদয়ের অনুতাপ শুনে ভববন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করবেন। একজনের ছিল জ্ঞানের অহংকার, অন্যের অজ্ঞানের ওপর ভরসা। একজনের কাছে পিণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড আর অন্যের কাছে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই পিণ্ড ছিল, একজন নিজের ওপর, আর অন্যজন রামের ওপর ভরসা করত। একজন প্রেমকে দুর্বল ভাবত আর অন্যজন জ্ঞানকে কঠোর মনে করত। একজন ছিল যোগী আর অন্যজন ভক্ত।

সাধারণ জনতার মধ্যে দু-দলের কাছ থেকে দু-রকমের প্রতিক্রিয়া হলো। একজন শ্রদ্ধাশীল গৃহস্থের মনে শঙ্কাভাব সৃষ্টি করল। সে ভাবতে লাগল মায়ার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন, সিদ্ধির পথ বিঘ্নসংকুল। যোগক্রিয়াহীন ব্যক্তির না জানি কি দুর্গতি হবে, চুরাশি লক্ষ যোনিতে না জানি কতদিন ঘুরে বেড়াতে হবে। বিকট ভবজাল, অনন্ত মায়াচক্র, সাধন পথ দুরধিগম্য, বিঘ্নবাহিনী রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে আর গৃহস্থ নিরুপায়। দ্বিতীয় (ভক্ত) জন তাকে অখেয়ালি করে দিয়েছে। ভুল করেও যে একবার হরিনাম নিয়েছে তার আর কিছু করার দরাকার নেই, কপালে একবার যদি বিষ্ণুর তিলক কেটে ফেলে, তাহলে বৈকুণ্ঠের দরজা খোলা, কোনওরকমে যদি তুলসিমালা পেয়ে যায় তাহলে গোলকে স্থান নিশ্চিত। সবযুগের মধ্যে কলিযুগ ভাল, কারণ এখানে মানসপাপের কোনও ফল হয় না, অথচ মানসপুণ্যের পুরো ফল পাওয়া যায়। রামনাম রামের চেয়েও বেশি সংশয়গ্রস্ত ও ভক্তি পুরো আশাবাদী করেছিল। একজন মুক্তিকে খুব আক্রাসওদা, অপরজন সস্তা করে দিয়েছিল। যোগে গলদশ্রু ভাবুকতার কোনও জায়গায় নেই। যে ভক্তি পদে পদে ভক্তকে কম্প আবেগ জড়তা ও রোমোদগম্ অবস্থায় নিয়ে আসে, তা এক্ষেত্রে অপরিচিত ছিল।

আর সত্যিই যদি ভাগ ও বিভাগ কল্পিত হয়, কল্প-বিকল্প বেকার হয়, সংসার মৃগমরীচিকা হয়, পরমতত্ত্ব বিভাগ ও অবিভাগের উর্ধ্বে হয়, সূক্ষ্ম ও স্থূলের অতীত হয়—যদি সে একরস, সমরস হয় তবে কান্নাকাটি করে কি হয়? অখণ্ডচৈতন্য স্বরূপ অমায়িক পরমপুরুষের সামনে এই বিলাপ কেন? সেই গুণহীন বিকারহীন ময়ামায়াহীনের পূজা ও স্তুতি কেন? নির্মমতা ও অমায়িকও হলো যোগের প্রথম শর্ত। এইজন্যে সে নিজ অনুগামীদের কঠোর করে দেয়। যোগী পরম্পরায় কবীরদাস এই কঠোরত্ব পেয়েছিলেন। সংসারে ঘুরে বেড়ানো জীবদের দেখে তিনি করুণা-অশ্রুতে কাতর হয়ে পড়তেন না, বরঞ্চ আরও কঠোর হয়ে ভর্ৎসনা করতেন। প্রহ্লাদের মতো সমস্ত জগতের পাপ নিজের ওপর নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন না, বরঞ্চ আরও কঠোর হয়ে সুরত ও বিরতের উপদেশ দিতেন। সংসারভ্রমে থাকা লোকের ওপর কীসের দয়া, মুক্তি পথে আগুয়ানদের আরাম কোথায়, কর্মরেখার ওপর খুঁটি না পুঁততে পারলে কেমন সাধক?

জ্ঞান গোলা করে সুরতি ডান্ডা হাতে
খেল চৌগান মাঠ মাঝে।
জগৎ ভ্রম ছাড়ি দাও বালক
এস বেশধারী ভগবান চরণ মাঝে।।
শেষ মস্তক পরে রাখেন চরণ।
জিতে কামদল শুদ্ধ কমলদল করে
ব্রহ্মাকে বিঁধি ক্রোধ সারে।
পদ্মাসন করি করে পবন সাথে পরিচয়
গগনমহল পরে মদন জ্বালায়।
কহে কবীর কোন সন্তজন জুহুরি
কর্মরেখা পরে মেষ মারে।। (শব্দ, পৃ: 50)

কিন্তু স্পষ্ট কাঠিন্য কবীরদাসের প্রধান গুণ নয়। তিনি যখন অবধূত বা যোগীকে সম্বোধন করেন তখন তার কাঠিন্য উর্ধ্বমুখী হয়। তিনি যোগের বিকট রূপের অবতারণা করেন, গগন ও পবনের ধাঁধা মেলান, শূন্য এবং সহজের রহস্য জিজ্ঞাসা করেন, দ্বৈত অদ্বৈতের চর্চা করেন এবং অবধূতের অজ্ঞানের ওপর কুটিল হাসি হেসে থাকেন:

অবধূত অক্ষর সম অদ্ভুত।
যদি পবনে গগন চড়াও, কর গুহাবাস।।
গগনপবন দুই বিনাশে, গেল কোথা যোগ তোমার।
গগনমাঝে জ্যোতিচমকে, জলমাঝে তারা।।
কমিলে নীর বিনাশিবে তারা, গেল প্রকাশী কার দ্বারা।
মেরুদণ্ড পরে ডাল দোলে, আনিল যোগী তারা।।
সেই ঘুমের পরে খাক উড়াই, যোগ গেল কাঁচা।

ইঙ্গলা হয় নাশ, পিঙ্গলা হয় নাশ, হয় নাশ সুষুম্মা নাড়ি।
যবে উন্মন তারা ভাঙে, তখন কোথা থাকে তোমারি।।
অদ্বৈত বিরাট কঠিন হে ভাই, যায় আটকে মুনিবর যোগী।
অক্ষর দেখি গম্য বলে, হয় সে মুক্ত বিরোগী।।
কথ আর অকথ অদ্ভুত দুই সৎ-অসৎ পার।
কহে কবীর দেখি সেই যোগী, নামি যায় ভবপার।।

যোগী এই ভাষাই বোঝে। যদি সমাধি মাত্রগম্য নির্মমের ভজনপূজন বিহিত নয় তাহলে যোগীকেও পাল্টা শুষ্কতা ও সেই নির্মমতার সঙ্গে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে বাবা, উন্মীলন পর্যন্ত ঠিক আছে, তুমি সেখানে মেনে নিয়েছ যে অক্ষর-পুরুষের সাক্ষাৎ হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর? যখন সমাধি ভাঙল, যখন উন্মীলনের তারা খসে গেল, তখন? তখন তো আবার সেই ভবজালে ফিরে এলে? এখন তোমার কী গতি হবে? সুতরাং অবধূতের সঙ্গে কথা বলার সময় কবীরদাস স্পষ্ট কাঠিন্য নিয়ে এবং নিজ ব্যক্তিত্ব অনেক দৃঢ় করে বলেন, কারণ তিনি অবধূত মনোভাব চেনেন। একবার যদি তার ব্যক্তিত্ব ওপরে উঠিয়ে নেওয়ার ছাড় দিয়ে দেওয়া হয় তবে নাগাল পাওয়া কঠিন হবে। বিরোধিতার অস্ত্রেই বিরোধীকে ঘায়েল করার শিল্পে কবীরদাস খুব ওস্তাদ। গগন এবং পবনের শক্তিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করা লোকের কাছে এই ছোট্ট প্রশ্ন কত সহজ অথচ গায়ে জ্বালা ধরানোর মতো হয়ে ওঠে; 'গগনপবন দুইই বিনাশিত, কোথা গেল যোগ তোমার?'

এসব তাঁর অনধিকার চর্চা ছিল না। সমাধিগম্য পরমপুরুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল, পবন উল্টিয়ে সহস্রাচক্রে নিয়ে গিয়েছিলেন।, সেইখানে গগনের অনন্যসাধারণ গর্জন শুনেছিলেন, অবশেষ অমৃতবর্ষী বর্ষা অনুভব করেছিলেন; সেই মহান পদদর্শন করেছিলেন যেখানে কিনা বিরল ব্যক্তিত্বই যেতে পারেন; যেখানে বেদ ও ধর্মগ্রন্থ যেতে পারে না, সেখানকার গগনগুহায় কোনও দৈব জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে, যেখানে উদয় আর অস্ত হয় না, সেখানে রাত ও দিন পৌঁছয় না, যা প্রেমালোকের সমুদ্র, আনন্দের বিশাল নির্ঝর, যা ভ্রম ও ভ্রান্তির উর্ধ্বে, যা একরস, ব্রহ্মদোলায় নিশ্চিতভাবে তিনি দুলেছিলেন ধর্ম:

করে কল্লোল দরিয়া মাঝে,
ব্রহ্মদোলায় হংস দোলে।
অর্ধ-উর্ধ্বের দোল পড়ে যেথা,
পাল্টে মনপবনের কমল ফোটে।।
গগন গরজে যেথা সদা বরষা ঝরে,
হয় ঝঙ্কার নিত্য বাজে তুরা।
বেদগ্রন্থ গম্য নহে যেথা,
কহে কবীর কেহ রসে সুরা
গগনগুহা সেথা দৈব জ্যোৎস্না,
উদয়-অস্তের নাম নাহি

দিবস রজনী পাবে না কিছু সেথা,
প্রেম প্রকাশের সিন্ধু মাঝে।।
সদা আনন্দ দুঃখ কষ্ট ব্যাপে না,
পূর্ণানন্দ ভরপুর দেখি যথা
ভরম ভ্রান্তি সেথা কিছু আসে না,
কহে কবীর রস এক দেখিলাম তথা।।
(শব্দ, পৃঃ 104)

তার সব কিছু উড়িয়ে দেওয়া স্বভাব ছিল। ভাল হোক, খারাপ, আসল বা নকল, একবার জড়িয়ে পড়লে যারা জীবন জড়িয়ে থাকা, এই সিদ্ধান্ত তার কাছে মান্য ছিল না। তিনি সত্যের জিজ্ঞাসু ছিলেন, কোনও মোহ মমতা তাঁকে তাঁর পথে বিচলিত করতে পারত না। নিজের ঘর পুড়িয়ে মশাল হাতে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন, এবং তাকেই তিনি নিজ সঙ্গী করতে চেয়েছিলেন যে তাঁর হাতে নিজের ঘর পোড়াতে পারে:

পুড়িয়েছি ঘর মোর, নিয়ে মুড়া হাতে।
পোড়াব এখন ঘর তার, চলে যে মোর সাথে।
স.ক.সা 51৪

আপাদমস্তক তিনি আপনভোলা ছিলেন, ভোলা, যে পুরোনো কৃত্যের হিসাব রাখে না, বর্তমান কর্মকেও সর্বস্ব মনে করে না ও ভবিষ্যতেও সবকিছু ঝেড়েপুছে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যে বৈষয়িক, সবকিছুর হিসাবনিকাশ করে সে আপনভোলা হতে পারে না। অতীত হিসাবের খাতা যে খুলে রাখে সে ভবিষ্যতের ক্রান্তদর্শী হতে পারে না। যে প্রেমে ভোলা, সে দুনিয়ার মাপজোখে নিজের সাফল্যের হিসাব করে না। কবীরের মতো মত্ত লোকের পার্থিব চালাকির সঙ্গে কী সম্পর্ক? তিনি প্রেমে মত্ত ছিলেন কিন্তু নিজেকে সেই ধরনের প্রেমপাগল ভাবতেন না, যারা প্রেমিকের জন্যে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত, যারা অস্থিরতা জ্বালায় প্রেমের চরম ফল পাওয়ার ভান করে, কারণ প্রিয়তম দূরে থাকলে সেই বিরহে অস্থিরতার আসে—অর্থাৎ পাওয়া কঠিন হয়। কিন্তু প্রিয়র সঙ্গে যেখানে ক্ষণিকের জন্যে বিচ্ছেদ নেই, সেখানে ছটফটানি কীসের? যে কলসি ভরা তার জল কি ছলকায়? যেখানে দ্বৈতভাব শেষ হয়ে গেছে সেই অপূর্ব মত্ততায় অস্থিরতা কোথায়?

হই মোরা প্রেম পাগল, হুঁশিয়ারি আমাদের কিবা।
থাকি মুক্ত এ জগৎ হতে, দুনিয়ার সাথে বন্ধুত্ব কিবা।
হয়েছে ছাড়াছাড়ি যার প্রিয় হতে, গলিগলি বেড়ায় ঘুরে।
প্রিয় মোর আছে আমাতে, প্রতীক্ষা মোর কিবা।
পুরাতন সব নাম নিজের, অনেক করে ঠোকে মাথা।
গুরুনাম সত্য মোদের, দুনিয়ার সাথে বন্ধুত্ব কিবা।

প্রিয় না যায় দূর ক্ষণিকের তরে, না যাই দূর প্রিয় হতে।
তারই সাথে হয়েছে প্রেম, অস্থিরতা মোর কিবা।
কবীরা প্রেমের ম'তা, মন হতে কর দূর দ্বিত
চলতে হবে রাস্তা যে কোমল, মাথায় মোর বোঝা ভারী কিবা।।

শব্দ, পৃঃ 16-17

এইজন্যে এই ফক্কড় মহাশয় কারও জালে পড়ার নন। মন লেগে গেলে ঠিক আছে, আর না লাগলে জয়গুরু বলে এগিয়ে গেলেন। দৃঢ়ভাবে যোগ প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন; কিন্তু মনে ধরেননি। এই আশায় যারা নাক কাটিয়েছিল যে বাধা দূর হলেই স্বর্গ দেখা যাবে, সেই নাককাটাদের সামনে তিনি মুখ বুজে থাকতে জানতেন না। তাঁর অসাফল্যে লোকে কি টিপ্পুনি কাটবে তিনি তার পরোয়া করতেন না। কোনও ঢাক ঢোলে ভয়-ভাবনা আর সঙ্কোচ ছাড়াই তিনি ঘোষণা করলেনঃ

আশমানের আশ্রয় ছাড় ভাই
উলটে দেখ ঘট নিজ মন।
নিজেতে কর নিজ সন্ধান
ঝাড় তুমি মনের কল্পনা ভাই।

ক. ব. পৃঃ 133 পদ 87

আশমান অর্থাৎ গগনচন্দ্রের পরম জ্যোতি। যে বস্তু কেবল শারীরিক ব্যায়াম ও মানসিক শান্তি ইন্দ্রিয় সংযমের সাক্ষ্য তা চরম সত্য হতে পারে না। যোগীরা একরকম জড় সমাধির কথা স্বীকার করেন যাতে যোগী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জড় শরীর বিকারকে সিদ্ধি মনে করতে থাকে। পরমপুরুষ যোগের পরম প্রতিপাদ্য, আত্মাগম্য হন, তা চোখ কানের বিষয় নয়। কেবল শারীরিক ও মানসিক কায়দায় দেখতে পাওয়া জ্যোতি জড়মনের কল্পনা মাত্র। তাও বাহ্য নয়। কবীর বলেছেন, আরও এগিয়ে চল। কেবল ক্রিয়া বাহ্য হয়, জ্ঞান চাই, জ্ঞান ছাড়া যোগ ব্যর্থ। কেবল পিণ্ডে—তত্রাপি গগনগুহায় বা শূন্যচক্রে যদি ঘটঘটবাসী পাওয়া যায়, তাহলে তো বিসমিল্লাই ভুল হয়ে গেল। যদি বলো যে তিনি কেবল ভেতরেই আছেন তাহলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লজ্জায় লাল হয়ে যাবে। গগনগুহার বাইরে সব সবকিছু কি ভগবানের বাইরে, তার প্রতিটি কণায় কী প্রভু ব্যাপ্ত নেই, সে কি ব্যর্থই জগতে পড়ে আছে? কিন্তু যদি এর দিকেই তাকাই, স্বীকার করে নিই যে বাইরের পুরো জগতে সেই পরমপুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর তার জন্যে ভেতরে সব শূন্য, তাহলে একথা মিথ্যা। কবীরদাস কতবার 'কমল কুয়ার ব্রহ্মরস' পান করেছেন, গগন হতে ঝরা অমৃত রসের আস্বাদ নিয়েছিলেন। অন্তরে পরমপুরুষ নেই, এতো মিথ্যা। যারা বলে যে তিনি অন্তরে আছেন বাইরে নেই তারা বেকার, সমস্ত বাহ্যজগৎকে লজ্জিত করে, আর যারা বলে যে তিনি ভেতরেই নেই, তারা মিথ্যাবাদি। না বলা কথা কি করে বলবেন ভেবে কবীরদাস হয়রান হচ্ছেনঃ

এমন লও, নয়তো তেমন লও।
কিরূপে বলি আমি, গম্ভীরিয়া লও।
ভিতরে বলি, তো জগৎময় লজ্জা।
বাহিরে বলি তো মিথ্যা সে
ভিতর বাহির, সকল নিরন্তর।
গুরু প্রতাপেই দৃষ্টি লও।

কবীরের এই ঘর ফোঁকা ফাজলামির সবটাই ছিল। আর নির্মম নির্ভীকতাই অখণ্ড আত্মবিকাশের পরিণাম। তিনি কখনও নিজের জ্ঞান, নিজের গুরু ও নিজের সাধনাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেননি। নিজের প্রতি বিশ্বাস কখনও টলেনি। কখনও ভুল বুঝতে পারলে এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবেননি যে তিনি স্বয়ং ভুলের কারণ হতে পারেন। তাঁর মতে, মুল বরাবর প্রক্রিয়ায় হত মার্গে হতো, সাধনায় হতো। সম্ভবত তাঁর নামে প্রচলিত হাজার হাজার ভজনের মধ্যে একটাও আমার কথার প্রতিবাদে উদ্ধৃত করা যেতে পারে না। অখণ্ড আত্মনিষ্ঠায় এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর দুর্বলতা দেখা যায়নি। তিনি বীর সাধক ছিলেন, আর অখণ্ড আত্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করেই বীরত্ব বেড়ে ওঠে। কবীরের কাছে সাধনা বিকট এক সংগ্রাম স্থল ছিল, যেখানে বিরল কোনও বীরই টিকতে পারে। যে নিজের মাথা নামিয়ে দেওয়ার শিল্প জানে না, সে এই পথের পথিক হতে পারে না :

ধরি তলোয়ার ঢোক মাঠে,
দেহ পর্যন্ত করি যুদ্ধ ভাই।
কাটি মাথা শত্রুর পোঁত যেথার সেথা,
আসে নাই শীষ দরবারে।
করে, মত্ততা সন্ত জন যোদ্ধা,
ঘোরে নিশান সেথা গগন ধেয়ে।
কহে কবীর এখন নাম সে সফল,
মৌজ দরবারে ভক্তি পেয়ে।

কবীর যে সাঁইয়ের সাধনা করতেন তা মাগনা পাওয়া যেত না না। সেই রামকে মাথা দিয়েই কেনাবেচা চলতে পারে—

পাবে না সাঁই বিনা দামে, মেলে না কোনও কথায়।
কবীর সওদা রামের সাথে, মাথা ছাড়া কভু না হয়।

রামানন্দের প্রেমভক্তির এই এক অভূতপূর্ব পরিণাম হয়েছে ভক্তির অশ্রু স্বেদ কম্প

মহাভাব হয়ে গেল। ভগবৎ প্রেম বড় জিনিষ, কিন্তু সেই বড় জিনিষ পাওয়ার জন্যে সাধনাও বড় হতে হবে। প্রেমের ব্যাপার মাসির বাড়ি নয় যে কথায় কথায় ন্যাকামি করলেই সমস্ত ফরমাশ পুরো হয়ে গেল। এখানে যে আগে মাথা নামিয়ে মাটিতে রেখে দেয়, তারই প্রবেশাধিকার থাকে—

কবীর এ ঘর প্রেমের, খালায় ঘর নয়।
নামিয়ে মাথা হাতে নিয়ে, যার যে ঘর মাঝে।।
কবীর নিজ ঘর প্রেমের পথ অগম অগাধ।
নামায়ে মাথা ধরিপদতলে, নিকটে তখন প্রেমস্বাদ।।

কোনও খেতে এই প্রেমের চাষ হয় না, হাটে বিকোয় না, তবু যে কেউ চাইলেই পেয়ে যাবে। রাজ হোক বা প্রজা, ব্যাস, একটি শর্ত মানতে হবে, তা হল মাথা নামিয়ে রাখা। যার সাহস নেই, অখণ্ড প্রেমে যার বিশ্বাস নেই, সেই কাপুরুষের এখানে কার্যসিদ্ধি হবে না। হরির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সাহস দেখানোর কথা বেকার; আগে হিম্মত দেখাও, এগিয়ে এসে ভগবান দেখা করবেন। এখানে উথলে ওঠা ভাবুকতা, হিস্টিরিক প্রেমোন্মাদ ও বাগড়াম্বর প্রেম বেকার, নিজের অধিগম্যের ওপর অগাধ বিশ্বাসই এই প্রেমের চাবি; বিশ্বাস যাতে সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই, বাধা নেই।

হয় না প্রেম খেতে, হাটে না বিকায়।
রাজা প্রজা রুচে যার, দিয়ে মাথা তা নিয়ে যায়।।
শূর মাথা নামিয়ে, ছাড়ে, তনের আশ
এসে এগিয়ে হাসে হরি, আসতে দেখে দাস।।
দুঃখময় ভক্তি রামের, ভীরুর নহে এ কাম।
মাথা নামায় হাতে ধরি, নেয় সেই হরি নাম।।

কবীরদাস ভক্ত আর পবিত্রতাকে এক শ্রেণীতে রাখতেন। দুজনেরই ধর্ম কঠোর। দুজনেরই বৃত্তি কোমল, দুজনের সামনেই প্রলোভনের দুস্তর জঞ্জাল, দুজনেই কাঞ্চন পদধর্মী—বাইরে মৃদু, ভেতের কঠোর, বাইরে কোমল, ভেতরে পরুষ। সবার সেবায় ব্যস্ত, কিনু একজনের আরাধিকা পতিব্রতাই ভক্তের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। সতীকে সিঁদুর রেখার পরিবর্তে কাজলরেখা দেওয়া যেতে পারে না, আর কবীরের চোখেও রাম মজে গেছেন, অন্য কেউ মজতে পারে না:

কবীর-রেখা সিঁদুরের, কাজল না দেওয়া যায়।
নয়ন রামে রমিত, দুজন কেমনে সমাহিত হয়।।

ভক্তের এই প্রার্থনা কেবল সতীকেই শোভা পায়:

নয়ন মাঝে আস তুমি, যখনী মুদি নয়ন।
দেখি না অন্য কারে, দিই না দেখিতে অন্য কারেও।।
মোর মাঝে নাই কিছু মোর, আছে যা কিছু সেতো তোর।
তোর করি সমর্পণ তোরে, কি লাগে মোর।।

নিজের প্রতি ও নিজের প্রিয়র প্রতি কবীরদাসের এই যে অবিচলিত বিশ্বাস, তার জন্যেই তাঁর কবিতা অসাধারণ শক্তিময়তা পেয়েছিল। তাঁর ভাব একেবারে হৃদয় হতে বেরোয় এবং শ্রোতাদের সোজা আঘাত করে। যারা এই রহস্য জানে না তারা বেকার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে পাঠকের সময় নষ্ট করে। প্রেমভক্তির এই চারাগাছ না-তো ভাবুকতার আঁচে ঝলসে যায় আর না-তো তুষারপাতে শুকিয়ে যায়। হৃদয়ের পাতালভেদী অন্তঃস্থল থেকে যে নিজের রস সঞ্চার করে। ঝড় তাকে উপড়ে ফেলতে বা জল তাকে বইয়ে দিতে পারে না। এই প্রেমে মাদকতা নেই কিন্তু মত্ততা আছে। কর্কশতা নয় অথচ কাঠিন্য আছে। অসংযম নয় কিন্তু মৌজ আছে, উচ্ছৃঙ্খল নয় কিন্তু স্বাধীনতা আছে, অন্ধ অনুকরণ নেই কিন্তু বিশ্বাস আছে, অশিষ্টতা নেই কিন্তু দৃঢ়তা আছে—প্রচণ্ডতা এর সাফল্যের পরিণাম; উগ্রতা বিশ্বাসের ফল, তীব্রতা আত্মানুভূতির বিবর্ত। এই প্রেম বজ্রের চেয়েও কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল। এতে হারও জয়, জয়ও জয়।

হারি তো হরিনাম আছে, জিতি তো জয়।
খেলি পরব্রহ্ম সাথে, শির যায় তো যায়

ক.গ্র, পৃ 20

এই সারল্য ও বিশ্বাসের জন্যে যেখানে এক স্থানে ভগবানের কাছে তাকে অতিশয় বিনীত ও হতদর্প দেখা যায়, সেখানে অন্যস্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করতে দেখা যায়। কিন্তু তিনি কোথাও অভিযোগ করেননি, ভেঙে পড়ার অভিনয় করেননি, উপালম্ভের ধারা তৈরি করেননি। মহানের মহৎ মর্যাদা তিনি কখনেও নিজের সসীমতায় নোংরা করেননি। সাঁইয়ের প্রতি তাঁর ভক্তি অটল। রামের কুকুররূপে নিজের পরিচয় দিতে কখনও তিনি লজ্জিত হন না। কবীর রামের কুকুর, মুতিয়া তার নাম। এই মুতিয়ার গলায় রামই একটি দড়ি বেঁধেছেন, তাই সে যেদিকে টানে, মুতিয়াও সেদিকে যায়। তু তু করে যখন ডাকে, মুতিয়া তখন তার কাছে চলে যায় আর যখন দূর্-দূর্ করে, বেচারা মুতিয়ার তখন পালানো ছাড়া আর কি উপায় আছে? কবীরদাস বলেন, ভগবান যেমন রাখবেন তেমন থাকাই ভাল, তিনি যা দেন তাই খাওয়া কর্তব্য। এই হচ্ছে নিরীহ সারল্যের চরম দৃষ্টান্ত:

কবীর কুত্তা রামের, মুতিয়া মোর নাম।
গলে রামের রশি, টানে যেথা যাই তথা।।

করলে তু তু লুটিয়ে পড়ি, করলে দূর্-দূর্ তো যাই।
যেমন রাখে হরি রই তেমন, দেয় যা খাই থাই।

ক.গ্র, পৃ 20

এই আত্মসমর্পণের সীমা। এর পরেও মনে প্রতীতি হয় না যে এই প্রেমরস পর্যাপ্ত। কি জানি সেই প্রিয়তমের কি রকমের ঢং পছন্দ, কোন বেশভূষা রুচিকর লাগে। সেই আজব মত্ত প্রিয় সমাগম কেমন হয়:

সন প্রতীতি না প্রেমরস, না এতপে ঢঙ।
কি জানি যে প্রিয় সনে, কেমন হবে রঙ।

ক.গ্র, পৃ 20

এই উক্তি নিজের প্রতি অবিশ্বাস ভাবা ভুল হবে। এতে কেবল প্রেমাতিশয্য ও ঔৎসুক্য প্রকট হয়েছে। ভক্তের নিজের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু প্রিয়র উচ্চতা ও মহিমার প্রতি তার বিশ্বাস আরও বেশি অবিচল, প্রেমিকই ভাবে যে তার প্রিয় প্রেমী যেন কখনও অতৃপ্ত ফিরে না যায়। নিজের অপূর্ণতা এই ঔৎসুক্য আর আশঙ্কার কারণ হয়, নিজের প্রতি অবজ্ঞা নয়।

জানি না, কবীরদাস মুতিয়া নাম কেন পছন্দ করলেন। তাঁর ছেলেবেলার নাম মুতিয়া ছিল, অনুমান করা যায় কি? অসম্ভব নয় । কিন্তু মুতিয়া খুব জীবন্ত নাম। কুকুরের সমস্ত নিরীহতা যেন এই নামেই লেজ নাড়তে নাড়তে সামনে এসে দাঁড়ায়। কখনও কখনও আশ্চর্য মনে হয় যে এই কি সেই ব্যক্তি যিনি বিশবার গগনগুহায় চক্কর মেরে তার প্রতিটি কোণ এমন চিনে ফেলেছিলেন যে বড় বড় অবধূতকেও আহ্বান করতে পারতো, যা শাস্ত্র ও পরম্পরার জটিল জালে ঢুকে এত পরিষ্কারভাবে তার গ্রন্থিগুলি শিথিল করে দেয় যে জাল-বিছানো লোকেরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে; যে মুহূর্তের জন্যেও নিজের জ্ঞান ভুতে চায় না আর যাঁর উক্তি প্রতিপক্ষের ওপর সোজা আঘাত করে। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সরল মানুষই প্রচণ্ড হয়, বিশ্বাসপরায়ণ নিরীহ হয়, নিষ্ঠাবানই বিনীত হয়।

কবীর যখন 'পাণ্ডিত্য' বা 'শেখের' ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হন, তখন তিনি ততটা সাবধান হন না, যতটা অবধূত বা যোগীকে আক্রমণ করার সময় হন। কারণ তত সূক্ষ্মভাবে তিনি পণ্ডিত ও শেখের জ্ঞানভাণ্ডার দেখেননি যত সূক্ষ্মভাবে অবধূতের সাধনা দেখেছেন। সেইজন্যে এই আক্রমণ তত উগ্র হয় না। এমনভাবে তিনি পণ্ডিত বা শেখকে ডাকেন যেন তারা নিতান্ত নগণ্য জীব, কেবল বাহ্যাচারের গাঁঠরি, কেবল কুসংস্কারের পুতুল। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থকে আক্রমণ করার সময় তিনি বেপরোয়া হন আর এইজন্যে তাঁর ঠোঁটে যেন অমনোযোগের হাসি খেলে। এই তুচ্ছ লেখকদের যেন তিনি আক্রমণ করার যোগ্যই মনে করেন না। কিন্তু এই বেপরোয়াভাবের জন্যেই এই আক্রমণে খুব সহজভাবও একটি জীবন্ত কাব্য মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। এই বেপরোয়াভাবেই কবীরের ব্যঙ্গের প্রাণ। সত্যি কথা বলতে আজ পর্যন্ত এমন শক্তিশালী ব্যঙ্গলেখক হিন্দিতে জন্মগ্রহণ করেননি, স্পষ্ট

আঘাত করার মতো তাঁর ভাষা, না বলেই সব কিছু বলে ফেলায় শিল্প ও অত্যন্ত ধারালো প্রকাশভঙ্গিতে অনন্যসাধারণ। আমি জানি যে বাহ্যাচারের ওপর আক্রমণকারী সন্ত ও যোগী কম নেই, কিন্তু কবীরের আগে এমন সহজ ও সরলভাবে ভেঙেচুরে ফেলার মতো ভাষা খুব কমই দেখা গেছে। ব্যঙ্গ সেইখানে, বক্তা যেখানে মুচকি হাসছে আর শ্রোতা জ্বলে পুড়ে উঠছে, তবুও বক্তাকে জবাব দেওয়ায় নিজেকে আরও হাস্যাস্পদ করে তোলা হয়। কবীরদাস এমনই ব্যঙ্গকর্তা ছিলেন:

না জানি তোর সাহেব কেমন হয়।
মসজিদ ভিতর মোল্লা ডাকে, সাহেব কি তোরা বোবা হয়?
পিঁপড়ের পায়ে নূপুর বাজে, সাহেব শোনে তায়।
পণ্ডিত হয়ে আসন করে, মালা লম্বা জপে যায়।।
অন্তরে তোর কপট কাঁচি, সাহেব দেখে তায়।
উঁচু-নিচু বানালো মহল, ভিত গভীর জমায়।।
চলার ইচ্ছা নাহিক, করে মন থাকিতে।
কড়ি কড়ি জুড়লো মালা, রাখে পুঁতে মাটিতে।।
নেয়ার যা কিছু তাই নিয়ে যায়, মরে পাপী বইতে বইতে।
পায় না সতী গজতর কাপড়, বেশ্যা পরে খাসা।
যে ঘরে পায় না ভিখ সাধু, ভরুয়া খায় বাতাসা।।
পায় হীরা পরখ জানে না, কড়ির পরখ করে।
কহে কবীর শোনো ভাই সাধু, যেমন ছিলেন তেমন আছেন হরি রে।।

সাড়া দেবার মতো ভাষা যত সরল ততই শক্তিশালী। পড়ার সময় পরিষ্কার মনে হয় নিজের দিক থেকে বক্তা একেবারে নিশ্চিন্ত। যদি তিনি এত নিশ্চিন্ত না হতেন তাহলে এমন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করতে পারতেন না। কবীরের পূর্ববর্তী সিদ্ধ ও যোগীদের আক্রমণাত্মক উক্তিতে একরকমের হীন মনোভাব পাওয়া যেত। তা যেন শিয়ালের আঙুর ফল টকের প্রতিধ্বনি, কষ্টে না পাওয়ার যে আক্রোশ তার মধ্যে যুক্তি আছে কিন্তু বেপরোয়াভাব নেই। আক্রোশ আছে মত্ততা নেই, তীব্রতা আছে মৃদুতা নেই। কবীরদাসের আক্রমণে রস আছে, জীবন আছে, কারণ তিনি আক্রান্তের বৈভবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না ও নিজেকে সমস্ত আক্রমণযোগ্য দুর্গুণ থেকে মুক্ত মনে করতেন। এইভাবে, একদিকে তিনি যেমন বেপরোয়াভাবের বর্ম পেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনই অখণ্ড আত্মবিশ্বাসের কৃপাও পেয়েছিলেন।

কবীর সেই সমাজে পালিত হয়েছিলেন যা হিন্দু দ্বারা সমাদৃত ছিল না, মুসলমান দ্বারা পূর্ণত স্বীকৃতও ছিল না। বংশ পরম্পরায় তাঁকে জ্ঞান অর্জনের অযোগ্য মনে করা হতো। বাইরের প্রলোভন হোক বা ভিতরের আঘাত, মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজধর্ম গ্রহণ করার জন্যে তাঁর মধ্যে রাজকীয় গরিমা সঞ্চারিত হয়নি, কিংবা পুরোনো দিনের হীনমন্যতা থেকে তাঁকে উদ্ধার করতেও হয়নি।

নামে মাত্র মুসলমান এই তাঁতি জাতির রক্তে প্রাচীন যোগমার্গী বিশ্বাস পুরোপুরি বজায় ছিল, কিন্তু তাদের জন্যে শাস্ত্রজ্ঞান পাওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরা দারিদ্রে জন্ম নিত, দারিদ্রে পালিত হতো আর তাতেই মারা যেত। এমন বংশে জন্মানো ব্যক্তির কাছে কল্পিত উঁচু-নিচু ভাবনা ও জাতি ব্যবস্থার শক্ত গঠন যুক্তিতর্কের বস্তু না হয়ে জীবনমরণের প্রশ্ন হয়। ভাগ্যবশত স্পষ্টভাবে অনুচিত সমাজব্যবস্থাকে উচিত প্রমাণ করার সেই সব যুক্তি তিনি জানতেন না। সেইসব শাস্ত্রীয় মত থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন যা সামাজিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল দেখাতেই সমাজের কল্যাণ মনে করে। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যাচারের জীবন্ত প্রতিক্রিয়া শাস্ত্রীয় বিচারের অভিজ্ঞতার জন্যে নির্ভীক আক্রমণ করত ও নিজের নির্দোষ হওয়ার পরিপূর্ণ ভরসা তাদের আত্মবিশ্বাসকেও আক্রামক তৈরি করেছিল এবং তাদের বেপরোয়াভাবে রক্ষণাত্মক করে ফেলেছিল। এইজন্যে সোজা কথাও তিনি হাঁক দেওয়ার ভাষায় বলতেন। সমগ্র পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে না পারা পণ্ডিতরা এগুলো অদ্ভুত মনে করে সন্তুষ্ট হন বা গুমোর এবং দম্ভ মনে করে কিছুটা আশ্বস্ত হন।

পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের জানা আছে যে সমস্ত দেবতা ও ঋষিমুনিদের নামে এমন সব গল্প পাওয়া যায়, যাতে তাদের চরিত্রের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ হয়। কিন্তু যাঁরা পুরানোর তত্ত্ববাদে জ্ঞানী তাঁরা তার মধ্যে ভগবৎলীলার আভাস পান এবং সেই গল্পগুলিতে তাঁদের অবিশ্বাসও হয় না আর সেই মুনিদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহও হয় না। কবীরদাস একটু আধটু পুরাণ কথা জানতেন, কিন্তু তত্ত্বদের শিকার ছিলেন না, হয়তো জানতেনও না। সেইজন্যে তিনি দয়ার ওপর বিশ্বাস করে মুনি ও দেবতাদের চরিত্র যেভাবে লেখা হয়েছিল সেইভাবেই স্বীকার করেছিলেন। নিজের ওপর তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল আর পৌরাণিক কথা সুর, নরমুনির চরিত্রে সন্দেহ করার সুযোগ দিয়েছিল। এইজন্যে অত্যন্ত সোজা ও সহজ কথা বলার সময়েও তাঁর আত্মবিশ্বাসের আক্রামক রূপ প্রকট হয়ে পড়েছিল:

মিহি মিহি বোনা চাদর রে।
কিসের টানা কিসের মাকু, কি সূতোয় বোনা চাদর রে।
ইংলা-পিলা টানা মাকু, সুষুম্মা সূতে বোনা চাদররে।
অষ্ট কমলদল চরখা দোলে, পাঁচ তত্ত্বগুণ তিন চাদর রে
করতে সেলাই সাঁইকে মাস দশ লাগেরে, ঠুকে ঠুকে বোনা চাদররে।
সে চাদর পরে সুর-নরমুনি, পরে করেছে ময়লা চাদর রে।
দাস কবীর যতনে পরেছে, যেমনকার তেমন রাখে চাদররে।

এতে দম্ভের লেশমাত্র নেই, অহংকারের ছোঁয়াও নেই। আছে কেবল নিজের অখণ্ড বিশ্বাস ও পৌরাণিক গল্পের সারল্যভরা স্বীকৃতি। সত্যিই তো মুনি ও দেবতারা পঞ্চতত্ত্ব তিন গুণের চাদর গায়ে দিয়ে ময়লা করে দিয়েছে। পুরাণ এই রকমই বলে আর এ-ও সত্যি যে কবীরদাস সেই চাদর ময়লা হতে দেননি। কবীরের অন্তরাত্মা এই মহাসত্যের অবিসম্বাদি সাক্ষি। তবে তাতে দম্ভ বা গুমোর কোথায়? কিন্তু যে কেউ এটা পড়লে, সে এতে

আত্মবিশ্বাসের আক্রমণের দিক না দেখে থাকতে পারে না। সমস্ত কথা এমনভাবে বলা হয়েছে যে আক্রমণাত্মক হয়ে গেছে। 'সুর-নরমুনিকে' আঙুল দেখিয়ে বলা আর তাদের সঙ্গে নিজেকে এক আসনে বসানো, আবার তাদের তুলনায় নিজেকে বড় বলা, এত তীব্র কটাক্ষ লক্ষ্যভূত শ্রোতাকে না খেপিয়ে থাকে না। কিন্তু বক্তার বেপরোয়াভবে লক্ষ্যণীয়। কটুতা ছাড়াই খেপিয়ে দেওয়ার মতো এত বড় কথা তিনি বলে দিয়েছেন এবং প্রত্যাক্রমণের চিন্তা একদম নেই।

এইরকম ছিলেন কবীর। আপদমস্তক আপনভোলা; স্বভাবে নির্বন্ধ আভাস দৃঢ়, ভক্তের সামনে নিরীহ, ভেকধারীর কাছে প্রচণ্ড, পরিষ্কার মন, পোক্তবুদ্ধি, অন্তরে কোমল, বাইরে কঠোর, জন্মে অস্পৃশ্য, কর্মে বন্দনীয়। যা-কিছু তিনি বলতেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতেন, এইজন্যে তাঁর উক্তি বেঁধার ও ব্যঙ্গের আঘাতে ভরা। তাঁর পূর্ববর্তী বাহ্যাচার বিরোধীরা স্বয়ং নিজের জন্যে বাহ্যাচার আড়ম্বর তৈরি করে রেখেছিল, সেইজন্যে তাদের মধ্যে সেই মত্ততাপূর্ণ বেপরোয়াভাব ছিল না যা কবীরকে এত আকর্ষক করে রেখেছে। আবার তাঁর পূর্ববর্তী সহজিয়া বৌদ্ধ ও যোগীরা পুঁথির যতই নিন্দা করুক না কেন, পুঁথি তাদের পড়া থাকত আর তাদের অন্তর পুঁথির মহিমায় অভিভূত হতো। কবীরের মতো নির্ভীক আত্মবিশ্বাসে কখনও তারা বলতে পারেনি যে:

তোর তোর মন কেমনে এক হয়রে।
বলি আমি আমার চোখে দেখা
বলিস তুই কাগজের লেখা;
বলি আমি সংকটহারী
রাখিস তুই সংকটেরে।

অখণ্ড আত্মবিশ্বাস ও অহৈতুক ভক্তি ছাড়া এত স্পষ্টভাবে কেউ বলতে পারে না যে 'রেখেছ সংকটেরে!' সহজ কথা সহজভাবে না বলে ব্যর্থ তর্ক-ফেনিল করে ফেলাই কি অধিকাংশ 'কাগজের লেখার' কাজ নয়? কবীরের বহুদিন পরে অন্য একজন ভক্ত বলেছিলেন শুরু থেকেই কিছু লোক নানারকম পারিভাষিক শব্দের মাধ্যমে ভাবার অভ্যাস করে ফেলে। এর মধ্যে যে যত বেশি কল্পনা-প্রবীণ হয় তাকে ততই বড় পণ্ডিত মনে করা হয়, কিন্তু সত্যি কথা হলো যে ওই চালাকিতে সে ভগবান হতে ক্রমশ দূরেই চলে যায় আর এই যুক্তিনিষ্ঠ লোকেরা নিজের কল্পনাকেই শাস্ত্রের নাম দেয়:

অভ্যাসাদ্য উপাধিজাত্যনুমিতিব্যাপ্ত্যাদিশব্দবলে
জন্মরাভ্য সুদূরদূরভগবদ্বার্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যাত্রাধিক কল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমের শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকা ঃ!

কবিকর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোজয় (দ্বিতীয় অঙ্ক)

আরও অনেকদিন পরে আর একজন কবি আশ্চর্য হয়ে ব্যর্থ তর্কজাল দেখে হয়রান হয়ে বলেছিলেনঃ

ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি,
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবই সোজাসুজি।

রবীন্দ্রনাথ

কবীর 'জ্ঞান-হাতি-তে উঠে বসেছিলেন, কিন্তু 'সহজ-গালিচা' না পেতে নয়, ভক্তি মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু 'মাসির বাড়ি' ভেবে নয়, বাহ্যচারের খণ্ডন করেছিলেন, কিন্তু নিরুদ্দেশ আক্রমণের ইচ্ছা নিয়ে নয়, ভক্তি বিরহের আঁচে পুড়েছেন, কিন্তু চোখে জল নিয়ে নয়, রামকে আগ্রহভরে ডেকেছেন, কিন্তু বালকোচিত জেদ নিয়ে নয়, সর্বত্র তিনি সন্তুলন রেখেছিলেন। শুধু কিছু বিষয়ে তিনি সমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অকারণ সামাজিক উঁচু-নিচু মর্যাদার সমর্থকদের তিনি কখনও ক্ষমা করতে পারেননি, ভগবান রাম নামে ভণ্ডামি করা লোকদের কখনও ছাড় দেননি। অন্যদের পথভ্রষ্ট করা লোকজনকে কখনও তিনি ক্ষমা করা উচিত মনে করেননি। এই বিষয়ে তিনি উগ্র কঠোর এবং আক্রামক ছিলেন। পথভ্রষ্ট লোকের ভুল দেখানোয় তিনি আনন্দ পেতেন। ব্যঙ্গ করে তিনি যেন তৃপ্তি পেতেন। নিম্নলিখিত পদে গঙ্গা স্নান করা নারীদের ভীষণ ব্যঙ্গ করেছেন—

চলেছে কুলটা গঙ্গা নেয়ে।
কড়াভাজা ছোলার ছাতু করিয়ে, ঘোমটা দিয়ে নেচে নেচে যায়।
পুঁটলি বেঁধেছে মোট বেঁধেছে, দিয়েছে চাপিয়ে স্বামীর মাথায়।
পড়েছে বিছুয়া আরা আংটা পায়ে, ভাতারে লাথ মেরে ধায়।
গঙ্গা নেয়েছে যমুনা নেয়েছে, নমন ময়লা চড়ায়।
পাঁচ পচিশের ধাক্কা খেল, এলো ঘরের পুঁজি হারিয়ে,
কহে গুরু প্রেম কর গুরুসনে, নইলে তোর মুক্তি যাবে নষ্ট হয়ে।

কবীর বচন 144

ভক্ত ছাড়া নিজেকে কখনও তিনি পণ্ডিত ভাবেননি। কখনও আত্মবিশ্বাস তাঁর সঙ্গ ছাড়ত না। তার মন যে প্রেমরূপী মদিরায় মত্ত হয়েছিল তা জ্ঞানের গুণে তৈরি করা হয়েছিল, এইজন্যে তাঁর মধ্যে অন্ধ শ্রদ্ধা, ভাবুকতা আর হিস্টিরিক প্রেমোন্মাদের একান্ত অভাব ছিল। তিনি যুগাবতার শক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন ও তাঁর মধ্যে যুগপ্রবর্তকের দৃঢ়তা বিদ্যমান ছিল, সেইজন্যে তিনি যুগপ্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। একবাক্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা বলা যেতে পারে তিনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত মস্তমৌলা ছিলেন—বেপরোয়া দৃঢ় উগ্র কুসুমদপি কোমল বজ্রাদপি কঠোর।

কুড়ি

মেঘদূত : একটি পুরোনো গল্প

গল্প অনেক পুরোনো, কিন্তু বারবার নতুন ভাবে বলা হয়। সুতরাং আর এক বার পুনরাবৃত্তি করায় কোনও ক্ষতি নেই।

এক যক্ষ ছিল, অলকাপুরের নিবাসী। এই দেশ ও নিবাসীদের দৃষ্টিতে দেখলে তাকে খুব গরিব বলা যেতে পারে না। তার বিশাল অট্টালিকার তোরণ দূর থেকে রামধনুর মতো ঝলমল করত। বাড়ির সীমানায় সে যে মনোহর দিঘি তৈরি করিয়েছিল, মরকত মণি দিয়ে তার সিঁড়ি বাঁধানো হয়েছিল, তার ভেতরে বৈদুর্যমনির স্নিগ্ধ মসৃণ নালায় মনোহর স্বর্ণকমল ফুটে থাকত। দিঘির কাছেই ইন্দ্রনীল মণির তৈরি ক্রীড়াপর্বত ছিল, যার চার পাশে কনক-কদলীর বেড় ছিল। মাধবীমণ্ডপের একটি ক্রীড়া-নিকুঞ্জ ছিল, যার ঠিক মাঝখানে স্ফটিক মণির চৌকিতে কাঞ্চনী বাসযষ্টি ছিল, যার ওপর যক্ষের পালিত শৌখিন ময়ূর বসত। শৌখিন এইজন্যে যে যক্ষপ্রিয়ার চুড়ির ঝঙ্কারে নেচে ওঠায় সে রস পেত। বাড়ির বৈভব দেখে কেউ বলতে পারত না যে সে গরিব ছিল। বর্হিদ্বার শাখা-স্তম্ভে পদ্ম আর শঙ্খ ছিল, কিছু বিজ্ঞে তবে অর্থ করেন, যে তার কাছে শঙ্খ ও পদ্মের সম্পত্তিও আছে এবং কিছু বিজ্ঞের মতো ওসব ধনীদের উচ্চাকাঙ্খার চিহ্ন। যাই হোক, যক্ষ খুব গরিব ছিল না। কল্পতরুর কাছে থাকা মানুষের কোনও অভাব থাকতে পারে না কি!

কিন্তু নির্ধন না হলেও, সে অবশ্যই চাকুরিজীবী ছিল। এ-তো জানি না যে সেকি কাজ করত, কিন্তু মেঘদূতের টীকাকাররা যে অনুমান করেছেন তাতে জানা যায় যে সে খুব উচ্চ পদাধিকারী ছিল না। কয়েক জনের মতে যক্ষপতি কুবেরের মালি ছিল। প্রিয়াপ্রেমে নিরন্তর সে এমন জড়িয়ে থাকত যে কাজকর্মে একেবারে মন দিত না। একদিন ইন্দ্রের হাতি ঐরাবত এসে বাগান নষ্ট করে গেল আর এই মহাশয় জানতেই পারলেন না! কুবের অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন, ফুলের খুব শখ ছিল। যক্ষের (বেচারার নাম কেউ বলেনি) এই আচরণে তিনি খুব রেগে গিয়ে এক বছরের জন্যে দেশ-বহিষ্কারের শাস্তি দিয়েছিলেন। অন্যেরা বলে, সকালবেলা পুজোর জন্যে তাজা পদ্মফুল আনার কাজে কুবের তাকে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু সকালবেলা ওঠা কষ্টকর ছিল আর, এই প্রমাদী সেবক বাসিফুল দিয়ে আসত। যাই হোক পরিষ্কার মনে হচ্ছে যে, সে সামান্য চাকরিই করত। গাফিলতি করে ফেলে আর এক বছরের জন্যে দেশ-বহিষ্কারের দণ্ডভাগী হলো, প্রথম গল্প সঠিক মনে হয়। অবশ্য ঐরাবতই হয়তো বেচারার এমন দুর্দশা করিয়েছিল। মেঘদূতে এমন সংকেতও আছে।

ইচ্ছে করলে কুবের জরিমানা করতে পারতেন। কিন্তু সে শাস্তি বেকার হতো, কারণ সে যা চাইত কল্পতরুর কাছে চেয়ে নিত আর জরিমানা দিয়ে দিত। সেখানে জেলখানা হয়তো ছিল না, প্রিয়ার বাহুপাশই সেই নগরীতে একমাত্র 'বন্ধন' ছিল। কিন্তু কুবের এই শাস্তিতে কোনও লাভ দেখেননি। আসলে দেশ-বহিষ্কারের চেয়ে বড় কোনও শাস্তি সে

দেশে হতেই পারত না। কিন্তু যক্ষ কুবেরের যত তুচ্ছ কর্মচারীই হোক না কেন, সে দেবযোনির জীব ছিল। তার অধিকারে নিধি ছিল, সিদ্ধ তার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিল। এজন্যে রাজাদেশে যদি দণ্ড দেওয়া হতো, তাহলে যক্ষ এমন কিছু একটা অবশ্যই করত, যাতে সে অলকার বাইরে আরামে থাকতে পারত। হাজার হোক দেবযোনিতে জন্ম নিয়েছিল, তাই কুবের তাকে সাজা দেননি, অভিশাপ দিয়েছিলেন। দেবতাই দেবতাকে মারতে জানে। লোহাই লোহা কাটতে পারে।

ইতিহাসে প্রেমের জন্য প্রসাদ এর আগে আরও হয়েছে। যক্ষ যে গাফিলতি করেছিল, সেই রকম আরও কয়েকবার করা হয়েছে। বলা হয় খানখানা আব্দুর রহিমের এক সাধারণ ভৃত্য প্রিয়াপ্রেমে কর্তব্যবুদ্ধিতে এমন হীন হয়ে পড়েছিল যে ছমাস পর্যন্ত কাজেই যায়নি। ভয়ে ভয়ে এবং জীবনে সবচেয়ে বড় শাস্তি শোনার আকাঙ্খা নিয়ে গেল। তার প্রিয়া কবিতা লিখত। কাগজের টুকরোয় একটি বরবৈ ছন্দ লিখে দিয়েছিল। তা পড়ে কবি রহিম ভৃত্যের অপরাধ ক্ষমা করলেন ও তাকে পুরস্কারও দিলেন; তিনি মানুষ ছিলেন কিন্তু কুবের তো দেবতা ছিলেন। মানুষ ক্ষমা করতে পারে, দেবতা পারে না। হৃদয় মানুষ নিরুপায় হয়, দেবতা নিয়মের কঠোর প্রবর্তিত হয়। নিয়মে মানুষ বিচলিত হয়ে যায়, কিন্তু দেবতার কুটিল ভ্রূকুটি নিরন্তর নিয়মের রক্ষা করে। এইজন্যেই মানুষ বড় যে, সে ভুল করতে পারে, দেবতা এইজন্যেই বড় যে সে নিয়মের নিয়ন্তা। তাই কুবের তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

সে বেচারার মহিমা কমে গেল। তার দেবত্ব চলে যাচ্ছিল। কোথায় যাবে, কি করবে? শহর ভাল লাগে না, জঙ্গলে মন টেঁকে না, জীবনে প্রথমবার প্রিয়ার দুঃসহ বিরহ সইতে হচ্ছে। রামগিরির পবিত্র আশ্রমে সে নিজের বসতি তৈরি করল। বড় বড় ঘনচ্ছায়া বৃক্ষে আশ্রম সুন্দর লাগত আর ঠাণ্ডা স্রোতের বহু জলধারা ছিল, যাতে জনকনন্দিনী না জানি কতবার স্নান করেছে। বিরহের অশান্তি দূর করতে এর চেয়ে ভাল জায়গা বাছা যায় না। রামের চেয়ে বড় বিরহী আর কে হতে পারে? এত অপার ধৈর্য আর কার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে? রামসীতা নিজের হাতে যে গাছ লাগিয়েছিল, তার শীতল ছায়ার চেয়েও মূল্যবান আর কী হতে পারে? যক্ষ অনেক ভাবনা চিন্তা করে নিতান্ত বুদ্ধি খাটিয়ে এই জায়গাই বেছেছিল পবিত্র, শীতল এবং শামক।

কশ্চিত্কান্তাবা বিরহগুরুণা স্বাধিকারাত্প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুন্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।।

রামগিরি সরগুজা রাজ্যের ছোট পাহাড়ি এলাকা। একটি সমতল জায়গার ওপরে এই পাহাড় উঠেছে। খুব উঁচু নয়। কিন্তু এর উত্তর ও উত্তর-পূর্বে আরও বড় উঁচু পর্বতমালা আছে। যেখানে পাহাড় সামান্য সমতল হয়ে নিচের দিকে ঢালু হয়ে আসে, সেই ঢালকে সংস্কৃতে 'সানু' বা পর্বত-নিতম্ব বলা হয়। রামগিরির ঢালও খুব মনোরম। বেচারা যক্ষ

কোনওরকমে আট মাস কাটাল, কিন্তু আষাঢ় মাসের প্রথম তিথিতে রামগিরি সানুদশে হঠাৎ কালো মেঘের টুকরো দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠল। বর্ষার সুন্দর সময় কাকে ব্যাকুল করে না? বেচারা যক্ষ তো এমনিতেই বিরহ দগ্ধ ছিল। যখন আকাশ মেঘে, পৃথিবী জলধারায়, দিক বিদ্যুল্লতায়, বনকুঞ্জে ফুলে ও নদী নতুন জলরাশিতে ভরে যেতে থাকে, তখন মানুষের নিরুপায় হৃদয়ও অকারণ ঔৎসুক্যে ভরে যায় যেন অজানা কিছু হারিয়ে গেছে, অভাবনীয় কিছু হয়ে গেছে। যক্ষ পর্বতের সানুদেশে জড়ানো কালো মেঘ দেখেনি। কেমন দেখল? যেন কোনও কালো মত্ত হাতি পর্বতের সানুদেশে ঢুঁ মারা খেলা খেলছে। কোনও দিন ওইভাবেই ইন্দ্রের মত্ত হাতি ঢুঁসো মেরে কুবেরের বাগান নষ্ট করে দিয়েছিল। যক্ষের সোনার সংসার ধূলোয় মিশে গিয়েছিল। প্রিয় থেকে দূর অনেক দূরে পৃথিবীর এক কোণে তাকে ফেলা দেওয়া হয়েছিল। আজ এই মেঘও মত্ত হাতির মতো পর্বতের সানুদেশে ঢুঁ মারছে। যক্ষ-হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠল। নিজের প্রিয়াকে মনে পড়ল, তপ্ত সোনার মতো রঙ, ছিপছিপে শরীর, তীক্ষ্ণ দাঁত, পাকা বিম্বফলের মতো ঠোঁট, চকিত হরিণীর মত চোখ যেন বিধাতার প্রথম সৃষ্টি, তার কাছে যখন সমস্ত সামগ্রী পূর্ণ ছিল, কোথাও কার্পণ্য দেখাননি, শোভার খনি, সৌন্দর্য তরঙ্গিণী, কমনীয়তার মূর্তি। হায় বিধাতা, আজ এই হাতি আবার এসেছে! সে যে কি অনর্থ ঘটাবে! কিন্তু যক্ষ খুব মন দিয়ে দেখল, হাতির মতো দেখতে এই জীব হাতি নয়, পাহাড়ে আটকে থাকা মেঘ। ভিজে হাওয়ার দোলায় দুলছে, এগিয়ে আসে, পিছিয়ে যায়, দোলে, চমকায়। না, এ ঢুঁসো মারা হাতি নয়। হাওয়ার দোলায় দুলে ওঠা মেঘ। বিরহে তার শরীর খুব জর্জর হয়ে পড়েছিল, হাতের সোনার কঙ্কণ ঢিলে হয়ে পড়ে গেছে, যেন পাতাঝরা ঋতুতে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীহীন, পৌরুষহীন দেবদারু। 'অবলা' বিয়োগে এমন নির্বলতাও আসে।

আট মাস কেটে গেল, আর পারা যায় না। প্রিয় বিরহের আট মাস! রামগিরির প্রতিটি কোণ রামপ্রেমময় জীবনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলত। কনকবলয় নষ্ট হওয়ার মনে হলো শরীর এখন অসমর্থ হয়ে গেছে। এখন আর সওয়া যাবে যা, আর ওরই মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন. পর্বতের সানুদেশে ঢুঁসোমারা হাতির মতো দেখতে এই কালো মেঘ! হয় রাম!

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসাকনক বলযভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্যা প্রথমদিবসে মেঘমাশিলাষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়া পরিণত গজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।।

বিরহদগ্ধ যক্ষ মেঘের সামনে এসে দাঁড়াল। মেঘই তো। এই মসৃণ মেদুর কান্তির বলিহারি! কুবেরের সেই হতভাগ্য অনুচরের চোখে জল এলো, শুকিয়েও আবার গেল। কতদিন অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে মালিকের সেবা করেছে। সামান্য ভুলের জন্যে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল কি? আজ এই নীল মেদুর কান্তিময় মেঘের সামনে সে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে চোখের জল বেরোতে পারছে। মেঘ দেখে সুখি লোকের হৃদয় কেমন হয়ে যায়, বিরহী তো বিরহী-ই। যার প্রেমিকা কাছে আছে, এত কাছে আছে যে

গলায় গলা জড়িয়ে আছে, সেও ব্যাকুল হয়ে যায়, তাহলে যারা প্রিয় থেকে দূরে তাদের কী অবস্থা হবে; যেখানে চিঠিপত্রও দুর্লভ? এই সব ভাবতে ভাবতে যক্ষ অনেকক্ষণ মেঘের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু দাঁড়ানো কি যায়? উৎকণ্ঠা জাগানো মেঘের সামনে দাঁড়ানো কি সহজ? তবুও সে দাঁড়িয়ে থাকল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তার হৃদয়ে ঝড় এলো আর গেল, এক এক করে পুরোনো কথা উঠল আর বিলীন হয়ে গেল। কি ছিল, আর কি হয়ে গেল! সে 'অন্তর্বাষ্প' হয়ে উঠল। অশ্রু পারাবার ভিতরেই বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল। বাইরে তার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, যেন ঝড় ওঠার আগে গুমরে থাকা বায়ুমণ্ডল।

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ! কৌতুকাধানহেতো
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিন্যোপ্যযথারবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণি জনে কিস পুনদূরসংস্থে।। 3।।

কৈলাসের বর্ষা একটু দেরিতে আসে। মধ্যদেশে আষাঢ়ের প্রথম তিথিতেই মেঘ দেখা গেছে, কিন্তু সেখানে এখনও দেরি আছে। শ্রাবণ মাসে সেখানে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। ব্যাকুল হয়ে যক্ষ ভাবছিল যে আমারই যখন এই অবস্থা, তাহলে সে বেচারি কোমল বালিকার কি দশা হবে? শ্রাবণ মাসে থরে থরে সাজানো মেঘমালায় যখন আকাশ ছেয়ে যাবে, প্রতিটি মেঘ-নিঃস্বনের তালে পাহাড়ের নাচিয়ে ময়ূর যখন ছমছম নাচতে থাকবে আর নিচে পৃথিবী ফলে ফুলে ম ম করে উঠবে, বিরহিণী তখন কোন দিকে তাকাবে? চারিদিকে শুধু বেদনা সৃষ্টি করা দৃশ্য হবে শুধু বিদ্ধ করা শোভা। সংস্কৃতে শ্রাবণ মাসকে 'নভস্' বলা হয়, সত্যিই এই মাসে আকাশ মাটিতে নেমে আসে এই শ্রাবণে সেই প্রেম-পুতুলের কি হবে? এখন তো সে কোনওভাবে দিন কাটাচ্ছে, বীণা বাজিয়ে মন শান্ত করছে, মুখরা সারিকার কাছে হয়তো প্রিয়র নাম শুনছে, চিত্রকর্মে হয়তো বিশ্রাম পাচ্ছে। কিন্তু শ্রাবণে যখন একসঙ্গে নৃত্যরাজ ময়ূর ও পরিতৃপ্ত চাতকের ডাক, উদ্ভিন্ন-কেশর কদম্ব ও উদ্ঘাটিত পটলা মালতির মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আর সবার ওপর রিমঝিম রিমঝিম বর্ষিত মেঘের ঝরনার আক্রমণ হবে, তখন কী সে ধৈর্য রাখতে পারবে? হায় বিধাতা, শ্রাবণে যক্ষপ্রিয়া কি ভাবে বাঁচবে।

শ্রাবণ আসতে কতই বা দেরি! মাথার ওপর এসে গেছে—একেবারে প্রত্যাসন্ন। দয়িতা-প্রিয়ার প্রাণের কিছু অবলম্বন থাকা উচিত। কিছু তো করতেই হবে। আর কিছু না হোক প্রিয়র কুশল সংবাদও কম আশ্রয় নয়। কিন্তু কে সংবাদ নিয়ে যাবে? পথে না জানি কত নদী, কত পাহাড়, বর্ষার ভয়ংকর পথ আটকানো কাল আছে। বড় বড় রাজারাও এই সময় বেরোতে সাহস করে না, পরিব্রাজকরাও চুপচাপ কোথাও বসে থাকে। এই দুর্ঘটনার সময় কে বার্তা নিয়ে যাবে? শ্রাবণ পর্যন্ত বার্তা অবশ্যই পৌঁছে যাওয়া উচিত। মহাবলবান হনুমান তো রামচন্দ্রের বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যক্ষ এমন দূত কোথায় পাবে? না, এ অসম্ভব কথা। ব্যাকুল যক্ষ ভাবল যে কে এমন কার্যকুশল আছে, যে তার বার্তা নিয়ে যাবে। বার্তাবাহকের আগে মেঘ পৌঁছে গেলে কোনও আশা নেই, প্রিয়ার প্রাণ-পাখি উড়ে

যাবে। তাহলে কীসের বার্তা আর কীসের প্রেম! বার্তাবাহকের আগে মেঘই যখন শ্রাবণে অলকাপুরি পৌঁছবে, তখন মেঘকেই বার্তাবাহক করা যাক না কেন? যক্ষের চেহারা কিছুক্ষণের জন্যে খুশিতে ভর উঠল। সোজা কথা বুঝতে এত দেরি হলো। তৎক্ষণাৎ সে তাজা কুটজ ফুল ছিঁড়ে প্রীতি-স্নিগ্ধ কণ্ঠে মেঘকে উপহার দিল। স্বাগত, 'নবজীবন নিয়ে আসা প্রেমবাহক' বলা হোক। এই অর্ঘ গ্রহণ করো, শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ। স্বাগত, নীল মেদুর কান্তিযুক্ত মোহন ঘনশ্যাম স্বাগতম!

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীম্ হারয়িষ্যনপ্রবৃত্তিম
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ।। 4 ।।

কিন্তু এ পাগলামির সীমা আছে কি! 'ঘাম-ধূম-নীর আর সমীরণ সন্নিপাত, এমন জড় মেঘ করিবে কেমনে দূতবাজ?' আজ পর্যন্ত' এমন হয়েছে কি? ধূঁয়া, প্রকাশ, জল ও বায়ুতে তৈরি মেঘ কোথায়? আর বার্তা নিয়ে যাওয়া চতুর বার্তাবাহক কোথা? যক্ষের মাথা খারাপ হয়ে গেছে কি? বররুচি বলেছেন যে প্রেমপত্র বাহকের সাবধান থাকা উচিত। তার প্রত্যেক অবস্থার সুকুমারত্বের জ্ঞান থাকা উচিত। আনন্দ আতিশয্যে বিরহী প্রাণপাখি উড়ে যায়, কখনও লম্বা ভূমিকায় তার দম বন্ধ হয়ে আসে, কখনও প্রতিকূল লোকের সঙ্গতিতে বসে থাকা বিরহী শুভবার্তার ফলস্বরূপ কষ্ট পায়—হাজারো কথা মনে রাখতে হয়। আর এই ভাগ্যহীন যক্ষকে এই জড় মেঘকে প্রেমবার্তার বাহক করতে হয়।

কিন্তু এসব ভাবার সুযোগ যক্ষের ছিল না। কামনায় সে কাতর ছিল; ঔৎসুক্যে আর্ত ছিল। 'আর্তের চিত্তে থাকে না হুঁশ'— সে জ্ঞানে ছিল না। প্রায়ই এমন দেখা গেছে যে প্রেমবিয়োগের ব্যথায় যারা ব্যথিত হয়, তারা চেতন-অচেতন, বড় ছোট সবার সামনে দয়নীয় হয়ে—কৃপণ হয়ে উপস্থিত হয়। যেন প্রত্যেকেই তাকে সহানুভূতি দেখাবে: প্রত্যেকটি ইট পাথর তাকে সাহায্য করবেই। কেন এমন হয়? প্রেমদশায় উত্থিত ব্যক্তি পৃথিবীর প্রত্যেক জড়চেতনের মধ্যে কি কোনও অন্তর্বিলীন বিরাট চেতনার সন্ধান পেয়ে যায়? হয়তো পায়। অবশ্যই যক্ষ পেতে সমর্থ হয়েছিল। মেঘকে পরম সহানুভূতিসম্পন্ন বন্ধুরূপেই সে দেখেছিল; হৃদয় গলানো বার্তা পাঠিয়েছিল। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠ ছাড়া অন্য কাউকে এই বার্তা বলা যেতে পারে না। তাকে আপনি পাগল বলুন, প্রকৃতিকৃপণ বলুন, কিন্তু সে জগতের ভেতরে নিরন্তর স্পন্দিত হওয়া বিরাট চেতনা চিনে ফেলেছিল।

ধূমজ্যোতি সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ কব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ কব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়াঃ।
ইত্যোৎসুক্যাদ পরিগনয়নগুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ।। 5।।

পুরোনো গল্পের কথামুখ বা ভূমিকা-ভাগ এইটুকু। আধুনিক পাঠক আরও জানতে চাইবে। যক্ষ সেইসময়—কোন সময়? সকাল, দুপুর বা সন্ধ্যার সময়? কোন দিকে মুখ করে বসেছিল? মেঘ পাহাড়ের কোন দিকে ছিল? এ সম্পর্কে কালিদাস কিছু বলেননি। যক্ষের নাম পর্যন্ত বলেননি, তাহলে বেশি কি আশা করা যায়? কিন্তু হাওয়া নিশ্চয়ই দক্ষিণ থেকে আসছিল আর মেঘ মহাশয়ও উত্তরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত বলে মনে হয়। অনুমান করা যেতে পারে যে এই যক্ষের মতো বিরহী হাত সর্বদা উত্তরমুখী হয়ে বসে থাকে। তার প্রিয়া উত্তরের দিকে থাকত। হয়তো রামগিরির দক্ষিণ পাশে উত্তরের দিকে মুখ করে সে বসেছিল, উদাস ও কাতর। সামনে কোনও চূড়ার নিম্নতর ঢালের কাছে মেঘরূপী হাতি হয়তো ঢুঁসো মারার খেলা খেলছে। সময় কদাচিৎ সন্ধ্যাবেলা হয়। এই সময় তার চেতনা অচেতন বিবেকের হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বলা হয় বিরহী এই সময়েই সবচেয়ে ব্যাকুল হয় আর আশ্রয় খুঁজে ফেরে। এই সময় আশ্রয় না পেলে ব্যাকুলতা পাগলামির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নতুন বিরহ-দগ্ধ বিরহিণীকে দিয়ে অপভ্রংশের কবি বলেছেন যে, আমি মনে করতাম হয়তো সন্ধ্যাবেলায় প্রিয় বিরহিতা বালিকার কোনও না কোনও রক্ষাকর্তা পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধারণা একদম ভুল প্রমাণিত হলো। শীতলতার জন্যে প্রসিদ্ধ ব্যাটা চাঁদও এই সময় এমন তাপে, যেমন প্রলয়কালে সূর্য তাপে—

মই জানিউঁ পিয় বিরহিয়হঁ, কবি ধরু হোই বিয়ালি
নবর মিয়ংকু মিতই তবই, জহ দিনয়রু খয় গালি।।

কিন্তু যক্ষ এত অনুভবহীন বিরহী ছিল না। সে জানত যে যখন বিধাতা বাম হয়, তখন চিত্রেও প্রিয় কল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বপ্নেও মিলন অসফল হয়ে যায়। কোনও যুক্তি কাজ করে না। তবুও দিনের বেলা কোনও-না-কোনও আশ্রয় পেয়ে যায়। হরিণীর চোখে, বৃক্ষের তরুণ কিশলয়, পদ্মকোরকে প্রিয়ঙ্গুলতায় দোলা বল্লরীতে প্রিয়র কোনও অঙ্গের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু, যখন ভাগ্য খারাপ হয় তখন এইটুকুতো সহ্য করতেই হয়। সন্ধ্যাবেলায় যখন অন্ধকার ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নেমে আসে আর সব কিছুর ওপর ঘন কাজল লেপে দেয়, তখন এই আশ্রয়টুকুও শেষ হয়ে যায়। হয়তো সেই সময়ে তার মন নিশ্চয় সবচেয়ে বেশি উৎক্ষিপ্ত হয়। হয়তো মত্ত কালো হাতির মতো মেঘ সন্ধ্যাবেলায় অবশ্যই দেখা গেছে। কিছু ভাবনাচিন্তা করেই কালিদাস এ সমস্ত কথা বলেননি। তিনি ইচ্ছে করলে, সন্ধ্যার এমন মনোরম ছবি আঁকতেন যে, ব্যাস, পড়লেই অভিভূত হয়ে যেতে হতো। কিন্তু তিনি এই সব ঝঞ্ঝাট বাদ দিয়েছেন। যা বাদ গেছে, তা বাদই থাক।

একুশ

অনেক নেচেছি, হে গোপাল!

কিছুদিন আগে এক বন্ধু এসেছিলেন। কিছু লেখার জন্যে তিনি পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন। আমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চাইছিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝলাম যে তিনি পরামর্শ কম আর স্বীকৃতি বেশি চেয়েছিলেন। বলেছিলেন যে বিধাতা মানুষকে একশো বছরের আয়ু দিয়েছেন, পূর্বজন্মের পাপের ফলে কিছু লোক আগেই মারা যায় আর কিছু লোক এই জন্মের পুণ্যের ফলে বেশি বাঁচে। যারা ছেষট্টি-সাতষট্টি বছর পর্যন্ত বেঁচে যায়, পূর্বজন্মে তাদের পাপ খুব বেশি ছিল না; শাস্ত্রানুসারে মধ্য-আয়ু ভোগ করে তারা দীর্ঘায়ুতে প্রবেশ করে। আমার বন্ধু আমাকে যেদিন বলেছিলেন যে তিনি দীর্ঘায়ুতে প্রবেশ করে ফেলেছেন বা প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি নিশ্চিত হয়ে কেন বলছেন না, তিনি বললেন, দশ দিন পরেই নিশ্চিত জানতে পারবেন। কারণ চন্দ্রগণণা অনুসারেই তিনি এখন দীর্ঘায়ু-ঘরে পৌঁছেছেন, সৌরগণনায় এখনও দশ দিন বাকি আছে। গম্ভীর মুদ্রায় তিনি জানালেন, যমরাজের কার্যালয়ে চন্দ্রগণনা প্রচলিত, কিন্তু বিধাতার দপ্তরে সৌরগণা অনুসারে কাজ হয়। যমরাজ পিতৃযান পরম্পরায় আর ব্রহ্মা দেবযান পরম্পরায় চলেন। দুটি দপ্তরের গণনায় কখনও কখনও পরস্পর ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। বিধাতার (ব্রহ্মা) ইঙ্গিতে শেষ নির্ণয় হয়। কিন্তু দুটির মধ্যে যত অন্তর হয়, ততদিন পর্যন্ত মরমর লোকেদের শ্বাসযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যমদূত তাদের টেনে নিয়ে যেতে চায়। ওদিকে ব্রহ্মার আদেশ না পাওয়ার জন্যে মরণশয্যায় পড়ে থাকা রুগির প্রাণ বেরোতে পারে না। বাজে টানাটানিতে বেচারার দুর্গতি বাড়ে। এটা জানা থাকার জন্যে আমার বন্ধু সন্দিগ্ধ ভাষায় বলছিলেন। কিন্তু দশদিনের পার্থক্য এমন কিছু নয়। তিনি আশ্বস্ত ছিলেন যে আগামী দশ দিনও নির্বিঘ্নে কেটে যাবে, কারণ তাঁর পুরোনো পাপের দুর্বলতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ অন্য কথা যে, বিশ্বাস পরম্পরায় প্রত্যেক হিন্দুর মতো তিনিও হিসাবি ছিলেন। নিজের কথার উপসংহার করতে করতে হাত ঘুরিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে এটুকু জুড়ে দিয়েছিলেন যে, 'কিন্তু কে জানে? 'ক্ষণমূর্ধ্ব ন জানামি বিধাতা কিম্ করিষ্যতি!' এই অপরিচিত বন্ধুর কথা আমার আকর্ষক লেগেছিল। আমার বিশ্বাস হয়েছিল, বা ধরুন যে মনে মনেই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম, তিনি যেন শুধু দীর্ঘায়ুতেই প্রবেশ না করেন, পূর্ণতাও ভোগ করেন।

আজ প্রমাণ পেয়ে গেলাম যে সত্যিই তিনি দীর্ঘায়ু-ঘরে প্রবেশ করে গেছেন।

এতো সেই দিনের কথা যখন, তিনি কিছু লেখার সঙ্কল্প করে ফেলেছিলেন আর আমাকে উৎসর্গ করার অনুমতি চেয়েছিলেন। এখন সৌরগণনা অনুসারেও তিনি দীর্ঘায়ুতে প্রবেশ করেছেন। তাঁর পুঁথি এসে গেছে।

জীবনে কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে যায়, সাহিত্য সমালোচক যাকে 'নাটকীয়' মনে করে উপেক্ষা করেন। তার মানে হলো জীবনে তো তা ঘটে না, লেখক জবরদস্তি

ঘটিয়ে নেয় অর্থাৎ নাট্যকার যেমন নিজের আকাঙ্ক্ষিত দিকে গল্পকে মোড় দেয় সেইরকম এই ধরনের কথাও তৈরি করে নেওয়া হয়। সমালোচকের ভয় না পাওয়া বুদ্ধিমানী নয় কিন্তু ভয় পেয়ে সত্যি কথা না বলাও কোনও ভাল কথা হতে পারে না। কখনও কখনও জীবনে এইরকম ঘটনা অবশ্যই ঘটে যায় আর তাকে 'নাটকীয়' বলার অর্থ হতে পারে যে, জীবনও একটি নাটক। সততার কথা হলো যে জীবন সত্যিই এক নাটক। আমার বন্ধুও তাই মনে করেন। আসলে বন্ধুটি যখন নিজের কথা বলছিলেন মনে মনে তখন আমিও হিসাব করছিলাম আর বিচিত্র সংযোগ হলো যে আমিও $66^2/_3$ বছর পার করছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধু আমাকে এর চেয়েও বয়স্ক মনে করেছিলেন কারণ, শ্রদ্ধাসহকারে তিনি বলে গেলেন যে আপনি তো এখন দেবশ্রেণীতে পৌঁছে গেছেন। তাঁর কথার মানে আমি বুঝতাম। কিন্তু প্রতিবাদ করার প্রয়োজন মনে করিনি। মহাভারতে কোথাও লেখা আছে সাতাত্তর বছর সাত মাস সাত দিন যে বেঁচে থাকে সে দেবতা হয়ে যায়; তাই তার মতে এই বয়স আমি পার করে ফেলেছিলাম। প্রতিবাদ করলে বেকার কথা বাড়ত। আর পার্থক্যই বা কতটুকু। মাত্র এগারো বছরের। এগারো বছরের জন্যে একঘণ্টা মাথা ঘামানা বুদ্ধিমানী মনে হলো না। তাই তিনি বলে গেলেন, আমি শুনে গেলাম।

আমার এই বন্ধুর মতো কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি কমই হয়। তিনি নিজের কল্পনাকে প্রামাণিক ইতিহাস মেনে নেন। তাতে মজে যান আর প্রতিবাদ বা বাধা পেলে মর্মাহত হন। জলভরা চোখে তাকাতেন, যার মনে হতো—'আপনিও এরকম বলেন।'

এইরকম সময়ে তাঁকে বোঝাতে আমার সময় লেগে যেত যে তার প্রামাণ্যে সন্দেহ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও তাই উদ্দেশ্য হতো। এমন মিথ্যায় কোনও দোষ নেই, কারণ এতো অভিজাতজনোচিত ভদ্রতাই মনে করা হয়। তবুও মিথ্যা তো মিথ্যাই। তার থেকে বাঁচার উপায় হলো 'মৌন' থাকা—এমন মৌন, যাতে যিনি শোনাচ্ছেন তিনি বুঝতেই পাারবেন না যে শ্রোতার মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। একথাও নাটকীয়তার মতোই। এরকম নাটক আমি অনেক দেখেছি। এইজন্যে এতে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি।

আমার বন্ধু বলেছিলেন, সুরদাস এই সময়টায় সেই বিখ্যাত পদটি লিখেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল, 'এখন অনেক নেচেছি আমি হে, গোপাল! 'প্রমাণ প্রমাণ হলো ঠিক আজই যখন তিনি চন্দ্রগণনা অনুসারে $66^2/_3$ বছর পুরো করে ফেলেছিলেন এরকম ভাবই তাঁর মনে এসেছিল। আমার মন পাগল হয়ে উঠল। আজ সকাল থেকেই আমিও এই পদ মুখস্থ করে যাচ্ছিলাম। তাহলে কি ধরে নেব যে সুরদাস যখন $66^2/_3$ বছরের হয়েছিলেন তাঁর মনেও ঠিক এইকম অনুতাপ হয়েছিল? সুরদাস অনেক মহান সন্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এতো দৈন্যোক্তিতিই বলা যায় কিন্তু আমার সামনে বসা অপরিচিত বন্ধুর মনে আজ এই ভাব কি করে উঠল? দুজনেরই মনে হলো তৃতীয় চতুর্থ ব্যক্তির মনেও উঠেছে হয়তো $66^2/_3$ গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।

আমার বন্ধু সেদিন আশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনে এক বিচিত্র তোলপাড় সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায় সারল্যের আবরণে লুব্ধ করার আশ্চর্য শক্তি ছিল। তাঁর নাম ঠিকানা জানতে চাওয়ায় তিনি বিচিত্র দ্বন্দ্বে পড়েছিলেনঃ 'নামে কি আসে যায়, যা ইচ্ছে ভাবুন। আপনিই বলুন আপনার নাম কি? সারা দুনিয়া যে নামে আপনাকে চেনে,

যখন আপনি পৃথিবীতে সেই নাম কি আপনার গুরুজনের মনে কোথাও ছিল? আর এখন আপনি যে নামে পরিচিত বাস্তবের সঙ্গে তার কি কোনও তারতম্য আছে? আসলে নাম হল ধোঁকা।' অন্য কোনও সময় হলে তার কথা তো হেসেই উড়িয়ে দিতাম। অন্যের ওপর রহস্যবাদের রোয়াব দেখানোর জন্যে কিছু লোক এই রকম মিথ্যা জ্ঞানের জাল ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু $66^2/_3$ -এর মহিমা আছে, তাই আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। এতো ঠিক যে নিজের প্রচলিত নামের জন্যে কয়েকবার আমি কঠিন পরিস্থিত মুখোমুখি হয়েছি। একজন অহিন্দিভাষী নেতা যখন আমাকে এর মানে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন শুধু উত্তর দিতে পেরেছিলাম যে কেবল শব্দে এই নাম একেবারে অর্থহীন। আর একজন বিদ্বান নিজেই মানে বলে দিলেন যা আমার কাছে বেমানান ছিল। তাঁর মতে এই নাম এক দেবীর সঙ্গে সম্বন্ধ। একবার সংস্কৃতর পক্ষ নিয়ে কিছু বলছিলাম, তখন এক বন্ধু ঠাট্টা করল যে তোমার নাম তো হিন্দুস্তানি অথচ সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দির সমর্থন করছ। সেদিন আমিও বলছিলাম, নামে কি আসে যায়। ভগবান সাক্ষি সেদিন আমি সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দিরও সমর্থন করিনি কিংবা তথাকথিত হিন্দুস্তানির বিরোধিতাও করিনি। সংস্কৃত সমৃদ্ধির মত দিচ্ছিলাম, কিন্তু অকারণে আমার নাম টেনে আনা হয়েছিল।

এই নাম নিয়ে আসার পরমশ্রদ্ধেয় গুরুর কাছেও ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল। তখন যদি তর্কের জেদ না করতাম তাহলে নামটা হয়তো বদলে যেত। আমার শ্রদ্ধেয় গুরু মহান সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। উনি বলেছিলেন, 'তোর নামে মুসলমানত্বের গন্ধ আছে। ঠাকুর্দার দেওয়া 'বৈদ্যনাথ' নামই ভাল। বদলে ফেল।' 'গন্ধ' শব্দ আমার মনে লেগেছিল। প্রতিবাদ করেছিলাম, 'গুরুজি সুগন্ধ বলুন। এতে যদি অমন সুগন্ধ থাকে তাহলে আমি বদলাতে দেব না।' গুরুজির মন গলল। বললেন, 'তাহলে থাক।' বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া নাম পড়ে রইল; লোকপ্রদত্ত নাম রয়ে গেল। একবার আমার পরমশ্রদ্ধেয় অগ্রজতুল্য মহান কবি নবীনবাবু আমাকে একটা বই উপহার দেন। তিনি আমার নাম 'সহস্রার প্রসাদ' করে দিলেন আর বললেন যে আমি তোমার নাম সংস্কৃতে করে দিয়েছি। তাঁকে আমি বললাম যে 'হজার' আসলে 'সহস্র' শব্দের 'হস্রের' ফার্সি উচ্চারণ। এই শব্দের মাধ্যমে আর্যভাষার বিস্তৃত পরিবেশের তথ্য পাওয়া যায়। তিনি তখন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্বহস্তে লেখা সংস্কৃতীকৃত নাম সযত্নে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। যখন একজন বড় তান্ত্রিক বিদ্বানকে একথা বললাম তো তিনি খুব ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হলেন। আমাদের অজ্ঞানতাই তার কারণ। তার মতে সহজাবস্থা দেওয়া শক্তির নামই 'হজারী'। 'সহজ' গুণবাচি শব্দ-'হ' (হঠযোগ) ও 'জ' (জয়যোগ)-এর সমন্বিত রূপ এবং 'হজারী' ক্রিয়াবাচি ও জয়ের সমন্বয়কারী দেবী- 'হজমারাতিয়া দেবী মহামায়াস্বরূপিণী সা হজারীতি সম্প্রোক্ত রাধেতি ত্রিপুরেতি বা।' মনে পড়ল যে একবার এক মারাঠি পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছিলেন, 'হজারী' এক দেবীর নাম। হবে, কিন্তু আমার নাম ওই জন্যে রাখা হয়নি যে তন্ত্রশাস্ত্রে দেবীর সঙ্গে মিল আছে বরং গ্রামের লোকজন আনন্দিত হয়েছিল যে আমার জন্মের জন্যে এক বিষম সংকটই শুধু কাটেনি, সেজন্যে কয়েক হাজার টাকা আমদানিও হয়েছিল। 'বিরুদ'রূপে আমি এই নাম পেয়েছিলাম। এখন তো গলায় আটকে গেছে। খালি পণ্ডিতদের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে ওর মানে আছে, খুব ভাল মানে, শাক্তমতে ত্রিপুরা, বৈষ্ণবমতে রাধা ও যোগীদের রাধা ও যোগীদের

ভাষায় 'হজারী', আমি তাদেরই প্রসাদ। অর্থ ভালোই, পরমার্থ হয়ে গেলে তো কথাই নেই, কিন্তু নামে কি আসে যায়, কাম হওয়া চাই। আমার নতুন বন্ধু নাম জানাতে চান না, কাম দেখাতে চান। নিজের ভবিষ্যৎ লেখা আমাকে উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে চলে গেলেন। রেখে গেলেন সুরদাসের ব্যাকুল বেদনা; আমার এই নতুন বন্ধুর মতে $66^2/_3$ বছর বয়সে তিনি অনুভব করেছিলেন— এখন অনেক নেচেছি আমি, হে গোপাল।

তুলসীদাস যখন কাতরভাবে গেয়েছিলেন 'দংশনেই মবিলাম নিশিদিন,' তখন তাঁরও বয়স কি $66^2/_3$ বছর হয়েছিল? কে বলবে? সেই যে আমার বন্ধু গেলেন তো গেলেন!

কিন্তু তার অনুপস্থিতির একটা লাভ হয়েছিল। তার ভাষায় আমি ভাবতে লাগলাম, তার চিন্তার সত্য মানতে লাগলাম। নামে কি আসে যায়। এতো এক বিদেশি প্রবাদ। নাম তো হাল্কা জিনিস নয়। 'দেখি রূপানাম অধীন' নামে সামাজিক স্বীকৃতি থাকে। নামী, নামেই চেনা যায়। যে নাম সামাজিক স্বীকৃতি পায় না তা নিরর্থক শব্দমাত্র, অর্থ নামী হয়। নাম তার সংকেত দেওয়া পদ। নাম যখন সামাজিক স্বীকৃতি পায় তখন তা 'পদ' হয়ে যায়। আমার অপরিচিত বন্ধুর যতক্ষণ কোনও নাম নেই, ততক্ষণ তিনি 'অপদার্থ'। 'অনাম'ও একটি নাম। ভাই জৈনেন্দ্রকুমার একটি উপন্যাস লিখেছেন, 'অনামস্বামী!' এই অপরিচিত বন্ধুকেও 'অনাম' বলা যেতে পারে। স্বামী তিনি ছিলেন না। প্রয়োজনমতো তাঁকে 'অনামদান' বলতে পারি।

মহাত্মাদের কথা স্বতন্ত্র। হয়তো নিজেদের বাহানায় সাধারণ মানুষের মনকে তাঁরা কিছু ভাল কথা শেখাতে চান। কিন্তু সাধারণ মানুষের মতোই আমি ভাবতে পারি। তার উদ্দেশ্য কাউকে শেখানো নয়। পিছনের দিকে তাকাই, বিরাটা শূন্যতা। যা কিছু করেছিলাম তা কী সত্যিই কোনও কাজের? নিজের সীমা ত্রুটি ক্ষুদ্রতা লুকিয়ে সত্যিই কিছু বলে আমি নিজেকে জাহিরই করেছি। ছোট ছোট কথার জন্যে সংঘর্ষকে বাহাদুরি মনে করেছি, পেটের জন্যে কাড়াকাড়িকে কর্ম বলে মেনেছি, মিথ্যা প্রশংসা পাওয়ার জন্যে সঙ করেছি, ওইগুলোই সাফল্য বলে মেনে নিয়েছি। কোনও বড় লক্ষ্যে সমর্পিত হতে পারিনি; কারও দুঃখ দূর করার জন্যে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারিনি। কেবল প্রদর্শন ভাঁড়ামি আর হায় হায় করেই সারা জীবন কেটে গেল। আমার মতো কাউকে দেখেই তুলসীদাস হয়তো বলেছেন, 'ভাল বলে কেউ, দেয় কিছু, মন হতে বাসনা না যায়।'

কিন্তু এ কান্নাও ব্যর্থ, এতে কি লাভ? এদিয়ে কোনও দুঃখীর চোখের জল মোছার সম্ভাবনা আছে? কারও ভাল না হলে তার কল্পিত গল্প ছড়ানো সামাজিক অপরাধ। শুধু ফলিত অর্থ হল যে অনামদাসবাবু একটি পুঁথি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে উৎসর্গ করেছেন। সাধারণত উৎসর্গের যে অর্থ, এখানে তা নেই। তিনি লিখেছেন যে ইচ্ছানুসারে পরিবর্তনের অধিকার আমার থাকল, সেই অর্থেই উৎসর্গীকৃত।

কি করা যায় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পড়েছে। ছাপিয়ে দেওয়াই ঠিক মনে হচ্ছে।

কিন্তু কি ভাবে ছাপবে? কাগজের এমন সংকট যে নামি লেখকদের লেখাও ছাপানো যাচ্ছে না। প্রত্যেক প্রকাশক নাম খোঁজে, এমন নাম, যা খুব কষে কামানো হয়েছে। নামও কামানো হয়। কোনও নাম রাখলেই চলে না, পৃথিবী নামের রোজগারও দেখে আর এই

অনামদাস বলে যে, নামে কি আসে যায়। গোঁসাই তুলসীদাস যাঁর আসল নাম কি ছিল, তর্কের বিষয় হয়ে গেছে; বলে গেছেন, নাম জেনে করতলগত বস্তুও চেনা চায় না। কিছু না কিছু নাম তো থাকা উচিত। নামেই নামীর পরিচিত হয়। একবার আমি এক বিকট জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম। সে নাম শুনেই সব কিছু বলে দিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাশিনাম বলব? না লোকনাম। আগে একবার জ্যোতিষীর মুখোমুখি হয়েছিলাম তখন তিনি রাশিনাম জেনে ফল বলেছিলেন, একটি বিখ্যাত কাগজে রাশিফল বেরোয়। রাশিনাম মিলিয়েই তা দেখতে হয়। যে সপ্তাহে অনামদাস দেখা করেছিল, সেই সপ্তাহের সেই দৈনিক কাগজে আমার রাশিফল খুব ভাল ছিল না। লিখেছিল, এই সপ্তাহে তোমার প্রতিভা লুপ্ত হবে। প্রতিভা কতটা লুপ্ত হয়েছে, তা বুঝতে পারিনি, কারণ লুপ্ত হওয়ার আগে তা থাকা তো চাই। যার প্রতিভাই নেই তার প্রতিভা লুপ্ত হয়ে কি যাদু দেখাবে? কিন্তু এখন ভাবছি অনামদাসের সঙ্গে দেখা হওয়া আর প্রতিভা লুপ্ত হওয়া কি একই কথা। শুনেছি প্রতিভা নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; অনামদাস হয়তো এমন একটি পাথর যে উন্মেষের সম্ভাবনা চেপে দেয়। পুরো দুনিয়া নাম কামানোর জন্য ছুটছে আর সেদিন অনামদাস আমাকে বোঝালো যে নামে কি আসে যায়? আমিও মেনে নিলাম, বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিল। রাশিনাম ঠিকই হবে হয়তো।

কিন্তু অনামদাস বলেছিল রাশিনামও ধোঁকা, বলেছিল, ভারতীয় বর্ণমালার বিন্যাস পরম্পরা থেকে স্বতন্ত্র যাবনী বর্ণমালা থেকে রাশিনাম পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। এখানে কখনও কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকে সাতাশ নক্ষত্রের গণনা হতো, এখন অশ্বিনী থেকে হয়। কিন্তু অনেক রকমের জ্যোতিষগণনা এখনও কৃত্তিকা থেকেই হয়। সাতাশ নক্ষত্রে 108 চরণ হয়। যাবনী বর্ণমালায় এত অক্ষর ছিল না। যা ছিল, তাদের পাঁচটি স্বরধ্বনিসমেত। 108 করা সম্ভব ছিল না। তাদের বর্ণক্রম অ ব ক-এর মতো ছিল, অনেকটা ইংরাজি এ বি সি-র মতো। যবন ভাষায় পাঁচটি স্বরের সঙ্গে আ ঈ উ এ ও বা বি বু বে সে হত্রে। এদের নক্ষত্র চরণের প্রতীক মানা হতো। মজার কথা হলো একে অবকহরা চক্রই বলা হয়, যাবনী বর্ণমালার চার অক্ষরের ভারতীয় রূপ। সংস্কৃত বর্ণমালার ঘ ঙ ছ ইত্যাদি কিছু বর্ণ জুড়ে 108 টি সংখ্যা পুরো করা হয়েছে। এ একেবারে কল্পিত বিধান। কখনও কখনও এই অক্ষরগুলো দিয়ে নাম তৈরি করতে পণ্ডিতদের অসুবিধা হয়। আমার দিকে ইশারা করে বললেন, আপনার নাম অর্থাৎ রাশিনাম রাখতে কি কোনও অসুবিধা হয়নি? আমি হয়রান। তুলসীদাসের মতো আমার জন্মও মূল নক্ষত্রের প্রথম চরণে হয়েছিল। তার সাংকেতিক অক্ষর হলো য়ে। সংস্কৃতে 'য়ে' দিয়ে কম শব্দই তৈরি হয়। আমার ঠিকুজি তৈরি করতে জ্যোতিষীকে চিন্তা পড়তে হয়েছিল। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি 'য়েননাথ' নাম রেখেছিলেন। মানে কি দাঁড়ালো? মানে দাঁড়ালো নামে কি আসে যায়, যা খুশি রেখে দাও, কাজ চলে যাবে। অনামদাসের বক্তব্য হলো এও ধোঁকা। হবে! ফলেচ্ছু লোকেরা কাজ চালিয়েই নেয়। এই বিচিত্র বিধানে বিয়েটিয়ে হয়। তা দিয়েই জাতি নির্ণয় হয়, যোনি-নিশ্চয় হয়, গণ-নির্ণয় হয়, ঠিকুজি মেলানো হয়। একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায়। আমার এক বন্ধু ছিলেন, বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের কুলভূষণ। কিন্তু তার ছেলে এই অবকহরা গণনা পদ্ধতি অনুসারে শূদ্রবর্ণ বেরোলো। বিভিন্ন পাত্রীর বাবারা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন কিন্তু

জ্যোতিষীর হিসাবে তাদের মধ্যে একজনও শূদ্র বেরোলো না। যে মেয়েই পছন্দ হয় সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বেরোয়। বিয়ে ঠিকই হতে পারে না। খুবই চিন্তিত হলেন। একজন জ্যোতিষী 'বিবাহ-বৃন্দাবনের' শ্লোক পড়ে তার চিন্তা দূর করলেন যে 'মৈত্রী যদা স্যাত্ শুভদো বিবাহঃ'। গ্রহমৈত্রী হলে আর কিছু দরকার হয় না। 'মৈত্রী' মিলেছিল। কোনওরকমে ঝামেলা শেষ হলো। অনামের কথা ওজনদার মনে হলো।

অনেক আদিম জাতির নাম লুকোনোর চেষ্টা হয়। আদিম মানুষ নাম ও নামীর ঐক্যে বিশ্বাস করত। যদি নাম জানা যায় তাহলে শত্রুতা করেও কেউ অভিচার করতে পারে। 'দেবদত্ত মরে গেছে' বললে দেবদত্ত মরে যায় না, একথা তো লোকে এখন বলছে। খুব প্রাচীনকালে ভাবা হতো যে যদি ধ্যানপূর্বক জপ করা যায় তাহলে 'দেবদত্ত' পদ নয়। এই পদের অর্থ হলো পদার্থ দেবদত্ত মরে যাবে। ছবি তৈরি করে তার বুকে ছোরা বসালে সেই ছবি অর্থে জীবন্ত মানুষে বসবে। লোকে এখন বলে যে ওসব বেকার কথা; কিন্তু এখনও গালাগালি, অভিশাপ ইত্যাদির অবশেষ বেঁচে আছে। জ্যোতিষচর্চাও সেই পুরোনো প্রথায় চলছে। কোনও বিশ্বাস পৃথিবী থেকে একেবারে উবে যায় না। রূপ পরিবর্তন করে বেঁচে থাকে। না বেঁচে থাকলে নিজেকে 'প্রোগ্রেসিভ' বা 'প্রগতিশীল' বলা লোকেরা বিরোধীদের কুশপুত্তলিকা কেন পোড়ায়। 'মুর্দাবাদ' ধ্বনি কেন দেয়? আদিম মানসিকতা বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে!

অনামদাস জানে না যে পৃথিবী প্রশ্ন করে না যে কি বলা হচ্ছে, প্রশ্ন করে, কে বলছে! কে অর্থাৎ নাম। বড় বড় সমালোচক নাম দেখে সমালোচনা লেখেন; পরীক্ষক নির্দেশকের নাম ওজন করে উপাধিকারীর বৈতরণী পার করে দেন। 'নাম' অনেক কাজেই নিজের মধ্যে বেঁধে রাখে। এখন এই পুঁথি পড়তে হবে, তারপর যদি ভাল হয় অর্থাৎ মনোমত হয় তাহলে বলতে হবে অনাম বন্ধুকে কেউ চেনে না বটে, তবে তিনি ভাল লেখেন। তারপর প্রকাশক ন্যাকামি করবে। রাজি হলেও বলবে কোনও 'নামী' লোককে দিয়ে ভূমিকা লিখিয়ে দিন। মহাঝামেলা। পুরো দুনিয়া নাম খোঁজে। ধর্মগ্রন্থ তো নামমহিমায় ভরা। সব মিথ্যা, মহাত্মা অনামদাসই সত্য।

কিন্তু এই ঝকমারির জন্য ভালোমানুষটি আমাকেই কেন বাছল? বড় বড় বিদ্বান নেতা, রাজপুরুষ, শেঠ-সাউকার আছে, তারা চাইলে তিলকে তাল করতে পারে, তালকে তিল করতে পারে। সেখানে যাও। তাদের বলো এই গরিবকে কেন ফাঁসাচ্ছ? কি বিশ্বাস দেখুন, এসেছিলেন উৎসর্গ করার অনুমতি নিতে, লিখে দিলেন, 'আপনাকে উৎসর্গীকৃত, যা ইচ্ছা করুন।' অদ্ভুত উৎসর্গ। এসব উৎসর্গ শুনিনি পড়তে হবে কে জানে কি সব লিখেছে? কথা তো মূল্যবান। মাথা ঘামানো খারাপ হবে না।

মুশকিল হলো হিন্দিতে লেখা যত সোজা, পড়া তত নয়। মানুষ খসখস করে লিখে ফেলে, পাঠক মাথা ঘামায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে এমন কিছু লেখক আছে যার একটা বই পড়ে শেষ করতে না করতেই তার চারটে বই ছেপে বেরিয়ে যায়। অনামও যেন এই ধরনের লেখক না হয়ে যায়। কিন্তু এখন ভয় পেয়ে কি হবে! সংস্কৃতের একজন অভিজ্ঞ কবি পরামর্শ দিয়েছেন যে ভয়কে ততক্ষণ ভয় পাওয়া উচিত যতক্ষণ সত্যিই সে

সামনে এসে দাঁড়িয়ে না পড়ে। 'তাবদ্ভয়সাওা ভেতব্যং যাবদ্ ভয়মনাগতম্।' আর এখানও তো ভয় মাথার ওপর চেপে বসেছে। পুঁথির থেকে মুক্তি নেই।

পুঁথি পড়ে ফেললাম। এই অনাম অদ্ভুত গপ্পোবাজ। তার অনুভবের ক্ষেত্র খুবই সীমিত মনে হয়, কিন্তু সেই সীমার মধ্যে সে লম্ফঝম্ফ করতে পারে। কখনও কখনও এমন লাফায় মনে হয় যেন অঙ্গদ লম্ফ দিয়েই ক্ষান্ত হবে। বলা হয় লঙ্কাজয় করে ফেরার পথে রামচন্দ্র শ্বশুরালয় গিয়েছিলেন আর সঙ্গে বানরসেনাও গিয়েছিল। লক্ষ্মণ তো সর্বদা চিন্তিত ছিলেন যে লোক ব্যবহারে অনভিজ্ঞ বাঁদররা এমন কিছু না করে বসে যাতে শ্বশুরবাড়ির খারাপ লাগে। সব সময় শেখাচ্ছিলেন আমাকে দেখবে, যেমন ইশারা করব তেমন করবে। বেচারা বাঁদররাও খুব সাবধানে ছিল। সব সময় লক্ষ রাখত যে লক্ষ্মণ কি ইশারা করে। সবাই খেতে বসেছিল। লক্ষ্মণ খুব সাবধান করে দিয়েছিল: খাবার দেখেই হুমড়ি খেয়ে পড়ো না, আমাকে দেখবে, যেমন ইশারা করব, তেমন করবে। শ্বশুরবাড়ির কথা। গণ্ডগোল না হয়ে যায়। রামের একদিকে সুগ্রীবের পাশে লক্ষ্মণ ছিল। ডাইনে বাঁয়ে সামনে যূথাধিপতি বানরেরা, খাবার বাড়া হলো। লক্ষ্মণ ইশারা করল, চুপ শান্ত। সমস্ত বাঁদর তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লক্ষ্মণ লেবুর টুকরো নিল, চিপল। ঝট করে একটি বিচি ওপরে উঠল। বাঁদররা ভাবল ইশারা হয়ে গেছে। কাছের জন একটু লাফাল, ধীরে ধীরে এক একজন বানর পরপর লাফাতে লাগল। লাফানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। অঙ্গদের সময় এলে, সে এমন লাফাল যে ছাত শুদ্ধ উড়ে গেল! একেই অঙ্গদ-লম্ফ বলে। অনামও কখনও এইরকম লম্ফ দেয়। কিন্তু অঙ্গদের মতো সে ছাতশুদ্ধ উড়ে যেতে পারে না। ছাতের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিচেই ফিরে আসে। সীমার জন্যে সে পথভ্রষ্ট হতে পারে না। অনামের ভেতরে ঘুমন্ত কবিও আছে। থেকে থেকেই জেগে ওঠে, কিন্তু তার পুরো ব্যক্তিত্বকে না তো এই কবি অভিভূত করতে পারে, আর না অনাম সেই রকম করার অনুমতি দেয়। বেচারা ঘুমন্ত কবি জাগে, আবার কোনও অদৃশ্য চাবুকের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে যায়। না সরে, আর না মুটিয়ে যায়। ভেতরের সমালোচক সবসময় তর্জন গর্জন করে, তার জ্ঞানগম্যি গুম করে দেয়। কিন্তু এমন মনে হয় যে সমালোচক যত গর্জন করে তত শক্তিশালী নয়। কালিদাস নিজের এক বিদূষককে দিয়ে বলিয়েছেন যে সাপের মধ্যে যেমন ঢোঁড়া, ব্রাহ্মণের মধ্যে তেমন আমি। ঢোঁড়া একেবারে নির্বিষ সাপ। অনামের সমালোচকও সমালোচকের মধ্যে ঢোঁড়াই। অনামদাসের পুঁথি পড়ে তার মনে হলো যে লেখকের ভেতরের কবি সুপ্ত হয় আছে, সমালোচক অশক্ত। তবুও কিছু কথা আছে যা আকৃষ্ট করে।

সম্ভবত তা আর কিছুই নয়, তার মাত্রাজ্ঞান আছে। কোথায় থামা উচিত, কোথায় তাড়াতাড়ি চলা উচিত, অনাম তা জানে। কিন্তু কতটা লেখা উচিত, তা জানে না। জানলেও এত লিখত না। ভালোমানুষ তো মোটামুটি মহাভারত লিখে ফেলেছে এইজন্যে 'মহাভারত' বলছি না যে এতে যা আছে তা অন্যত্র পাওয়া যেতে পারে, আর যা এতে নেই তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। (যদিহাস্তি তদন্যএ, যন্নেহাস্তি ন তত্‌ক্বচিত্), বরঞ্চও এইজন্যে যে খুব ভারি, ওজনদার। মহাভারতে বলা হয়েছে যে দাঁড়িপাল্লার একদিকে বেদ, আর একদিকে সেই পঞ্চম বেদ রাখা হয়েছে; এটিই ভারি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং

'মহাত্তাদ্ ভারত্ত্ববাদ্ চ মহাভারত মুচ্যতে' মহান ও ভারবান হওয়ার জন্যে এই গ্রন্থকে 'মহাভারত' বলা হয়। আমার ধারণা হিন্দি থিসিসের মধ্যে যেটা সবথেকে ভারি—একটা তো চোদ্দ কিলো ছিল। তার থেকেও এটি ভারি প্রমাণিত হবে। এইজন্যে এটিকেও 'মহাভারত' বলা উচিত মহান ভারি পুঁথি। কোনও পাঠকের মাথায় এইরকম ভারি পুঁথি মারার অপরাধ আমি করতে পারি না। এইজন্যে ওই গ্রন্থের কিছু অংশ বেছে নিয়েছি। তাই প্রকাশ করিয়ে আমার কর্তব্য পালন করছি।

হিন্দিতে একটি প্রথা আছে, সমস্ত ত্রুটির জন্যে সহৃদয় পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে যেওয়া হয়। কোনও পাঠক লিখিত ক্ষমা চেয়েছে বা এর উল্টো কিছু হয়েছে এমন কিছু শোনা যায়নি। অনুমান যে হিন্দির প্রত্যেক পাঠক ক্ষমাসিন্ধু। ক্ষমা চাইতেই সে উদারভাবে মৌন ক্ষমা করে দেয়। অনাম তা জানে। ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। অনায়াসের যা পাওয়া যায়, না চাইলেও তা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি অবশ্যই পাঠকের সহানুভূতি ভিক্ষা করতে চাই। কত কঠিন কর্তব্য পালন করছি, এসব বুঝতে পারবেন না। কিছু ভুক্তভোগীই এসব কথা বুঝতে পারে। আমার সমধর্মী ভুক্তভোগী হয়তো কোথাও নেই। তবু যাচনা করেই ফেলছি। দোষ কীসের? বেশি হলে, পাব না। পেয়ে গেলেও কি এমন ভাণ্ডার পাওয়া যায়, না পেলেই বা কী ক্ষতি হবে!

Printed at J.J. Offset Printers, Wazirpur, Ring Road, Delhi